সবিনয় নিবেদন

বুদ্ধদেব গুহ

পত্রাবলী ব্যক্তিমানসের মুকুর। কিন্তু শুধুমাত্র এই মুকুরকেই কাজে লাগিয়ে যে রচিত হতে পারে কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাস, কেন কে জানে, এ-কথা এতকাল ভাবেননি কোনও কথাকার। আলাদাভাবে লেখা চিঠি যে 'পত্রসাহিত্য' হয়ে উঠেছে, এবং সেই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন কোনও-কোনও মনীষী-লেখক, এমন উদাহরণ অবশ্য রয়েছে। কি স্বদেশে, কি বিদেশে। আবার, উপন্যাসের অন্তর্গত বিশেষ কোনও চরিত্রের বিশেষ কোনও পত্র রেখে গেছে স্থায়ী ছাপ, এমন দৃষ্টান্তও সাহিত্যের ইতিহাসে অলভ্য নয়। কিন্তু শুধুমাত্র পত্র-বিনিময়ের মাধ্যমেই রচনা করা একটি পূর্ণাঙ্গ ও কৌতূহলকর উপন্যাস, এ-ঘটনা সাহিত্যের ইতিহাসে, বোধ করি, অভিনব এক পদক্ষেপ।

শুধু সেইদিক থেকেই ঐতিহাসিক গরিমার যোগ্য বুদ্ধদেব গুহর এই পত্রোপন্যাস—'সবিনয় নিবেদন'। সুখের কথা, শুধু আঙ্গিকগত নতুনত্বের জন্যই এ-উপন্যাস এক বিশিষ্ট কীর্তিচিহ্ন রূপে বন্দিত হবে না, হবে এর সামগ্রিক আবেদনের জন্যও।

বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাসে দীর্ঘকাল ধরেই চিঠিপত্রের একটি আলাদা স্থান। 'একটু উষ্ণতার জন্য'র ছুটি ও সুকুমারের অথবা 'মাধুকরী'র পৃথু ও কুর্চির চিঠির কথা এ-প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে পড়তে পারে। ব্যক্তিজীবনেও চমৎকার চিঠি লেখেন বুদ্ধদেব গুহ। কিন্তু এই নতুন উপন্যাসে পত্রবিলাসী কথাকার যেন নিজেই নিজেকে ছাপিয়ে উঠেছেন।

শিক্ষিত, স্বাবলম্বী এবং উদারমনা এক নারী ঋতার সঙ্গে বেতলার জঙ্গলেএক চরম বিপন্ন মুহূর্তে এক-ঝলক দেখা হয়েছিল ঝকঝকে, ব্যক্তিত্ববান, টাইগার প্রোজেক্ট অফিসার রাজর্ষি বসুর। কলকাতায় ফিরে বিপদ্‌ত্রাতা এই মানুষটিকে আন্দাজী ঠিকানায় একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক চিঠি পাঠিয়েছিল ঋতা। 'সবিনয় নিবেদন' সম্বোধন-বাহিত সেই চিঠিই শেষ পর্যন্ত এই অভাবনীয় উপন্যাসের ভিত্তিপ্রস্তর। পরবর্তী পত্র-বিনিময়ের সূচনা এই চিঠি থেকেই।

শুধু দু-জন মানুষের সম্পর্ককে ধীরে-ধীরে উন্মোচিত ও সমীপবর্তীই করেনি এই পত্রাবলী, দেশ-কাল-সমসময় ও আধুনিকতারও ঘটিয়েছে স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, সরস প্রতিফলন।

পরিণয় নিবেদন

বুদ্ধদেব গুহ

The Online Library of Bangla Books

প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৬
চতুর্দশ মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৯

© বুদ্ধদেব গুহ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7066-202-8

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

SABINOY NIBEDAN
[Novel]
by
Buddhadeb Guha
Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

১২৫.০০

The Online Library of Bangla Books

সবিনয় নিবেদন

The Online Library of Bangla Books

বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা
৩০শে অক্টোবর, ১৯৮৭

সবিনয় নিবেদন

গত শনিবার রাতে পালামৌ ন্যাশানাল পার্ক-এর মধ্যে আপনি যাদের হাতির দলের হাত থেকে উদ্ধার করে বেতলা পৌঁছে দিয়েছিলেন আপনারই জীপে করে, আমি সেই দলেরই একজন ।

আমাদের সকলের হয়ে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবার জন্যেই এই চিঠি । আপনি না থাকলে আমাদের অবস্থা হয়তো চিত্রপরিচালক তপন সিংহের মতোই হতো । আপনি হঠাৎ অকুস্থলে এসে না পড়লে সে রাতে আমরা হাতির হাত থেকে বাঁচলেও হয়তো শীতের হাতেই নির্ঘাৎ মারা যেতাম । সত্যিই আমরা কৃতজ্ঞ । বাঃ বাঃ ! আপনাদের ওখানে শীত বড় সাংঘাতিক ।

আপনার ঠিকানা জানিনা । চলে যাবার সময় শুধু নামটিই জানিয়েছিলেন । বনবিভাগেই যে চাকরি করেন শুধুমাত্র এই অনুমানটুকু সম্বল করেই চিঠিটি লিখছি । পাবেন কি না জানিনা ।

একটু বিরক্তও করব । আপনার জীপে আমার একটি ব্যাগ কি ফেলে এসেছিলাম ? অফ্-হোয়াইট-রঙা একটি ব্যাগ ? চামড়ার । কাঁধে-ঝোলানো । মধ্যে কিছু টুকিটাকি জিনিস ছিলো আমার । আর দুটি বইও । একটি বাংলা বই । অমিয়নাথ সান্যাল মশায়ের “স্মৃতির অতলে” । অন্যটি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের জীবনী । কার্লোস বেকার-এর লেখা । ব্যাগটি অন্য কোথায়ও হারিয়ে থাকতে পারি ।

আপনার জীপে যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে এ নিয়ে অযথা বিব্রত হবেন না । আমিই বরং অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে ।

আমার পুরো ঠিকানা লেখা কার্ড সঙ্গে দিলাম । ব্যাগটি যে পেয়েছেন সেই খবরটুকু আপনার কাছ থেকে পেলে আমিই ওটি আনিয়ে নেবার বন্দোবস্ত করব । এই চিঠি যদি আদৌ পান তবে প্রাপ্তিসংবাদটুকু জানালে খুবই খুশি হব ।

—নমস্কারান্তে

ঋতি রায়, বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা

শ্রীরাজর্ষি বসু
C/o ডি· এফ· ও· টাইগার প্রজেক্ট, পালামৌ
ন্যাশনাল পার্ক, ডালটনগঞ্জ,
জেলা-পালামৌ, বিহার

The Online Library of Bangla Books

১

বেতলা, পালাম্যু, বিহার
৪/১১/৮৭

সুপ্রিয়া

আপনার চিঠি পেয়েছি। ধন্যবাদ। মানে, ধন্যবাদের জন্যে ধন্যবাদ। তবে ধন্যবাদ পাবার মতো কিছু করেছি বলে তো মনে পড়ে না। আপনাদের সাদা-রঙা অ্যাম্বাসাডার আমার পথ জুড়ে ছিলো। নিজের স্বার্থেই যা করার তা করেছিলাম। পরোপকারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। আপনার ব্যাগটি পরদিন সকালেই জীপের পেছনে পাওয়া যায়। আমি সে রাতে আপনাদের বেত্‌লার ট্যুরিস্ট লজ-এ নামিয়ে দিয়েই ডালটনগঞ্জে এসেছিলাম। পরদিন হেডকোয়ার্টার্স্‌-এ কাজ ছিলো বলে। পরদিন সন্ধেবেলা বেত্‌লাতে ফিরেই সোজা ট্যুরিস্ট লজ-এ গেছিলামও আপনাদের খোঁজ করতে। কিন্তু গিয়ে শুনলাম যে আপনারা দুপুরেই খাওয়াদাওয়ার পর চলে গেছেন রাঁচীতে।

ব্যাগটি আমার কাছেই আছে। নেওয়ার জন্যে লোক পাঠালে যদি দিন দশেক পরে পাঠান তবে কৃতজ্ঞ থাকব। দুটি বইই পড়ে তারপরই হস্তান্তরিত করার ইচ্ছে। এমন ভালো ভালো বই তো এই জঙ্গলে বসে জোগাড় করা প্রায় অসাধ্যই।

গাড়িটা তো দেখলাম নতুনই। ডাব্লিউ এন সি নাম্বার। খারাপ হলো কি করে? তখন জিজ্ঞেস করা হয়নি।

আমাদের "হাতি তুলে" কিন্তু মোটেই কথা বলবেন না। এখানের হাতি উত্তরবঙ্গের হাতিদের মতো নয়। লক্ষ্মী সোনা সুন্টুনি-মুন্টুনি হাতি সব। আপনি বোধহয় জানেন না যে চিত্রপরিচালক তপন সিংহকে জংলী হাতিরা কিছুই বলেনি। বলেছিলো একটি পোষা হাতিই। শুটিং-এর সময়ে শুঁড় দিয়ে হঠাৎ ধাক্কা মেরেছিলো। আপনার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কারা? আপনার কাকিমাকে তো আপনারই সমবয়সী বলে মনে হলো। মিথ্যে বলবো না, একটু অবাকই হয়েছিলাম।

ঐ ভাঙ্গা গাড়ি করেই কি রাঁচী গেলেন?

নমস্কার জানবেন—
ইতি রাজর্ষি

বালীগঞ্জ প্লেস. কলকাতা-৭০০০১৯
৮/১১/৮৭

অপরিচিতেষু

আপনার চিঠির জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। এতো তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়াতে আপনি যে অত্যন্ত ভদ্রলোক তাই প্রমাণিত হয়। বই দুটি আপনার কাছে যতদিন খুশি রাখবেন। পড়া হলেই তারপরই জানাবেন। তখনই লোক পাঠাবো। হারিয়ে যে যায়নি ওই ঢের। সৎসঙ্গে না হয় কিছুদিন থাকলোই। দিনের আলোয় দেখা হলে আমি কিন্তু আপনাকে চিনতেই পারবো না। হয়তো অন্ধকারেও নয়। আপনিও আমাকে চিনতে পারবেন না।

সত্যি কথা বলতে কী স্পটলাইটের এক ঝলক আলোয় একবার দেখা আমার মুখকে মনে করে রাখা আপনার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। আমার পক্ষেও আপনার মুখ মনে রাখা সম্ভব নয়। ইমরান খান বা মারাদোনার মুখ হলেও হয়তো মনে থাকতো না। তার ওপরে আপনার মাথায় আবার ছিলো লাল ধুলোয়-ভরা বাঁদুরে টুপি। আমার কিন্তু ধারণা ছিল বাঁদুরে টুপি পরেন শুধুমাত্র কেদার-বদ্রী-যাত্রী, হাতে-লাঠি রিটায়ার্ড কুদুঁলে বুড়োরাই ! আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে শীতের সকালে প্রাতঃভ্রমণ করতে যাওয়া কলকাতার মাড়োয়ারীরাই। তাই খুবই অবাক হয়েছিলাম অল্পবয়সী বনপালকের মাথায় অমন টুপি দেখে।

সেদিন আপনার জীপ যদি অকুস্থলে না পৌঁছাতো সেসময়ে তাহলে হাতিরা বোধহয় কাকার অ্যাম্বাসাডার গাড়ি নিয়ে ফুটবলই খেলতো। আমাদের যে কী হতো তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। এখনও ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। একেই বোধহয় বলে "মিরাক্যুলাস্ এস্কেপ্।"

ঐ হাতির দলের মধ্যে আপনি নেমে এসে গাড়ি থেকে আমাদের এক এক করে অসীম দুঃসাহসে যখন উদ্ধার করে নিজের জীপে ওঠাচ্ছিলেন, তখন কাকিমা ফিসফিস করে বলছিলো—দ্যাখ্ দ্যাখ্ অরণ্যদেব। সত্যি ! হাতিরা কি আপনার পোষা ? তাই অরণ্যদেবের গল্প কলকাতায় এসেও প্রত্যেককেই আমার নতুন করে দফায় দফায় বলতে হচ্ছে।

কাকার অ্যাম্বাসাডার গাড়ি এবং ড্রাইভারকে পরদিন আমরা বেত্‌লাতে রেখেই স্থানীয় এক সহৃদয় ভদ্রলোক শ্রীমোহন বিশ্বাসের গাড়িতে করে হাটিয়াতে এসে পৌঁছেছি। জানিনা, সেই অ্যান্টিকুয়েটেড গাড়ি ও সুপার-অ্যানুয়েটেড ড্রাইভার আজ পর্যন্ত হাটিয়াতে গিয়ে পৌঁছেছে কিনা !

হেভী এঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনের গাড়ির অবস্থা দেখেই আমার পাবলিক সেকটর আন্ডারটেকিং-এর ওপর ঘেন্না ধরে গেছে, তা কাকা আমার সেখানকার যত বড় অফিসারই হোন না কেন !

আশা করি, কাকার কার্ডটি আপনি রেখে দিয়েছেন এবং রাঁচী কখনও গেলে নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবেন ওঁর সঙ্গে। ওঁদের ওখানে অবশ্যই যাবেন কিন্তু। নইলে আমাদের ঋণ

শোধ করা তো দূরের কথা, স্বীকার পর্যন্ত করার সুযোগ পাবো না আমরা। আর কলকাতায় এলে আমার ঠিকানাতে যোগাযোগ করলেও খুবই খুশি হবো। জানিনা আদৌ কলকাতায় আসেন কিনা !

সে রাতে আপনার নামটিই শুধু বলেছিলেন। জীপের রঙ দেখে অনেক জল্পনা-কল্পনা করে ঠিক করেছিলাম আমরা যে, আপনি বনবিভাগেরই অফিসারই হবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনার ডেসিগনেশান, ঠিকানা, কিছুই তো জানার উপায় ছিলো না ঐ স্বল্প সময়ে। আপনি যে জানাবার জন্যে ব্যগ্র ছিলেন না তাও বুঝেছিলাম। শীতের রাতে, উষ্ণ ঘরে, স্ত্রী গরম খাবার নিয়ে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছিলেন। তাড়া দেখেই বুঝেছিলাম আমরা। নেহাৎ আন্দাজেই চিঠিটি দিয়েছিলাম। পেয়েছেন জেনে সত্যিই চমৎকৃত হলাম। পুরুষরা বেশি কথা বললে খারাপ লাগে। আমার তো লাগেই। কিন্তু আপনার মতো প্রায় মৌনী পুরুষমানুষ নিয়ে বোধহয় বিপদও কম নয়। এই যেমন আপনার ঠিকানা না-জানাতে বিপদ আমাদের হয়েছিলো। চিঠি পৌঁছবে কিনা এই ভেবে টেনশন এ ক'দিন কম হয়নিও। ভালো থাকবেন। আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে।

ঋতি রায়

ঋতি রায়
বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯

* * *

ডালটনগঞ্জ, পালামৌ, বিহার
১৩/১১/৮৭

সুচরিতাসু

মহুয়াডাঁর এবং মারুমারে কাজ ছিলো। আজই সন্ধ্যেবেলা ফিরে আপনার চিঠি পেলাম। তাই প্রাপ্তিসংবাদ জানাচ্ছি, জামাকাপড় না খুলেই, যাতে কাল সকালের বাসেই চিঠিটি যায়।

আপনার কাকার কার্ডটি সত্যিই হারিয়ে ফেলেছি। আমি বড় ভুলোমনের মানুষ। তাছাড়া, আমার নিজের কাছে যা-কিছুই নামী বা প্রয়োজনীয় নয় সেই সব তথ্যে ভারাক্রান্ত করতে চাইও না নিজেকে। তাছাড়া আপনার কাকার ঠিকানার মতো ঠিকানা, এখানে বেড়াতে-আসা ভদ্রলোকদের মধ্যে অন্তত পাঁচজন দিয়ে যান, আমাকে প্রতি সপ্তাহে। জানি তো যে কারো সঙ্গেই দেখা হবে না আর। ট্রেনের কামরার আর ট্যুরিস্ট স্পটের আলাপ আইসক্রিমের ঠোঙা বা পাঁউরুটির মোড়া কাগজেরই মতো, কামরাতে বা পথেই পড়ে থাকে। তাই ওসব ঠিকানা রেখে লাভ কি ? ফিরে গিয়ে কেউই মনে রাখেনা আবার যদি না ভবিষ্যতে কখনও প্রয়োজন ঘটে। এই প্রেক্ষিতে আপনার ব্যাতিক্রমী চিঠি, নিশ্চয়ই বলব আমাকে অভিভূত করেছে। আপনারা যথার্থই ভদ্রলোক। এবং বিনয়ীও।

কাকার ঠিকানাটা যদি লিখে পাঠান, ফোন-নাম্বারও; তাহলে রেখে দেবো। পুরো নামটিও—ভুলে গেছি। রায় যে পদবী সেটুকুই মনে আছে শুধু।

আপনি বন-জঙ্গল ভালোবাসেন বলেই মনে হয়েছিলো সেদিন রাতে, স্বল্পসময়ে, জীপ

চালাতে চালাতে আপনার সঙ্গে আপনার অল্পবয়সী কাকীমার কথোপকথন শুনে। কে যে কাকীমা আর কে আপনি তা অবশ্য বলতে পারবো না। বোঝার উপায়ও ছিলো না। বেত্‌লার বাংলোতে সবসময়ই বাজার লেগে থাকে আজকাল। শুধু বর্ষার কয়েকটি মাস ছাড়া। তার ওপর আই টি ডি সি-র লজ-ও তো চালু হলো বলে। কিশোর ও পাপড়ি চৌধুরীরাও বেত্‌লার একেবারে মুখেই হোটেল করছেন। নামটি ভারী সুন্দর, "নইহার"। ওরা হাতি-পাগল দম্পতি তাই হাতিদের বাপের বাড়ি হিসেবে নইহার নাম। "বাবুল তোরা নইহার ছুটহি যায়" বিখ্যাত ঠুংরী খানি শুনেছেন তো? তবে নির্জনতা যাঁরা সত্যিই ভালোবাসেন, তাঁদের পক্ষে বেত্‌লাতে থাকার মানে হয় না কোনো। আবারও যদি আসেন এদিকে, আমাকে আগে জানাবেন। কোনো নির্জন বাংলো বুক করে দেব। রান্নার জন্য লোকও ঠিক করে দেব। তবে হাতি বা বাঘকে ভয় পেলে নির্জনে থাকা হবে না। সম্ভব হলে সঙ্গে একজন রান্নার লোক এবং নিজেদের ট্রান্সপোর্ট, প্রেফারেবলি জীপ এবং টিপ-টপ কণ্ডিশনের, নিয়ে আসবেন।

আরও একটা কথা। ওরকমভাবে বুড়ি ছুঁয়ে গেলে ফিরে গিয়ে অন্যদের কাছে "দেখেছি" বলে গল্পই করা যায় শুধু, কিন্তু নিজের মন কি ভরে? জঙ্গলে এলে কমপক্ষে টানা সাতটি দিন থাকার জন্যেই আসবেন। তা সে যে জঙ্গলেই যান না কেন! বনকে সময় না দিলে, চোখ, কান, নাক, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তার প্রতি একাগ্র না হলে সে কারো কাছেই মন খোলে না। দীর্ঘদিন জঙ্গলে থেকে এইটুকুই শিখেছি। এদিকে আসতে চাইলে সঙ্কোচ করবেন না। জানাবেন নির্দ্বিধায়। রাতের বাঁদুড়ে-টুপি পরা কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারের মতো নয়, দিনের বেলার আলো-ছায়ায় মানুষেরই চেহারায় তখন দেখা দেব। তখন আপনাকেও দেখবো দিনের আলোয়।

ধন্যবাদ ও নমস্কার জানবেন। যে ঠিকানায় লিখেছেন তাতেই চিঠি পাব। জংলীদের আবার ডেসিগনেশন! আমি অতি সামান্য লোক। আপনার নামটি ভারী সুন্দর। 'ঋতি' মানে কি? এই নামে অন্য কোনো নারী আছেন বলেও জানিনা। জানিনি এতদিনেও কাউকে।

ইতি—রাজর্ষি

রাজর্ষি বসু, পালাম্যু, বিহার

* * *

১৭-১১-৮৭
বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা

প্রিয়বরেষু

আমি তো নিজেকে ভদ্রলোক বলে জানতামই। লোক মানে, Person। কিন্তু দেখছি আপনিও কম ভদ্রলোক নন! জামাকাপড় ছেড়ে খাওয়াদাওয়া করেই না হয় লিখতেন চিঠিটা!

কখনওই খিদে পেটে নিয়ে কাউকে কিছু লিখতে নেই। ক্ষুধার্ত মানুষের চিঠির মধ্যে সচরাচর খিদেই লুকিয়ে থাকে। সে খিদে যে-কোনো খিদেই হোক না কেন। আপনার

চিঠিতে অবশ্য ছিলো এক নির্লিপ্ত প্রশান্তি। আশ্চর্য!

জেনে ভাল লাগছে যে, বাঁদুরে-টুপির আঘাতটা যথাস্থানে বেজেছে। আমাকে আপনি জানেনই না। তা জানুন আর নাই জানুন বাঁদুরে-টুপি পরা চলবে না আপনার। আপনার স্ত্রী বা দিদি বা বোনেরা কেউই আপত্তি করেন না? ওঁরা না করলেও আমি করছি। ছ' ফিট লম্বা সুগঠিত যুবকের মাথায় বাঁদুরে-টুপি একেবারেই মানায় না। তা ছাড়া, নাম যার রাজর্ষি তার তো শিরস্ত্রাণ বা মুকুটই পরার কথা ছিলো। তার বদলে বাঁদুরে টুপি! ছিঃ!

কাকার ঠিকানা, সঙ্গের আলাদা কাগজে লিখে পাঠালাম।

ধরেছেন ঠিকই। কাকীমা আর আমি প্রায় সমবয়সীই। সমবয়সী বলেই ওকে ইচ্ছে করে "কাকিমা" বলে ডাকি অন্যদের সামনে। ও চটে যায়। ওর নাম শ্রুতি। জামসেদপুরের মেয়ে। ওর বাবা টেলকোতে আছেন। রিটায়ার করার এখনও দেরি আছে অনেক। যদি কখনও আপনাকে আবারো জ্বালাতে যাই ওদিকে তবে দুজনেই একসঙ্গে গিয়ে আপনাকে ধন্দে ফেলে দেবো। দেখব! কে আমি আর কে শ্রুতি তা বুঝতে পারেন কিনা!

কাকীমার স্বামী, কাকা, আমার আপন কাকা নন। বাবার মামাতো ভাই। বয়সে বাবার চেয়ে অনেকই ছোট।

সত্যি! খুব ভালো লাগলো পর পর চিঠি পেয়ে আপনার।

আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের আমার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও আদর জানাবেন। ওঁদের কথা লিখবেন, ইন ডিটেইলস্। কার কি নাম? কত বয়স? আপনার স্ত্রীকে বৌদি বলে সম্বোধন করতে পারি কি? চিঠিতে? ওঁকেও চিঠি লিখতে বলবেন। এই অনুরোধে উনি বিরক্ত হবেন কি? হতেই পারেন। কত মানুষই তো গিয়ে হামলা করেন আপনাদের ওপর। হয়তো আপনারা বিরক্ত। বিশেষ করে উনি। তবে উনি আমাকে লিখলে খুবই খুশি হব। আপনার মা-বাবা, ভাই-বোনেদের কথাও লিখবেন। সব।

ছেলেবেলায় পেন-ফ্রেন্ড ছিলো অনেক আমার। আপনি বেশ বড় বেলার পেন্-ফ্রেন্ড। ভাবতেই মজা লাগছে। এই মুহূর্তে হেভী এঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনের অ্যান্টিকুয়েটেড্ গাড়ি আর তার সুপার অ্যানুয়েটেড ড্রাইভারকেও অশেষ ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে। গাড়িটা যদি ঐ অন্ধকার শীতের রাতে খারাপ না হত তবে তো বনের রাজা এবং বনের ঋষিরও সঙ্গে এমন করে আলাপ হত না। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলেরই জন্যে।

ভালো থাকবেন। মাথায় ঠাণ্ডা লাগলে বাঁদুরে-টুপি না পরে ফেল্ট-হ্যাট পরবেন। বাবা প্রতিবারই নিয়ে আসেন পাইপ আর প্রতিবারই ফেল্ট-হ্যাট। যখনই দেশে আসেন।

মাথা-ভর্তি-টাক বলে বাবা শীতে টুপি ছাড়া চলতেই পারেন না। আপনাকে পাঠিয়ে দেবো ন্যু-ইয়র্ক-এর খুব নামী দোকানের টুপি। কলকাতায় এবারে এখনও শীত না পড়ায় নতুন টুপি নতুনই আছে। ব্যবহৃত হয়নি। যেমন নরম তেমনই Mod। এবং গরমও তেমনই। 'না' করবেন না। কাকার অফিসের ক্যুরিয়ার সার্ভিস-এর থ্রুতে পাঠিয়ে দেব রাঁচীতে। সেখান থেকে কাকা আপনাকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করবেন। ওগুলো পেয়ে জানাতে ভুলবেন না যেন!

ভালো থাকবেন। ইতি ঋতি রায়

বেতলা
২২-১১-৮৭

ঋতি রায়,
কলকাতা

সুজনেষু

ভারী দুঃখিত । এবারে উত্তর দিতে খুব দেরী হয়ে গেলো । উত্তরবঙ্গে গেছিলাম । সেখানে হাতির ওপর একটি সিম্পোজিয়ামে যোগ দিতে । নানা দেশ থেকে হস্তীবিশারদরা সব এসেছিলেন । আমাদের পূর্বাঞ্চলের বিখ্যাত বিশারদ গৌরীপুরের লালজী, প্রমথেশ বড়ুয়ার ছোট ভাই প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়াও এসেছিলেন । বুদ্ধদেব গুহ ওঁর কথা কিছুদিন আগে “সানন্দাতে” লিখেছিলেন । অবশ্য আপনি “মেয়েদের” কাগজ পড়েন কিনা জানি না ।

অনেক মেয়েরাই আজকাল নিজেদের “মেয়ে” বলে স্বীকার করতে নারাজ । এবং যা-কিছুই শুধুই মেয়েদের বলে চিহ্নিত বা মেয়েলি বলে পরিচিত, তা পোশাকই হোক কী মানসিকতা তার সব কিছুই সমারোহ সহকারে বর্জনীয় এমনই একটা ধারণা অনেক মেয়েরই মনে গড়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি বলেই এ কথা বললাম । এই মানসিকতা ভালো কী মন্দ সে সম্বন্ধে আমার কোনো বক্তব্য নেই । হয়তো প্রয়োজনও নেই । কারণ, মানুষ জাতিরই বিশেষ বিশেষ বিভাগ নিজেদের নিয়ে কী করতে চান বা না চান সেটা সেই বিভাগীয়দেরই বিবেচ্য । এবং সেই বিবেচনার পূর্ণতম স্বাধীনতা তাঁদের থাকা উচিত এই মতেও আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি ।

আপনার বাবার আর্থরাইটিস আছে এবং তা নিয়ে উনি খুব ভুগছেন শুনলাম আপনার কাকার কাছে । গত সপ্তাহে রাঁচী গিয়ে ফোনে যোগাযোগ করতেই আপনার কাকা তেজেশ নিজে এসে প্রায় জোর করেই নিয়ে গেলেন ওঁর বাংলোতে । আপনি লিখেছিলেন কাকা “বড় অফিসার” । কিন্তু এত বড় যে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না । আপনার কাকীমা শ্রুতির সঙ্গেও আলাপ হলো । সত্যিই চমৎকার । বিদূষী, সরল, আন্তরিক এবং যথার্থ সুন্দরী মহিলা ।

মেয়েদের আমার ভালো লাগে । সুন্দরী হলে তো আরও ভালো লাগে । এর মধ্যে মনের সৌন্দর্যও পড়ে । সৌন্দর্যের সঙ্গে মেয়েদের কোথাও যেন এক অদৃশ্য অচ্ছেদ্য যোগাযোগ আছে । অন্তত থাকা উচিত, জন্মলগ্ন থেকেই । শুধু মেয়েরাই নন, পাখি, প্রজাপতি, নদী, ফুল এই সব কিছু সুন্দর সৃষ্টির মধ্যেই আমি সৃষ্টিকর্তার এক বিশেষ সযতন সচেতন পক্ষপাতিত্ব প্রত্যক্ষ করি । পুরুষ মানুষ গড়ার সময় বিধাতা যেমন দায়সারাভাবে কাজটি সেরেছেন মেয়েদের বেলায় তা মোটেই করেননি । কেন এই পক্ষপাতিত্ব জানি না । রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট গল্প আছে না ? যার নাম “ঘোড়া” । ব্রহ্মার সৃষ্টির কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন সৃষ্টির মালমশলা রাখার কিছু পাত্রে শুধু তলানিই পড়ে ছিলো, কিছু

পাত্রে উদ্বৃত্ত। কিছু পাত্র বা তখন নিঃশেষিত। ঠিক সেই সময়েই তিনি "ঘোড়া" সৃষ্টি করলেন যা ছিলো তা দিয়েই। ব্রহ্মা, মুখ্যত "মরুৎ" আর "ব্যোম্"-এর উপর নির্ভর করেই সৃষ্টি করেছিলেন ঘোড়াকে। ক্ষিতি, অপ্ ইত্যাদি উপাদানে ঘাটতি ছিলো। এবং ঘোড়া তাই বিনা কারণে মুখ ওপরে তুলে প্রচণ্ড বেগে হাওয়ার মতো নবীন সবুজ তরুণ বিশ্বময় কেশর-উড়িয়ে দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগলো। তার দৌড়ের কোনো গন্তব্য রইলো না, দৌড়বার আনন্দের জন্যেই দৌড়তে লাগলো সে। পরে অবশ্য স্বার্থপর, ইতর-বুদ্ধি মানুষের অনুরোধে আদিম উদ্দাম ঘোড়ার উপর কিছুটা মেরামতি চালিয়ে তার সংস্কার করে ব্রহ্মা তার মৌল আকৃতি এবং স্বভাব দুই-ই বদলে দিয়েছিলেন। এই 'ঘোড়া' গল্প পড়েই আমার মনে হয় নারীকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ার পরই পুরুষকে গড়বার সময় বিধাতার কাঁচামালে নিশ্চয়ই কমতি পড়েছিলো।

গল্পটি পড়া না থাকলে পড়বেন। গল্পগুচ্ছর কোন্ খণ্ডে আছে মনে পড়ছে না এক্ষুনি। এত অপ্রাসঙ্গিক কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেলো সৃষ্টিকর্তার কথা ওঠাতেই। জানি না কেন, গভীর বনের মধ্যের ঊষাকালে বা নির্জন সন্ধ্যায় আমার কেবলই মনে হয় যে, আমি বা আপনি আমরা এই নব্য আধুনিকেরা, নানা ভাষা নানা জ্ঞানে ঋদ্ধ মানুষেরা ; বোধ হয় সব কিছু এখনও জেনে উঠতে পারিনি। এবং পারিনি বলেই, অবিশ্বাসী আমাদের দম্ভে এবং বদ্ধ-মনস্কতায় আমরা বিশ্বাসী অন্যদের প্রাকৃত ও মূঢ় বলে জেনে সহজ নিশ্চিন্তিতে গা ভাসিয়ে দিন কাটাই।

আপনাকে হয়তো ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কিন্তু ঊষাকালে যখন ঘুম-ভাঙা পাখির আধো-ফোটা স্বরে একে একে ক্রমশ ফুটে-ওঠা ফুলকলির মতো পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে ঘাসে ঘাসে, যখন বনের পাতায় পাতায় রাতভর জমে-থাকা নির্মল টলটলে শিশুর চোখের জলের মতো কোটি কোটি শিশির বিন্দুতে, প্রভাতী আলোর মসৃণ আভাস তাদের উপর হঠাৎ এসে পড়ে কোটি কোটি হীরের চমক তোলে এবং সেই চমক ভিজে প্রকৃতিতে পিছলে যায়, প্রতিসারিত হয়ে যায় বিশ্বময়, এক লহমায় ; তখন আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। যখন লক্ষ প্রজাতির পোকা-প্রজাপতি-পাখি-ফুল-ঘাস-পাতা-গাছ আমার চোখের সামনে নতুন করে তাদের নিজস্বতার ক্ষুদ্রতা বা বিরাটত্ব সমেত তাদের সার্বিক ঐকতানিক একীভূত সত্তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠে প্রতীয়মান হয় ; যা-কিছুকেই আমরা জায়মান বলে জানি—আমাদের এই চিরচেনা পৃথিবীতে তখনই মনের মধ্যে জেগে ওঠে এক অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের অনুরণন। মনে পড়ে যায়, রবীন্দ্রনাথের সেই গানখানির কথা 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে/আমি মানব একাকী বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে। তুমি আছ বিশ্বনাথ, অসীম রহস্য মাঝে, নীরবে একাকী আপন মহিমানিলয়ে।" ঠিক এমনই এক বোধ জাগে মনে, সন্ধে বেলাতেও। তখন পাতারা-ফুলেরা সব চোখ বোঁজে (কিছু অবশ্য তখনই আবার চোখ খোলেও), আলো নিভে আসে, সমস্ত শব্দ, সমুদ্রের বালুবেলায় আছড়ে-পড়া ঢেউ-এর ক্রমবিলীন হিজিবিজি বিড়বিড়ানিরই মতো থেমে আসে। নির্জনে চোখ-বুজে-আসা একটি দিনের নীরব মৃত্যুর মতো মহান কোনো জন্ম, উন্মেষ বা উন্মীলন আছে বলে তো আমার মনে হয় না। এমন এমন মুহূর্তে আমার দাম্ভিক বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক মনও বলে ওঠে, সেই গ্রীক দেবতাদের উদ্দেশ্যে খোদিত মন্দিরগাত্রের কথাকটিরই মতো "তুমি কে তা আমি জানি না। তবে তুমি যেই হও তোমাকে প্রণাম।"

অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে ফেললাম। বলতে চেয়েছিলাম আপনার বাবার আর্থরাইটিস্-এর ওষুধের কথা। তাই বলা হলো না।

কী অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স ! আমি আপনার কাকা-কাকীমা তেজেশ এবং শ্রুতিকে বলে এসেছি যে শুকনো মহুয়া পাঠিয়ে দেবো এখান থেকে। ওঁরা আপনাকে পাঠাবেন কলকাতায়। প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধ্যেতে শুকনো মহুয়া শুকনো তাওয়াতে গরম করে এক টুকরো ফ্ল্যানেলে জড়িয়ে নিয়ে হাঁটুতে সেঁক দিলে সাতদিনের মধ্যেই উনি ভালো হয়ে যাবেন। এই টোটকা আমার এক জবরদস্ত হাজামৎ-এর কাছে শেখা। সে এক সময় আমাকে তেল-মালিশ করতো। তখন আমি গাড়োয়াতে ছিলাম।

মহুয়া কলকাতায় পৌঁছলে, তা দিয়ে সেঁক দেওয়ার পর বাবা কেমন থাকেন তা জানাবেন। পঞ্চান্ন বছরে মানুষের গেঁটে বাত হবে কি ? সত্তরে তো মানুষ বিয়ে করে পশ্চিমের দেশে। বাবাকে সুস্থ করে তুলুন। এবং একবার মা-বাবাকে শীত থাকতে থাকতে এখানে পাঠিয়ে দিন। দেখবেন তাঁদের শরীর শুধু সম্পূর্ণ সুস্থ করেই নয়, বয়সও পনেরো বছর কমিয়ে পাঠিয়ে দেবো। প্রকৃতি-সঙ্গর মতো এমন শারীরিক ও মানসিক "হেল্‌থ-ক্লিনিক" আর নেই। কথাটা যে কত বড় সত্যি তা ওঁরা এলেই বুঝতে পারবেন। আধুনিক নগরভিত্তিক মানুষের নানা রকম শারীরিক ও মানসিক কষ্টর বেশিটুকুরই কারণ প্রকৃতি-বিযুক্তি। প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেই মানুষ তার মানুষের মতো শরীরে মনে বাঁচার পথ আবারও খুঁজে পাবে। নইলে নয়। নইলে তার ভবিষ্যৎ অতীব অন্ধকার। আপনার মা-বাবাকে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ জানাবেন। তেজেশ এবং শ্রুতিকেও বলে এসেছি আপনার মা-বাবাকে আসার অনুরোধ করতে। ওঁদেরও আসতে বলেছি।

দীর্ঘদিন নির্জনে থাকতে থাকতে আমার বেশি মানুষজন একেবারেই ভালো লাগে না। গ্রাম বা বনভূমিতে বসবাসকারী অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষদেরই এক ধরনের আদিখ্যেতা থাকে শহরে বসবাসকারী শিক্ষিত মানুষদের বর্ণাঢ্য জীবনযাত্রার প্রতি। মনে হয়, কোনো বিশেষ হীনম্মন্যতাতেও ভোগেন প্রথমোক্তরা। আমার কিন্তু একেবারেই উল্টোটি হয়েছে।

জঙ্গলের সরল সাদা গরীব মানুষদের সঙ্গে মিশে, আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে আমার পক্ষে শহরের "সভ্য ও শিক্ষিত" মানুষদের সহ্য করাই মুশকিল হয়ে উঠেছে ইদানীং। যেখানে তথাকথিত শিক্ষা, সেখানেই অসততা, ভণ্ডামি, খলতা, তঞ্চকতা। সাধারণভাবে শিক্ষার পরম গন্তব্য শিক্ষিতদের মধ্যে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করেছি বলেই নিজেকে শিক্ষিত বলতে লজ্জা বোধ করি। তাই শহুরে শিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে মেশামেশির ব্যাপারে আমি খুবই খুঁতখুঁতে। এই সব কারণেই সেই রাতে আমি ইচ্ছে করেই সংক্ষিপ্ত "হুঁ-হাঁ" করেই সেরেছিলাম আপনাদের সঙ্গে। আমার সম্বন্ধে কিছুই জানাইনি ইচ্ছে করেই। এই দু-দিনের জীবনে রুজি এবং জীবিকার কারণে প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষেরই এতো বাজে মানুষের সঙ্গে, ও এতো রকম বাজে কথাতে প্রতিটি দিন লিপ্ত হতে হয় যে যাঁদের এখনও মন বা স্বকীয়তা বলে কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে তাঁদের উচিত উদ্বৃত্ত ও একান্ত সময় এবং অবকাশটুকু অত্যন্ত নাক-উঁচু ও বাছ-বিচারসম্পন্ন হয়েই কাটানো। যাঁদের নিজের খুউব-ই ভালো না লাগে অথবা যাদের কাছ থেকে কিছু শেখার নেই তেমন মানুষদের সঙ্গে মেশার মতো দুর্দৈব একজন আধুনিক মানুষের জীবনে না আসাই ভালো। সময় কোথায় তার হাতে ? সময় নষ্ট করবার ? চিঠিটি সত্যিই বড় হয়ে গেলো। আপনি হয়তো ভাবছেন কী বাচাল !

সকলের কাছে নই কিন্তু।

শ্রুতির কাছে শুনলাম আপনার অনেকই গুণপনার মধ্যে একটি নাকি ভালো সোয়েটার-বোনা। এবং আপনি নাকি বাড়ির বেড়াল, পাড়ার কুকুর, পিসতুতো দিদির

জ্যাঠশ্বশুরের মাসতুতো ভাই সবাইকেই অক্লেশে এবং হাসিমুখে সোয়েটার বুনে দিয়ে থাকেন প্রতি বছরই। এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, সে সব বোনেন নাকি অশেষ—অবহেলায়, ইমরান খানের বোলিং, গাভাসকরের সেঞ্চুরী, বড়বাজারী ষাঁড়েদের মারামারি ইত্যাদি দেখতে দেখতে। আপনার দুটি হাতের চারটি আঙুলে ধরা সেলাইয়ের কাঁটারা অনর্গল যে কী অবহেলায় অসামান্য সব ফুল ফুটিয়ে যায় আপনার কোলের কাছে তা আপনি নজর করে দেখেনও নাকি পর্যন্ত ! আমাকে একটি সোয়েটার বুনে দেবেন ? হাতির হাত থেকে আপনার প্রাণরক্ষককে ? উলের দাম আমি দিয়ে দেব। দেব, মানে নিতেই হবে। তবে শ্রমের দাম দেবো না। সেটা হবে 'লেবার অফ লাভ'।

ইংরেজি ভাষাটার এই একটা মস্ত গুণ ! বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কর্মকাণ্ডর বার্তাবাহী কী অসাধারণ সুন্দর সব অভিব্যক্তি। বিনি পয়সায় মজুর খাটাবার নাম দিলো "লেবার অফ লাভ"। এই নইলে সারা পৃথিবীতে ও বানিয়ারা ব্যবসা ফেঁদেছিলো !

আমি নির্লজ্জর মতো এমন অশোভন অনুরোধ আদৌ করতাম না। কিন্তু আমার বড়সাহেবের স্ত্রী ভালোবেসে আমায় একটা ফুল-স্লীভস্ পুল-ওভার বুনে দিয়েছিলেন। বড়সাহেবের স্ত্রীদের ভালোবাসার বিপদ হলো এই যে তা না যায় ফেলা, না যায় গেলা। ওঁদের নানারকম খুশি পুরোতে না পারলেই বড়সাহেবের কাছে মিথ্যে করে লাগিয়ে মুশকিল বাধান ওঁরা। একাধিকবার অভিজ্ঞতা হয়েছে বলেই জানি। তাই 'না' করতে পারিনি। তিনি আমাকে এক বিশেষ চোখে দেখতেন। তখন আমি সারাণ্ডায় পোস্টেড ছিলাম। অনেক দিনের কথা। কপাল যথেষ্ট ভালো না হলে ভালোবাসা কপাল গড়িয়ে পড়ে যায়। থাকে না। আমার পুল-ওভারের রঙটা ছিল নেভি-ব্লু। গলায় সাদা কাজ করা ছিল। বুকের কাছেও ছিল মোটাদাগের সাদা ইংরিজি "ভি" অক্ষর। শীতের এক শেষরাতে কুম্‌ডি বাংলো থেকে আসছিলাম জীপ চালিয়ে। জোড্ডার বাইফারকেশান-এর আধমাইলটাক আগে পৌঁছে এতোই শীত করতে লাগলো যে জীপ থেকে নেমে পড়ে কাঠ-কুটো দিয়ে একটু আগুন করলাম পথের পাশে হাত সেঁকবার জন্যে। থামতে এমনিতেই হতো। কারণ ঠাণ্ডা ছাড়াও কুয়াশার জন্যেও জীপ চালানো প্রায় অসম্ভবই হয়ে উঠেছিলো। কিছুক্ষণ আগুনে হাত-পা সেঁকে নেবার পর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পুবের উপত্যকার দিকে মুখ করে সাতশো পাহাড়ের দেশে সূর্যোদয় দেখছি, ঠিক এমন সময় খুবই কাছ থেকে গুড়ুম্ করে বন্দুকের শব্দ হলো। গুলিটা হলো আমার সামনে থেকে। এবং আমার বুক-ফস্‌কে বন্দুকের গুলিটা পেছনের একটি বড় শালগাছে এসে লেগে একটি মোটা ডালে গেঁথে গেল। হতভম্ব হয়ে কী করব বুঝতে না পেরে ঐ ঠাণ্ডা পাথুরে, ভিজে পথেরই উপরে ধপাস্ করে বসে পড়লাম। পড়তেই দেখি, চিফ কন্‌সার্ভেটরের সদ্য বিলেত-ফেরত ফক্স-হান্টার শ্যালক বন্দুক হাতে এগিয়ে আসছে আমারই দিকে।

আমি ধড়ফড় করে উঠে চেঁচিয়ে বললাম, আমি ভালুক নই, ভালুক নই ! মানুষ !

তিনি একটি সংক্ষিপ্ত এবং উদ্বিগ্ন "লেহ্-হালুয়া" বলেই কুয়াশার মধ্যে হাপিস হয়ে গেলেন। বাংলোতে ফিরেই পুল-ওভারটা গা থেকে খুলে আমার খিদমদগারের বৌকে দান করে দিলাম। ভাগ্যিস তাগড়া পুরুষ আর ছিপছিপে নারীর বুকের মাপ একই হয়।

সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে বাকি জীবনে কোনো মহিলারই হাতে-বানানো ভালোবাসার সোয়েটার আর পরবো না। কিন্তু আপনার অসাধারণ প্রতিভার কথা শুনে, ফুল-স্লীভস্ পুলোভার একটাও নেই বলে, এবং শীতও ক্রমশ জেঁকে আসছে বলেই এই এস্· ও· এস্· পাঠালাম।

খারাপ-বেসেই বানাবেন। যে-ভালোবাসা, পুল-ওভারকে দেখতে "ম্যাটার্নিটি কোট" করে তোলে এবং একই প্রক্রিয়ায় মানুষকে অবলীলায় ভালুক বানিয়ে দেয় সেই ভালোবাসা থেকে দূরে থাকাই বোধহয় বাঞ্ছনীয়।

ভালো থাকবেন।

ইতি—রাজর্ষি

* * *

শ্রীরাজর্ষি বসু
বেতলা, পালাম্যু, বিহার,

বালীগঞ্জ প্লেস
২৬/১১/৮৭

প্রীতিভাজনেষু,

এই মাত্র চিঠি পেলাম। ভীষণই ব্যস্ত। আমার বয়-ফ্রেন্ড এসেছে একমাসের ছুটিতে States-এর হুস্টন থেকে। এই একমাস চিঠি ছোট হবে। এবং অনিয়মিত। রাগ করলে আমি নিরুপায়।

বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলাম যে আপনার ছেলেমেয়ের জন্যে সোয়েটার বুনে পাঠাবো। এবং প্রথম দিকের চিঠিতেই আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের কথা জানতেও চেয়েছিলাম। অথচ আপনিই ঐ প্রসঙ্গে কিছুমাত্রই লেখেননি আজ অবধি। তাই ভদ্রতার ও কুণ্ঠার কারণেই আর জানতেও চাইনি।

আপনার সর্বকনিষ্ঠা বা কনিষ্ঠ সন্তানের জন্যে আমি একটা কিছু আগে বুনে পাঠাতে চাই। দয়া করে তার একটি ফোটো কি পাঠাবেন ? সাম্প্রতিক ফোটো ? আপনার সোয়েটার বানাবার কথা আপাতত ভাবছি না কারণ আপনি মানুষ মোটেই সুবিধের নন মশাই ! যে-মহিলা ভালোবেসে পুলওভার বুনে দিলেন তাঁর অমন নিন্দা যদি আপনি করতে পারেন আমার কাছে, বিহাইন্ড হার ব্যাক এবং বলাবাহুল্য অন্য দশজনেরও কাছে, তাহলে আমার বোনা পুলওভার সম্বন্ধেও যে করবেন না তারই বা কোন্ গ্যারান্টি আছে ? তাছাড়া সোয়েটার তো হাওয়াতে বানানো যায় না। মাপ লাগে। আপনাকে এখানে আসতে হয় মাপ দিতে। নয় আমাকেই যেতে হয়। নইলে ওখানের অন্য কোনো মহিলাকেই বলুন যে আপনাকে বাহুলগ্না করে বুকের কোমরের বাহুর কব্জির এবং গলার মাপ নিয়ে আমাকে পাঠাতে। তাহলেও হবে। সেই দুর্ঘটনা কি শিগগির ঘটবে ? জানি না।

আমার মনে হয় যে আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী। তাই এতবার তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা সত্ত্বেও আপনি নীরবেই আছেন। সুন্দরী স্ত্রীদের স্বামীরা সচরাচর এ রকমই ব্যবহার করেন বলে শুনেছি। তবে তা অন্য পুরুষদেরই সঙ্গে। যাই হোক আমি আর এই বিষয়ে আপনাকে বিরক্ত করবো না। আপনার নীরবতার কারণ নিশ্চয়ই আছে। তবে আপনার কনিষ্ঠতম শিশুর একটি ফোটো পাঠাতে নিশ্চয়ই অসুবিধা নেই।

ভালো থাকবেন।

ইতি—ঋতি

পুনশ্চ এইমাত্র আপনার শুখা-মহুয়া এসে পৌঁছলো। ব্যবহারবিধি পুরোপুরি মানা হবে কিন্তু তারপরও যদি ফল না পাওয়া যায় তাহলে আপনার ঘোরতর বিপদ জানবেন। বাবা তো বলছিলেন, হাঁটুতে এখন শুধুই ব্যথা আছে। শুখা-মহুয়া ঘষে ব্যথার সঙ্গে উপরি ঘা-টাও যোগ হবে।

আমি তবু ইনসিস্ট্ করেছি। বলেছি, অরণ্যদেবের ওষুধ কি বৃথা হতে পারে? মাও আমারই দলে।

মুখ রাখবেন আমার, অরণ্যদেব।

* * *

রাজর্ষি বসু
বেতলা, পালাম্যু, বিহার

২৯/১১/৮৭
বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১১

অরণ্যদেব,

একী রসিকতা আপনার! আজ সকালের পোস্টে আপনার পাঠানো একটি বাঘের বাচ্চার ফোটো পেয়েছি।

আমি বেরসিক নই। কিন্তু রসিকতা দুর্বোধ্য হলে আখরোটের খোসার মতো তাকে মিছে দাঁত দিয়ে ভাঙতে গিয়ে দাঁত ভাঙার মতো সময় অথবা মূর্খামি দুই-এর কোনোটাই আমার নেই। আমি বাঘের বাচ্চাটির যাতে গায়ে হয় তেমন মাপেরই একটা হাফ স্লিভস সোয়েটার বুনে শিগগিরই পাঠাবো। ফুল-স্লিভস্ কোনো পোশাকই বোধহয় বাঘেদের পরা অভ্যেস নেই। উলের জিনিস কিছুদিন পর ধোওয়া-ধুয়ি বেশি হলে আবার লম্বা হয়ে যায়। ফুল-হাতা লম্বা হয়ে গেলে মানুষেরই অসুবিধে হয় আর বাঘের তো হবেই! শিকারই ধরতে পারবে না বেচারী। এই বাছাধন কি আপনার পোষা? না আপনার স্ত্রী অথবা শিশুদের খেল্না? আপনারাও কি সিমলিপালের (যোশীপুরের) ডঃ সরোজ রাজচৌধুরীর খৈরিরই মতো একে পুষবেন বলে মনস্থ করছেন? খৈরীকে আমি একাধিকবার দেখেছি। আমার বাবার সঙ্গে চৌধুরী সাহেবের বিশেষ হৃদ্যতা ছিলো।

আমার বয়-ফ্রেন্ড অশেষ আগামী সপ্তাহের শনিবার চলে যাবেন। তার পর বড় করে চিঠি দেব। ফিজিসিস্ট! নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট! আগামী বছর শীতে আমাদের বিয়ে হয়তো হবে। হলে, আমাকেও চলে যেতে হবে হুস্টনে। তার আগেই অরণ্যে অরণ্যে যতখানি বিচরণ সম্ভব তা করে নিতে চাই।

আমার বিয়েতে আপনাকে আস্তেই হবে কিন্তু। এক বছরের নোটিস দিয়ে রাখলাম। আজ শেষ করছি।

ইতি—ঋতি

বালীগঞ্জ প্লেস
৪/১২/৮৭

রাজর্ষি, প্রীতিভাজনেষু,

কেন, উত্তর নেই কোনো ? কী ব্যাপার ! ব্যাপার কি ?

রাগ হলো নাকি আমার ওপরে কোনো অজ্ঞাত কারণে। যে-সম্পর্ক দানাই বাঁধলো না এখনও চিঠি-চাপাটিতে সবে "ওয়ার্মিং আপ দ্য ব্যারেল্সই" হচ্ছে তার মধ্যেই তা ছিন্ন হয়ে গেলে আমার বলার কিছুই নেই। তাহলে বলতেই হবে যে পত্রমিতালির ভাগ্য আমার খুবই খারাপ্।

আমি কিন্তু বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে। এবং আদুরে মেয়ে। আমার সঙ্গে কেউ অন্যায় বা খারাপ ব্যবহার করলে আমি কিন্তু 'ভ্যাঁ' করে কেঁদে ফেলি। এখনও। আশা করি আপনি তা করবেন না। আমার সমস্ত খবরাখবরই আমি আপনাকে অযাচিতভাবে দিয়ে বোধহয় আপনার কাছে নিজেকে সস্তা করে ফেলেছি। ভারী লজ্জা করে।

আপনি বসে আছেন প্রাগৈতিহাসিক কাছিমের মতো। শক্ত খোলার ভিতরে সুরক্ষিত হয়ে। নিজের অন্তরঙ্গকে পুরোপুরিই লুকিয়ে। বহিরঙ্গর পিঠ উঁচিয়ে। খুব খারাপ আপনি ! বাবার হাঁটুর কিন্তু দারুণ উন্নতি হয়েছে। বাবা আপনাকে জানাতে বললেন। এখন বেশ সহজেই চলা-ফেরা করতে পারছেন। দোতলা একতলাও করেছিলেন কালকে। এবারে কলকাতায় এসে এই প্রথম নিজের ঘরে বসে না খেয়ে ডাইনিং-রুমে নেমে এসে, সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেলেন। বলছেন, এইরকম উন্নতি হলে দুতিনদিনের মধ্যে হাঁটতেও যাবেন লেক্-এ।

অনেকই ধন্যবাদ আপনাকে। আমার বাবাকে ভালো করে তোলার জন্যে। কলকাতার কোনো ডাক্তারই যা পারেননি আপনার "হাজামৎ" ডাক্তার তাইই করে দিলেন। ভালো থাকবেন।

ইতি—ঋতি

পুনঃ "হাজামৎ" শব্দটির অর্থ কি ?

The Online Library of Bangla Books

* * *

ঋতি রায়, কলকাতা
২/১২/৮৭

এইচ ই সি অফিসার্স কলোনী
হাটিয়া, রাঁচী

প্রিয় ঋতি,

তোর পাঠানো প্যাকেটটি পেয়েছি। তেজেশ-এর চেনা এক ভদ্রলোক আগামী শনিবারে বেতলা যাবেন উইক-এন্ডে, তাঁর হাতে অরণ্যদেবের কাছে পাঠিয়ে দেবো বলে মনস্থ করেছি।

তুই সত্যি পারিস! কথায় কথায় চিঠি লেখার অভ্যেস তোর এখনও অটুট আছে আর আমার তো এক লাইন লিখতেই গায়ে জ্বর আসে। তবে তোকে যখন লিখি, কিছু রেখে-ঢেকে ফর্ম্যালিটি করে লিখতে হয় না বলে মনেই হয় না যে চিঠি লিখছি।

অশেষ থাকতে থাকতে যেতে পারলে সত্যিই মন্দ হতো না। ও আরও কতো বিদ্বান হতে চায় তা জানতে ইচ্ছে করে! এবারে থিতু হতে বল। তুই যে চিরকাল স্টেডি নাও থাকতে পারিস তা ওর এতোদিনে জানা উচিত। তোকে আমি অশেষের চেয়ে অনেকই বেশিদিন ধরে এবং অনেকই বেশি কাছ থেকে চিনি। তোর মতো চপলমতি-বালিকা বড় একটা দেখিনি। যদিও এই কথাটা তুই নিজে স্বীকার করিসনি কোনোদিনও।

যাক্, যে খবরটা তোকে সবচেয়ে আগে দেওয়া উচিত ছিল সেটা ইচ্ছে করেই দেরিতে দিচ্ছি। আমাদের অরণ্যদেব কিন্তু একা। ফর ইওর ইনফরমেশন। তবে বনকুমারের কৌমার্য অটুট নেই। তা বলে ভাবিস না অরণ্যে কোনো নারী তার উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। ঘটনা এই যে বছর দুয়েক আগে তার সঙ্গে নারীজাতির একটি নমুনার বিয়ে হয়েছিল। তিনমাস ঘরকন্না করার পর বনকুমারকে ছেড়ে সেই নগরদুহিতা চলে যান। পিতৃগৃহেই কি না তা সঠিক জানি না। তবে কলকাতায়ই। ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। শুনেছি, ডিভোর্সও হয়ে গেছে। ওদের একটি মেয়েও আছে। যার বয়স এখন পৌনে দু'বছর। অতএব বৎসা ঋতি, ভালো করে দেখেশুনে পা ফেলো। জঙ্গলে বেড়াতে যাবার একটি পার্মানেন্ট, নিখরচার আস্তানা জোটাবি ভেবেছিলি বেশ দাদা-ফাদা পাতিয়ে এবং তাঁর আনসাস্পেক্টিং স্ত্রী—মহিলাকেও (যদি তিনি থাকতেন) বৌদি পাতিয়ে কায়দা করবি। যে অ্যাপারেন্টলি ইনোসেন্ট কিন্তু পোটেন্সিয়ালি ডেঞ্জারাস পদক্ষেপ তুই নিচ্ছিলি তা একেবারেই বানচাল হয়ে গেল। দেখলি তো! একেই একা পুরুষ যথেষ্ট বিপজ্জনক। তায় আবার অভিজ্ঞ হলে তো একেবারেই সোনায় সোহাগা। ওকে এখন টাইট-রোপ ওয়াকিং করতে হবে। তোর হাতে আছে অশেষ। আর ঝোপে রাজর্ষি। সুকন্যা, মনে রেখো, 'আ বার্ড ইন হ্যান্ড ইজ বেটার দ্যান টু ইন দ্যা বুশ'। হাতের পাখির দিকে নজর রেখো, তাকে নিয়মিত দানাপানি খাইও; নইলে বিপদ হতে পারে।

আমি জানি, তুই অবশ্যই জানতে চাইবি এ চিঠির উত্তরেই যে এতো সব তথ্য আমি

জানলাম কী করে রাঁচীতে বসেই ?

তোর কেতকীকে মনে আছে ঋতি ? গায়েপায়ে বড় বড় লোম ছিল। খুবই রোগা ছিল বলে মোটা দেখাবার জন্যে ক্যাটক্যাটে রঙা সব বিচ্ছিরী অথচ দামী শাড়ির নিচে চারটে করে পেটিকোট পরে আসতো কলেজে। ফলস্-কাপ্ লাগানো ব্রেসিয়ার পরতো ? মনে পড়েছে ? সেই কেতকীর স্বামী এখন রাঁচীতে। শুনেছি তিনি কোনো প্রাইভেট-সেক্টর ফার্ম-এর হোমরা-চোমরা। কেতকীর একদা অস্থিসার কোমরে এবং মাংসহীন বক্ষদেশে রুখু পাহাড়ী নদীর বুকে হঠাৎ-নামা ঢল্-এরই মতো যে কী প্রকার মাংসর ঢল নেমেছে তা না দেখলে তুই বিশ্বাসই করবি না। কাঁচা মাংস আর স্বামীর পারচেজ ডিপার্টমেন্টের কাঁচা টাকায় কেতকীকে এখন নদনদে শুয়োরীর মতো দেখায়। আমরা কলেজে যার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতাম না, স্বামীর পদমর্যাদার জোরে সে মেয়েরই এতোই দেমাক হয়েছে যে কী বলব তোকে ! অথচ নিজস্ব বলতে না আছে তেমন রূপ না আছে বলবার মতো কোনো গুণ। স্বামীর জন্যে শরীর এলিয়ে শোয়াকে যদি গুণ বলে না ধরিস। অবশ্য কেতকীর বাবার পয়সার জোর ছিল। এক একদিন এক একটা গাড়ি করে আসতো।

জানিস, আমি এইসব নারীর উদাহরণ দেখি আর ভাবি যে একদিকে আমরা "উইমেনস্ লিব্" বলে চেঁচাবো আর অন্যদিকে স্বামীর পরিচয়ে স্ফীত হবো, হয়ে তার গ্রেট-ডেন কুকুর বা মার্সিডিস গাড়িরই মতো স্বামী-নিলয়ের শোভা বর্ধন করবো অথবা আক্ষরিকার্থেই তার ধারক ও সন্তানের বাহক হয়েই থাকবো এটা কেমন কথা ? "লিবারেশন" ব্যাপারটা অনেকই বড় ব্যাপার। নিজেদের কাছে নিজেরাই যতদিন না সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার যোগ্য করে তুলতে পারছি নিজেদের, বিবেকের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছি ; ততদিন পুরুষ মানুষের মতো ধান্দাবাজ, ইতর, অত্যাচারী কোনো প্রাণী আমাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেবে এটা আশা করাই পরম মূর্খামি।

যাকগে কেতকীর কথা। উপযাচিত হয়েই দূত অথবা দূতী চিরদিনই অবধ্য। অর্থাৎ প্রণিধানযোগ্য নয়। এখন দূতী আমাদের অরণ্যদেবের কী সংবাদ আনলো তাই শোন্। জানলাম, অরণ্যদেবের আগের স্ত্রীর নাম ছিল বনী। বন থেকে বনী। দারুণ নাম না ? বনে এসে টিয়াপাখির মতো রাজর্ষির বাংলো সে কাকলিমুখরও করে তুলেছিল। কিন্তু তারপরই তিনমাসের মাথাতেই ছাড়াছাড়ি। ছাড়াছাড়িটাও বেশ রহস্যজনক। তোর বিয়ে হলে তারপরই তুই জানতে পারবি যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে যে কোথায় চাপ, কোথায় চিড়, কোথায় খিচ তা বাইরে থেকে বোঝা আদৌ সহজ নয়। এক বাড়িতে থেকেও বোঝা সম্ভব নয় অনেক সময়। তাই কারো দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধেই অন্য লোকের মুখের কথা আমি বিশ্বাস করি না। দেখতে পাই যে ভেঙে-যাওয়া বিয়ের বেলায় স্বামীর আত্মীয়রা চলে-যাওয়া স্ত্রীর ওপরেই দোষ দেন আর স্ত্রীর আত্মীয়রা দেন স্বামীর ওপরে। স্বামীর আত্মীয়রা দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো সহজেই বলে বেড়ান যে স্ত্রী "দুশ্চরিত্রা", তাই....যেহেতু চরিত্রই হচ্ছে মোস্ট ইনট্যানজিবল অফ অল ইনট্যানজিবল্ অ্যাসেটস্ তাই অখণ্ড কর্মহীন অবসরের বঙ্গভূমে চরিত্র-হননের মতো অতো সোজা কাজ বোধহয় ছারপোকা-নিধনও নয়। স্ত্রী-পুরুষ-যুবা-বৃদ্ধ সকলেই এই কাজে দারুণই দড়।

স্ত্রীর আত্মীয়রাও অম্লানবদনে বলে বেড়ান যে স্বামী "ইম্পো" বা "নিমরদ"। যদি সেই বদনামী পুরুষ কোনোদিন ঘুরে দাঁড়িয়ে এমন কোনো নারী রটনাকারীকে তার পৌরুষের সবল প্রমাণ দিতে প্রয়াসী হন তবে রটনাকারীর অবস্থা যে কী হতে পারে এটা কেউই একবারটি ভেবেও দেখেন না।

কেতকীর কথার দাম আমার কাছে বিশেষ নেই। তবে রাজর্ষি বসুর যে ডিভোর্স হয়ে গেছে এবং দু'বছর আগে তার স্ত্রী বনীর সঙ্গে তিনি যে মাত্র তিনটি মাস একসঙ্গে ছিলেন এই খবর রাঁচী এবং ডালটনগঞ্জের ওয়াকিবহাল মহিলা-মহলের প্রায় সকলেই জানেন। কেতকীর খবরে ভেজাল নেই।

তাই বলছি, আর যাই করিস প্রেমে পড়িস না রে পোড়ারমুখী ! তোর প্রেমে পড়ার ক্ষমতা এমনই অসীম যে টেবল-চেয়ার গাধা-গরু এমনকি যে কোনো পুরুষমানুষেরও প্রেমে তুই পড়তে পারিস অবহেলায়। সেই জন্যেই তোকে ভয়।

আমরা তো আউট হয়ে গেছি। লম্বা ইনিংস খ্যাল। উইকেটের চারদিকে স্পারকলিং সব বাউন্ডারি মেরে খেল। অনেকক্ষণ উইকেটে থাক। এইই প্রার্থনা।

ভালো থাকিস। মাসীমা মেসোমশায়কে প্রণাম দিস।

—ইতি তোর শ্রুতি

রাজর্ষি বসু
বেতলা, পালাম্যু, বিহার

৫/১২/৮৭

প্রীতিভাজনেষু,

আমি জানি না কী করে আপনার কাছে ক্ষমা চাইব। কাল শ্রুতির কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি একটি। ওর চিঠিতেই আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানলাম। আপনি যে এখন একা এবং আপনার স্ত্রী যে দু-বছর আগে চলে গেছেন বিয়ের মাত্র তিন মাস পরে এ কথা জানার পর দুঃখিত হয়েছি খুব। আপনার সঙ্গে অত্যন্ত অবচীনের মতোই হাসি-ঠাট্টা করেছি যে, তার জন্যে আমি নিঃশর্তে ক্ষমা চাইছি। শ্রুতি একথাও লিখেছে যে আপনাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে।

আশা করি আপনার ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবো না, বিশেষ করে অপরাধ যখন অনিচ্ছাকৃত। সত্যিই ভারী খারাপ লাগছে।

বাবা গত তিনচার দিন থেকে অনেকখানি করে হাঁটছেন। একেবারেই অন্য মানুষ হয়ে গেছেন উনি। শারীরিকভাবে। একটি টুপি এবং ডোমিনিক ল্যাপিয়েরের 'সিটি অফ জয়' বইটি পাঠিয়েছিলাম। পেয়েছেন কি ? জানাবেন। শ্রুতির চিঠিটি পড়ে আমি এতোখানিই আপসেট হয়ে পড়েছি যে এক্ষুনি আপনাকে কি লেখা উচিত এবং আদৌ কিছু লেখা উচিত কি না তা বুঝতেই পারছি না। এবং পারছি না বলেই অত্যন্ত নার্ভাস বোধ করছি। আপনি আমার এই নিরুপায় বিস্রস্ততা ক্ষমা করবেন। ভালো থাকবেন। খুবই ভালো থাকবেন সবসময়। আপনার মতো পুরুষকে দুঃখ দিতে পারে এমন সাধ্য কোনো মেয়েরই নেই। এটা আমার বিশ্বাস। আপনার সম্বন্ধে সামান্যতম জেনে এবং আপনাকে অন্ধকারে একঝলক দেখেই এই কথা বলছি। অনেককে দীর্ঘদিন কাছ থেকে জেনেও জানা হয়ে ওঠে না আবার কারো সঙ্গে স্বল্পকটি চিঠির আদান-প্রদানের মাধ্যমেও এমন এক সখ্য গড়ে ওঠে

যে তা অতি নিবিড়। সম্পর্কের নানারকম হয়। জানার নানা ধরন।

মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল, আমি আপনার কেউই নই, কিছুই করতে পারি না আমি আপনার দুঃখর নিরসনের জন্যে তা অত্যন্ত স্থিরভাবে জেনেও।

আপনি ভালো না থাকলে আমার ভারী খারাপ লাগবে। ভালো থাকবেন। আনন্দে থাকবেন সবসময়ে।

প্লীজ !

এবং নিরুত্তর থাকবেন না।

ইতি আপনার শুভার্থিনী ঋতি

৩/১২/৮৭
বেতলা

ঋতি, কল্যাণীয়াসু,

তোমাকে আরও দীর্ঘদিন "আপনির" চৌকাঠে দাঁড় করিয়ে রাখাটা সমীচীন মনে করলাম না।

একটি যুক্তিগ্রাহ্য সময়-সীমার মধ্যে 'আপনিকে' 'তুমি' না করতে পারলে পরে আর করা হয়ে ওঠে না।

আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক আছেন যাঁর স্ত্রী তাঁকে 'আপনি' সম্বোধন করেন বিয়ের বারো বছর পরেও। এবং তাঁর স্ত্রীকে তিনি সম্বোধন করেন 'তুই' বলে। পাছে তুমি আমার হিতার্থী বন্ধু হিসেবে আজীবন আপনির বাধো-বাধো ফ্রেমেই না আটকে থাকো তাই সময়মতোই তোমাকে তুমির ঘরে নামিয়ে আনলাম। যে-বাঘের বাচ্চাটির ছবি তোমাকে পাঠিয়েছি সেটি আমারই বাচ্চা। যদিও আমি তার জনক নই এবং তার মাও আমার স্ত্রী নয়।

মানুষ হিসেবে, ঔরস এবং গর্ভ ছাড়াও অনেকই প্রাণের উন্মেষ ঘটাই আমরা ; ধারণ করি সযত্নে দীর্ঘদিন, প্রাণের প্রাণ। তার কিছু জাগতিক, কিছু মানসিক। সেই সুবাদেই ঐ বাচ্চাটি আমারই।

ওরা চিড়িয়াখানার প্রাণী নয়। মুক্ত, স্বাধীন। বাধাহীন ওদের জীবন। সবচেয়ে বড় কথা ঋতি, ওদের চারধারে কোনো অদৃশ্য মানসিক গরাদের ঘের পর্যন্ত নেই, যা আমার তোমার এবং সমস্ত মানুষেরই আছে। মানুষের মতো পরাধীন প্রাণী, সেদিক দিয়ে বিচার করলে, বোধহয় খুব কমই আছে।

ঐ বাচ্চাটির বাঘিনী-মা অন্য বাঘের সঙ্গে মিলিত যেদিন হয়েছে বলে খবর পাই সেদিন থেকেই তার ওপর নজর রাখতাম। তারপর থেকেই তার রক্ষণাবেক্ষণ করতাম যতখানি সম্ভব। যৌথ পরিবারের বড় জা যেমন গর্ভিনী ছোট জায়ের জন্যে করে।

বাচ্চারা আসার আগে যাতে তার অযথা কষ্ট না হয় সে জন্যে যে-গুহাতে সে আস্তানা নিয়েছিলো তার কাছেকাছেই গরু-গাধাকে খাদ্য হিসেবে বেঁধে দিতাম। ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে যতদিন না বাচ্চারা বড় হয় ততদিনও ঐ ভাবেই খাবার দিতাম। দিনে রাতে চব্বিশ

ঘণ্টা গুহার তিনদিকের উঁচুগাছে রাইফেল দিয়ে ফরেস্ট গার্ডদের বসিয়ে রেখেছিলাম যাতে বাঘিনীর সঙ্গী বাঘ এসে তার নিজেরই ঔরসজাত বাচ্চাদের খেয়ে না যায়। পুরুষ মানুষেরই মতো, সব প্রজাতির পুরুষরাই সাধারণত স্বার্থপর এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়। বাঘের বেলাতেও তাই ভয় ছিলো।

আমার এই বাচ্চাকে কোনোদিন কোলে নিতে পারিনি আমি। আদর করিনি। চুমুও খাইনি একটি বারও। যদিও ইচ্ছে ছিলো খুবই। তবু এদের জন্মমুহূর্ত থেকেই দূরবীন দিয়ে দেখেছি ওদের। আমার উৎসুক চোখের সামনে শশীকলার মতো বেড়ে উঠেছে এরা। বড় বড় কান নিয়ে ছোট-ছোট বাচ্চারা যখন কালো পাথরের গুহার সামনের খোলা চ্যাটালো পাথরে রোদের মধ্যে বসে থাকতো, এ ওর ঘাড়ে উল্টাতো পাল্টাতো তখন ভুলেই যেতাম যে ওরা আমারই জাতক নয়।

তারপর ধীরে ধীরে ওরা আমারই চোখের সামনে আমার আংশিক রক্ষণাবেক্ষণেই বড় হয়ে উঠতে লাগলো।

এখন ওরা মস্ত যুবক-যুবতী। এ বছরই গরমের সময় ওরা যার যার মনের মতো সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হবে এ জঙ্গলেই। বা দূরের কোনো জঙ্গলে। কোনো দেওয়াল ওদের আটকাতে পারবে না। যেখানে খুশি সেখানে হেঁটে যায় ওরা প্রতি রাতে। প্রয়োজনে বিশ-তিরিশ মাইল।

যে-বাচ্চাটির ছবি পাঠিয়েছি তোমাকে তাকে একবার একদল জংলী কুকুর তাড়া করে প্রায় ধরেই ফেলেছিলো। কীভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে আমি এবং আমার একজন ফরেস্ট গার্ড যে তাকে বাঁচিয়েছিলাম তা আমরাই জানি।

জঙ্গলেই আমার বাস। জঙ্গলই আমার জীবন। তাই, ওরাই তো আমার সব!

ওকে আমার বাচ্চা বলে ভাবতে তোমার এতো আপত্তি কেন ? তাছাড়া এই সব বাচ্চারা মানুষের বাচ্চাদের চেয়ে অনেকই ভালো। ওদের মা-বাবাদের যেমন ওদের কাছ থেকে কোনো প্রত্যাশা নেই ; ওদের নেই বাবা-মায়ের কাছ থেকে কিছুমাত্রই। অবশ্য জন্মের পরের একটি সীমিত সময় পর্যন্ত নিজেরা শিকার ধরে খেতে না-শেখা পর্যন্ত ওরা মায়েরই মুখাপেক্ষী। বাবার নয়। তারপরেই ওরা স্বাধীন স্বরাট। বাবা-মা ভাই-বোন কারো সঙ্গেই ওদের সম্পর্ক থাকে না। আর থাকে না আত্মীয়তা-কুটুম্বিতাও। বোনের সঙ্গে ভাই সঙ্গম করে। বোনপোর সঙ্গে মাসী। একা আসে, একা যায়, পেটের খিদে জাগলেই শিকার করে খায়, মিলনের বাসনা হলেই সঙ্গী বা সঙ্গিনী খুঁজে দিন কয় সাধ মিটিয়ে মিলিত হয়ে আবার যে যার পথে হেঁটে যায়। নিজেদের একাকিত্ব বা স্বাধীনতা অন্য কাউকেই ওরা বাধা দেয় না চোখ বুঁজে। মনের কারবার করতে গিয়ে, রুচির, পছন্দ-অপছন্দের শিক্ষার, অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্যে সর্বস্বহৃত হয়ে মানসিকতার চড়াই-উতরাইয়ে ওরা পথ হারায় না মানুষের মতো কোনোদিনও। "সংস্কৃতি" শব্দটার সঙ্গে ওদের পরিচয় পর্যন্ত নেই। "প্রেম" নামক কোনো রক্তক্ষয়ী বোধে ওরা ক্লিষ্ট হয় না কখনও। বিবাহ নামক চুক্তিবদ্ধ আনন্দ অথবা দুঃখের ঘরে তারা বাজি পুড়িয়ে, সানাই বাজিয়ে, লোক খাইয়ে সাড়ম্বরে প্রবেশ করে না মাথা নিচু করে কোনোদিন মধ্যরাতে চোরের মতো সাড়া না তুলে বেরিয়েও যেতে হতে যে পারে তা জেনেও। ওদের জীবন রক্ত-মাংসর। কামড়াকামড়ির। অতি স্থূল। তাই বড় সহজ সুখের। সূক্ষ্মতা আর দুঃখ তো সমার্থক। মানুষদের বিশেষত শিক্ষিত মানুষদের নিজস্ব এই সব বিশেষ বালাই বাঘেদের আদৌ নেই। সমাজই নেই ওদের, তাই সমাজের পরোয়াও নেই। দারুণ এক একাকী স্বাধীন স্বয়ম্ভর জীবনের ভাগীদার ওরা প্রত্যেকে।

ওদের অতি কাছ থেকে দিনের পর দিন দেখে ওদের আমি সত্যিই ঈর্ষা করি ঋতি। মনে হয়, মানুষের মতো মানুষ না হতে পারলে বাঘ হওয়াও ভালো ছিলো। তাই মনে কোরো ও আমারই বাচ্চা। পুলওভার নাই বা বানালে ওর জন্যে। ছবিটি তোমার শোওয়ার ঘরের ড্রেসিং-টেবিলেই রেখে দিও। তোমার মিথ্যে অরণ্যদেবের স্মৃতি হিসেবে।

বড় শীত পড়ে গেছে এখানে। এদিকে হাতির অত্যাচারও বেড়েছে গ্রামে গ্রামে। গরিব মানুষগুলোর বড়ই বিপদ। এখুনি বেরোতে হবে। সারা রাত এই ঠাণ্ডায় জীপে করে ঘুরতে হবে কেঁড় থেকে মারুমার। মুণ্ডু থেকে কুমাণ্ডি। কুমাণ্ডি থেকে লাত্। কোনোদিন নেতারহাটের পথে বানারি পর্যন্ত। কোন্ দিন যে হাতি কোন্ গ্রামে হানা দেয় কে জানে! শীতের রাতে চোরা-শিকারিদের উপদ্রবও বাড়ে।

গতকালই বেত্লার কাছেই একটি চিতল হরিণকে মেরেছিলো শিকারিরা। দিনে দিনে ভারতবর্ষের সর্বত্র এই চোরা-শিকারিরা যেমন বেপরোয়া হয়ে উঠছে তাতে মনে হয় যে প্রত্যেক রাজ্যের বনবিভাগেরই অদূর ভবিষ্যতে নিজস্ব কম্যাণ্ডো বাহিনী রাখতে হবে। যে অগণ্য মন এবং অগম্য বন জয় করা যেতো শুধুই ভালোবাসা দিয়ে যদি তা নিঃস্বার্থ ও প্রকৃত ভালোবাসা হতো এবং যদি তা থাকতো দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রথম দিনটি থেকেই তাহলে হয়তো আজকে কথায় কথায় আমাদের কম্যাণ্ডো বাহিনী তলব করতে হতো না, সমস্ত ক্ষেত্রেই। সততাতে ভেজাল ঢুকে গেলে কোনো কম্যাণ্ডো বাহিনীরই সাধ্য নেই তা মেরামত করে।

মানুষের ওপরে, মানুষের সমাজের উপরে, মানুষের রাজনীতির উপরে ক্রমশই আস্থা হারিয়ে ফেলছি ঋতি। আমার দেশকে, দেশের মানুষকে ভালো না বাসলে অতি সহজে অন্যদের মতো সুখী হতে পারতাম। পারলাম না। পারি না। তাই তো বাঘের বাচ্চাকে নিজের বাচ্চা বলে পরিচয় দিতে গিয়ে শ্লাঘাতে বেঁকে যাই।

অশেষ কি হুস্টনে চলে গেছেন? তোমার ফিয়াঁসেকে নিয়ে আমার কাছে চলে এলে না কেন দু-তিনদিনের জন্যেও? পছন্দের মানুষের সঙ্গে অরণ্যে এলে সেই পছন্দর কাঁচা আমে পাক ধরে। প্রেম হয়। আর প্রেমিককে নিয়ে বনে এলে প্রেম পেকে টন্‌টন্ করে। তার রঙ হয়ে ওঠে সিঁদুরে লাল। ফিরে গেলেই নির্ঘাৎ বিয়ে। আম খসে যায় টুক্ করে। এখনও আসতে পারো। শুধু পৌঁছে যাওয়াটাই দরকার। বাকিটা আমারই ওপর ছেড়ে দিও। পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবার আগে প্রকৃতি হয়তো অশেষকে ঐ সর্বনাশা পথ থেকে নিবৃত্তও করতে পারতো। পৃথিবী যদি বেঁচে যায় আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে তবে তাকে অরণ্য-প্রকৃতি আর মানুষের অন্তর-প্রকৃতিই শুধুমাত্র বাঁচাতে পারে। নইলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

ভালো থেকো।

ইতি—রাজর্ষি

ফিরে,

তোমার এম. এ. পাশের বছর থেকে ব্যাক-ক্যালকুলেশান করে দেখলাম জ্ঞানে-বুদ্ধিতে বড় হলেও বা হতে পারো কিন্তু বয়সে তুমি আমার চেয়ে কমপক্ষে সাত-আট বছরের ছোটই হবে। পড়াশুনোতে বেশি মেধাবী হওয়ায় আরও কম বয়সে এম. এ. পাশ করে থাকলে আরও ছোটও হতে পারো। তাই “তুমি”। আশা করি এতে তোমার সম্ভ্রান্ততায় বা ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগবে না—র

ঋতি রায়
কলকাতা

বেতলা
৬/১২/৮৭

কলাণীয়াসু,

তোমার দুখানি চিঠি একই সঙ্গে পেলাম । পেয়েছি গতকাল । গত রাতে এখানে খুব এক চোট ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেলো । কিন্তু সকাল থেকেই আকাশ পরিষ্কার । কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে । ঝক্‌ঝকে রোদ । মোটা গরম পাজামা পাঞ্জাবী পরে তার ওপরে গরম-খাদির জহর কোট এবং মোটা আলোয়ান চাপিয়ে বারান্দায় বসে তোমাকে চিঠি লিখছি । আজ রবিবার । তোমার পাঠানো দারুণ টুপিটা বিশেষ বিশেষ অকেশানে এবং রাতের টহলে বেরুবার সময় ব্যবহার করছি । খুবই নরম, গরম এবং আরামের টুপি । অনেক ধন্যবাদ তোমাকে । এবং বাবাকেও । কিন্তু আজ চতুর্দিক থেকে যেমন এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে তোমার ভীষণ অপছন্দের বাঁদুরে টুপিকেই তলব করতে হয়েছে । অবশেষে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়েছে যে দেশোয়ালি পোশাক ছাড়া দেশোয়ালি শীতের মোকাবিলা করা যায় না । এবারে ঠাণ্ডা তো বেশ দেরী করেই এলো মনে হচ্ছে, গতরাতের বৃষ্টির নোটিস জারি করে এখানে ঠাণ্ডা যেন তার রাজধানী অন্য স্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে রাজার মতোই পাটে বসলো আজ থেকে ।

চারদিকে মরা আর ঝরা পাতার ভীড় । আমার বাংলোর সীমানার কাছে একটি শিমুলতলিতে বিচিত্র-বর্ণর ঝরা পাতার স্তূপের মধ্যে একটি হলুদ-বসন্ত পাখি মরে পড়ে আছে । বারান্দাতে বসেই দেখতে পাচ্ছি ।

এক সময় হলুদ-বসন্ত আমার প্রিয়তম পাখি ছিলো । যখন আমি ছোট ছিলাম । অবুঝ ছিলাম । যখন ভালোবাসবার ও ঘৃণা করারও ক্ষমতা অসীম ছিলো । যখন যে-কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছে যেতে পারতাম টর্নাডোর ঝড়ের মতো দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে ছুটে কিন্তু হলুদ-বসন্ত পাখির প্রতি ভালোবাসারই মতো আমার বুকের মধ্যে আজ অনেক কিছুই মরে গেছে, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে । অনেক কিছুই ঝরে গেছে শীতের ঝরা-পাতারই মতো আমার বুক থেকে ।

তুমি পাহাড়ে জুম্‌-চাষ দেখেছো ?

শূন্যতার মধ্যে আবার জন্মেওছে কিছু । আমি আজ জেনেছি যে এই জীবনে, পৃথিবীতে ; কিছুমাত্রই কেড়ে রাখবার, জোর করে ধরে রাখবার ক্ষমতা আমার এই দুটি শীর্ণ হাতে নেই । হয়তো কারো হাতেই নেই । জেনেছি যে ভালোবাসারই আর এক নাম ঘৃণা । আর ঘৃণারই, ভালোবাসা । কোনো আনন্দ বা সুখবরেই আজ আর আমি পুলকিত বা চমকৃত হই না । যেমন কোনো দুঃখে বা আঘাতেও ভেঙে পড়ি না, বাঘেদের রাজত্বে থেকে থেকে, টাইগার প্রোজেক্টের কর্মচারী হয়ে বাঘেদের চরিত্রানুগ কিন্তু কিছু বেপরোয়া দোষ ও গুণের

সমন্বয় ঘটে যাচ্ছে বোধহয় ভিতরে ভিতরে। অজানিত। বাইরে থেকে যা বোঝার আদৌ উপায় নেই। এই ঘটনা বা দুর্ঘটনা যাইই বলো তা ঘটছে নিঃশব্দে, অন্ত্রে রক্তক্ষরণেরই মতো।

তুমি যে শ্রুতির কাছ থেকে আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছো তা জেনে আমার একদিকে যেমন স্বস্তি লাগছে অন্য দিকে লজ্জাও।

অনেক কিছু জানতে চেয়ে তোমার পৌনঃপুনিক অনুরোধের জবাবে চুপ করেই ছিলাম। কিন্তু জবাবে সত্যি কথাটা একদিন বলতেই হতো। তা শ্রুতির চিঠিই তোমাকে জানিয়ে দিলো বলে স্বস্তিবোধ করছি।

আর লজ্জা বোধ করছি এই ভেবে যে, এই সব জেনে শুনে তোমার কোমল ও সুকুমার মনে আমার প্রতি একধরনের সহানুভূতি বা অনুকম্পার বোধ জাগরুক হবে হয়তো যা আদৌ আমার কাম্য নয়।

জীবনের কোনো দৌড়েই আমি হ্যান্ডিকাপ প্রত্যাশা করি না। প্রত্যেকটি সম্পর্কও এক একটি দৌড়। হ্যান্ডিকাপের সুযোগ নিয়ে যারা দৌড়োয় তাদের জিত এবং হার দুইই সমান লজ্জার। তোমার আমার মধ্যে যে সুন্দর একটি সখ্যর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো তা আমার সম্বন্ধে তোমার এই খবর জানাতে বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা আছে।

ঋতি, আমি তোমার কাছ থেকে মায়া, দয়া, অনুকম্পা, সহানুভূতি কিছুই চাই না। যেমন ছিলো আমাদের চিঠির সম্পর্ক তেমনই স্নিগ্ধ প্রীতির রসে উজ্জ্বল থাকুক এইটুকুই আমার কাম্য।

দুঃখের বিষয়, আমরা এমনই এক সমাজে বাস করি যেখানে আমরা নিজেদের সম্বন্ধে যতটুকুই জানি তার চেয়ে অনেকই বেশি জানে অপরে। শ্রুতি কার কাছে কী শুনেছেন জানি না আমার চলে-যাওয়া স্ত্রী সম্বন্ধে। তোমাকে কী এবং কতটুকু জানিয়েছেন তাও জানি না।

পরে, কখনও তোমাকে জানাবো সব কথা সময় ও সুযোগ মতো। আপাতত শুধু এইটুকুই জেনো যে তিনি এখনও আমাকে চিঠি লেখেন। আমাদের বিবাহিত সম্পর্ক ছিলো মাত্র তিন মাসের। এখন তা হয়েছে আজীবনের। এক আশ্চর্য প্রীতি ও সখ্যতার। অনেকটা তোমার সঙ্গে আমার যেমন একটি সম্পর্ক গড়ে উঠছে চিঠির মাধ্যমে ধীরে ধীরে, তেমনই। এও জেনো ঋতি যে আমার দোষ যেমন ছিলো না, দোষ ছিলো না তারও একটুও। সে বেচারি আমাকে সখ করে ছেড়ে যায়নি। সে সম্পূর্ণই নিরুপায় ছিলো। তাছাড়া ছেড়ে সে যায়নি। আমিই জোর করেছিলাম ছেড়ে যেতে।

তুমি কখনও শকুনদের জানোয়ার বা মানুষ ছিঁড়ে খেতে দেখেছো? না দেখে থাকলে, কখনও দেখো না। আমাদের এই সমাজ, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন চেনা-পরিচিতদের মধ্যে অধিকাংশই ঐ শকুনদেরই মতো। দুর্দৈবে পড়লে তবেই বোঝা যায়। যদি তারা একবার জানতে পেরে যায় যে তুমি পড়েছো বা মরেছো (কথাটা আক্ষরিক এবং প্রতীকীও) সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অদৃশ্য থেকে, বহু দূর বন-পর্বত নদী-সমুদ্র শহর পথ-ঘাটের ওপর দিয়ে ধ্বস্-ধ্বস্ আওয়াজ করে বড় বড় ডানায় উড়ে এসে তোমার চারধারে ঘিরে বসবে তারা। গাছের উপরে, পাথরে, বাড়ির দেওয়ালে মাল্টিস্টোরিড বাড়ির ছাদের প্যারাপেটে—অসহায় নিরুপায় তোমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো করে খাবে বলে। দেখো না। কখনও দেখো না শকুনদের ভোজ। আজকে আমি তোমাকে নীতির কথা কিছু বলবো না। আমার স্ত্রীর নাম ছিলো নীতি। বলবো না কারণ আজকে চারদিকে বড় আলোর সমারোহ। আকাশ বড় বেশি নীল। আজকে দুঃখ-কষ্টর কথা থাক।

তাবলে আমার নিজের কিন্তু কোনো দুঃখ নেই। আমার শুভানুধ্যায়ীদের দেওয়া দুঃখ, আমার অশুভানুধ্যায়ীদের দেওয়া দুঃখ, এমনকি পৃথিবীর অচেনা মানুষের দুঃখও আমাকে বড় ভারাক্রান্ত করে। কেন করে জানি না। আমার মতো অতিক্ষুদ্র একজন মানুষকে। কিন্তু করে।

আমার কারণে তুমি একটুও দুঃখিত হয়ো না। সত্যি বলছি। আমার নিজস্ব কোনো দুঃখ নেই।

বিশ্বাস কোরো কথাটা। নেই।

ভালো থেকো।

ইতি—রাজর্ষি

'সিটি অব জয়' আমার কাছে আছে। আগেই পড়েছি। তবে তোমার উপহার দেওয়া বলে এটিও রেখে দেবো।

বইটি আমার ভালো লাগেনি। কেন লাগেনি তা বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়। এক কথায় বললে বলব সকলের যা ভালো লাগে আমার তা লাগে না।

* * *

শ্রুতি রায়,
এইচ·ই· সি· অফিসার্স বাংলো
হাটিয়া, রাঁচী

বালীগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

ঋতি, অভিন্নহৃদয়েষু,

তোর চিঠি পেয়েছি প্রায় সাতদিন হতে চললো। উত্তর দিতে দেরী হলো বলে কিছুমনে করিস না। অশেষ থাকবে ডিসেম্বরের শেষ অবধি। তোর কাছে এবং বেতলাতেও যাবার কথা বলেছিলাম। গা করেনি। ও কেমন যেন বদলে গেছে রে। সবসময় টাকার গল্প, টাকার সঙ্গে ডলারের তুলনা। ওদেশ যে কত ভালো, ওখানকার টেলিফোন কত ভাল কাজ করে, হাসপাতালে কত ভালো চিকিৎসা হয়, মানুষেরা কত নন-ইন্টারফিয়ারিং, জনসংখ্যা কত কম ইত্যাদি তুলনামূলক কথাই সবসময় লেগে আছে মুখে। আমার বাবা বিদেশে আছেন কুড়ি বছর কিন্তু এখনও বাঙালীত্ব ও ভারতীয়ত্বে মালিন্য লাগেনি। অথচ ও চার বছরেই অ্যামেরিকান হয়ে গেলো। ও গর্বভরে প্রায়ই বলে আমাকে এবং অন্যদেরও যে অগণ্য সাদা মেয়ের সঙ্গে ও শুয়েছে। "দে আর ভেরী গুড ইন বেড।" ভাব দেখে মনে হয় যে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর জানার আর কিছুমাত্রই বাকি নেই। মেয়েদের সঙ্গে আর কেন্‌টাকি-চিকেনের যেন কোনো তফাৎই নেই। ইদানীং ওর শিক্ষার রকম সম্বন্ধে মাঝে মাঝেই সন্দিহান হয়ে উঠছি। কী বলব তোকে লজ্জার কথা, এইসব বলার সময়ে চোখেমুখের ভাব এমনই করে যে মনে হয় ঈশ্বর আছেন কি নেই সেই প্রশ্নর উত্তরও ওর নির্দ্বিধায় জানা হয়ে গেছে। ওর আত্মবিশ্বাস চিরদিনই আমায় মুগ্ধ করেছে। কিন্তু আত্মবিশ্বাস যদি দানবীয় অনুপাত অর্জন করে তা নিঃসন্দেহে ভীতিজনক। আমরা মেয়েরা, যেন শুধু শরীর দিয়েই তৈরি, যেন শুধুই দেহসর্বস্ব। সাদা কালো হলুদ শরীর, রোগা-মোটা, দারুণ

ফিগারের শরীর ছাড়া কোনো পুরুষকে দেবার মতো যেন আমাদের আর কিছুমাত্রই নেই । ওর উদ্ধত ও অশালীন কথাবার্তা শুনে সেরকমই মনে হয় বারবার । অশেষকে এবারে আমার খারাপ লাগতে আরম্ভ করেছে । অথচ ভালো লাগাটা তৈরী হতে লেগেছিলো দশ বছর ।

ওর সম্বন্ধে আরও একটা কথা জেনে খুবই খারাপ লেগেছে । তুই তো ওদের বাড়ির অবস্থা জানিস । মেসোমশাই শয্যাশায়ী । মাসীমা হাইলি ডায়াবেটিক । কার্ডিয়াক পেশেন্ট । অশেষ নাকি এবারে এসে ওঁদের বলেছে যে আর "একটি টাকাও" বেশি পাঠাবে না মা-বাবাকে । হি হ্যাজ আ লাইফ টু লিভ "হিজ ওন লাইফ্" । বলেছে, এই সব প্রবলেম তো স্টেটেরই সমাধান করার কথা । ওল্ড-এজ হোম, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস ইত্যাদি । অশেষ আর পারবে না ওঁদের বোঝা বেশিদিন টানতে । লিজ্-এ কেনা নিত্য নতুন বাড়ি, নিত্য নতুন মডেলের গাড়ি, আর ফার্নিচার, মিউজিক্যাল সীসটেমস্ ইলেকট্রিকাল গ্যাজেটস এর স্বপ্নেই বুঁদ হয়ে আছে ও । উইক এন্ডে স্কুবা-ডাইভিং করতে যায় বলেছিলো ও । নিত্য নতুন বান্ধবীকে নিয়ে । অশেষ বলে, সাদা মেয়ে অনেকই হয়েছে ! ফেড-আপ্ !

বোধহয় এবারে ঋতি রায়কে সে শ্যামলা মেয়ে হিসেবে চায় । ওর কাছে মেয়েরা শুধু বুক-কোমর-নিতম্বর মাপের সমার্থকই হয়ে উঠেছে । আমি সত্যিই জানি না রে শ্রুতি অদূর ভবিষ্যতের কোনোদিন আমার হাতের পাখিকে উড়িয়ে দিতে হবে কি না !

যে কৃতী ছেলে বৃদ্ধ অশক্ত মা-বাবার দায় অস্বীকার করে, যার কাছে জীবন আর সবরকম ভোগ সমার্থক, যার কাছে নারী মানে হেল্থ-ক্লিনিকের ফরমাসানুযায়ী নানা রঙা শরীর মাত্র, তাহলে "হি ইজ নট মাই কাপ অফ টি ।"

মাঝে মাঝে আমার এও জানতে ইচ্ছে করে যে, অশেষের কালচারই যদি একজন গড়পড়তা অ্যামেরিকানের কালচার হয় তবে ঐ মহাদেশ কোন্ সর্বনাশের দিকে ছুটে চলেছে ? মনুষ্যোচিত সমস্ত গুণাবলীকেই অস্বীকার করে যারা নিজেদের মনুষ্য শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে শ্লাঘায় ফুলে থাকে তাদের "এন্-ম্যাস্" পাগলা-গারদে ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত । আর দিশি ছেলেমেয়েরাও এই কালচারেরই অন্ধ অনুকরণ করছে আজকাল । এই সংস্কৃতি ক্ষেত্রের, মূল্যবোধের ক্ষেত্রের যে বিপর্যয় তার ফল আশঙ্কিত পরমাণু বোমার বিপর্যয়ের চেয়েও অনেকই বেশি সর্বনাশা হচ্ছে । তুই কি তা জানিস শ্রুতি ?

বাবাকেও এ কথা বলেছি আমি । বলেছি, ওদেশের পাট চুকিয়ে এবারে দেশে ফেরো । তাছাড়া চিরদিনই কি আমি এমন একলাই থাকব ? বল তুই ?

তোর অরণ্যদেব আমার জীবনের এমনই এক সংকট-সময়ে এসে দেখা দিয়েছে যে আমি সত্যিই জানি না…মানুষটি ভারী ভালো রে ! শুধু এটুকুই বলতে পারি আপাতত । তবে তুই যতই ভয় পাস, প্রেমে পড়ার বয়স আর নেই । তুই যা পারিস, পেরেছিস, আমি তো কোনোদিনও পারিনি ; পারবো না । তোর মতো হতে পারলে কী ভালোই না হতো ! ভালো থাকিস ।

আবার যদি কখনও ওদিকে যাই তবে কেতকীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে রইল । ও কতটা বদলেছে তাও দেখতে ইচ্ছে করে । তুই এখনও কিন্তু সেই কলেজের দিনের মতোই ফিক্সড—আইডিয়াজ-এর বোঝা ঘাড়ে করে ফিরিস । কেতকীর উপর তোর রাগ হলে কী হবে রে ! বদলানো ভালো । বদলেরই আরেক নাম তো জীবন !

ইতি—ঋতি

রাজর্ষি বসু
বেতলা, টাইগার প্রোজেক্ট, পালামৌ, বিহার

বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা

সুহৃদেষু

উত্তর দিতে অনেকই দেরী হলো। রাগ করবেন না।

আমার বন্ধু অশেষকে নিয়ে এবার আর আপনার কাছে যাওয়া হলো না। নানা কাজ নিয়ে এসেছে ও। তবে যেতে পারলে ওর আত্মিক উন্নতি হতো। সত্যিই! অরণ্য, পর্বত, নদী, ঝর্ণা মানুষকে বোধহয় এক ধরনের গভীর শান্তি ও নির্লিপ্তি দেয়, তাপসের মতো অথবা ঋষির মতো যা এই মুহূর্তে শহরে বসবাসকারী প্রতিটি নর-নারীর বড় প্রয়োজন শুধুমাত্র মানসিক সুস্থতা বজায় রাখারই জন্যে। হলো না এবারে। জানি না, কখনও হবে কি না!

আপনার চিঠি পড়ে আপনাকে শ্রদ্ধা না করে পারছি না। আপনার একদা স্ত্রী বনী সম্বন্ধেও ঔৎসুক্য তীব্র হচ্ছে। আপনারা দুজনেই বোধহয় অসাধারণ। দুজনের মধ্যে যদি কিছুমাত্র তিক্ততা না থাকে, যদি প্রীতির সম্পর্ক এখনও বহমান থাকে তবে আলাদা থেকে কষ্ট পাওয়া কেন? অবশ্য আমি বোধহয় মাত্রাতিরিক্ত কৌতূহল দেখাচ্ছি আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে। অপরাধ হলে ক্ষমা করবেন। আসলে আপনার চরিত্রর মধ্যে এমনই এক ঋজু অসাধারণত্ব দেখেছি যে আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে ইচ্ছে করে। আপনার সঙ্গে তো বন্ধুত্ব হয়েছে এবার ওঁর সঙ্গে করার ইচ্ছে। উনি তো কলকাতাতেই থাকেন। ঠিকানা যদি দেন তাহলে দেখা করে আলাপ করতে পারি। যদি আপত্তি না থাকে তো পাঠাবেন?

আপনার নিজের মুখ থেকে আপনার কথা কিছুমাত্র জানা যে যাবে না তা বুঝেছি বলেই বনীর ঠিকানা চাইছি লজ্জা কাটিয়ে।

অশেষ চলে যাবে উনত্রিশে ডিসেম্বর। তারপর অসীম অবকাশে আপনাকে দীর্ঘ চিঠি লিখব। ভালো থাকবেন। উত্তর না পেলেও আপনি চিঠি লিখবেন। আপনার চিঠি পেতে খুব ভালো লাগে। এমন সুন্দর চিঠি কোনো পুরুষ লেখেননি আমাকে কখনও।

প্রীতিধন্যা
ইতি—ঋতি

The Online Library of Bangla Books

ঋতি রায়
বালীগঞ্জ প্লেস

বেতলা
২৪-১২-৮৭

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠি এই মাত্র পেলাম। আজ তো তোমাদের কলকাতায় বড়দিন। দিশি অ-খ্রীস্টান বুড়ো বুড়ো খোকা খুকুদের দিশি মদের মোচ্ছব আর রঙিন কাগজের টুপি পরে বাঁশি বাজিয়ে ক্রীসমাসকে স্বাগত জানাবার রাত। হৈহৈ ব্যাপার। এক পুরুষের মাড়োয়ারী কোটিপতি থেকে বাঙালী হাজারপতি সকলেই "হ্যাপি ক্রিস্‌মাস্" করবে। দেশটা স্বাধীন হলো চল্লিশ বছর, কিন্তু জাতি হিসেবে ভারতীয়রা এখনও সাবালক হলো না। "গোপাল"ই রয়ে গেলো। বিশেষ করে বাঙালীরা। কলকাতার বুদ্ধিজীবী বাঙালীদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক যে ঠিক কজন তা নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা চালাবার সময় উপস্থিত হয়েছে বলেই মনে হয়। সমস্ত ক্ষেত্রেরই কিছুকিছু মানুষের বালখিল্যসুলভ ব্যবহারই আমাকে এই সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিয়েছে। অনধিকারীর অপরাধ নিজগুণে মার্জনা কোরো।

কলকাতারই মতো এই বেতলাতেও কলকাতার মানুষদের "হ্যাপি ক্রীসমাস"-এর জের পৌঁছে গেছে। পায়ের নিচে কাঠকয়লার আগুনের গরম কাঙ্গরি বসিয়ে আমি যখন শীতের প্রকোপে দরজা জানালা বন্ধ করে তোমাকে চিঠি লিখছি তখন তারস্বরে ক্যাসেট প্লেয়ারে ইংরিজি গান বাজিয়ে বিভিন্ন বাংলোতে এবং ট্যুরিস্ট লজেও নাচানাচি করছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মানুষেরা। কলকাতার নিজস্ব অপসংস্কৃতির বিষ ছড়িয়ে গেছে পূর্বাঞ্চলের আনাচে-কানাচে। শহরের দুপেয়ে জানোয়ারদের দেখে বনের জানোয়ারেরা ভয় পেয়ে বনের গভীরে সরে যাচ্ছে। ন্যাশানাল পার্কের মধ্যে এমন হৈ-হুল্লোর নিয়ম করেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু আমার ক্ষীণকণ্ঠ শুনছে কে?

বছরের এই সময়েই চিতল হরিণদের গণনা চলে প্রতি বছর বেতলাতে। সেনসাস-এর সময়। হরিণ এবং হরিণীদের ডাক শুনে শুনে বিভিন্ন জায়গাতে ফরেস্ট গার্ডরা ডাক শুনে খাতায় লিখে রাখে। সেই ডাকের সংখ্যা থেকেই এক বিশেষ প্রক্রিয়াতে আমরা চিতল হরিণ বা স্পটেড ডিয়ারের সংখ্যা নির্ণয় করি।

সিমলিপাল ন্যাশনাল পার্কে হাতির সেনসাস্ হয় এপ্রিল মাসে। তখন আমের সময় ঐ চমৎকার পাহাড়-বনে। হাতিরা আম খাবার জন্যে দলে দলে বনের কোরক ছেড়ে অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গাতে আসে। তাই সিমলিপালের হাতির সেনসাস্‌কে বলা হয় "ম্যাঙ্গো-সেনসাস্"। হাতি যদি দেখতে চাও সাধ মিটিয়ে তবে সিমলিপালে যেও এপ্রিলের গোড়াতে। অত হাতি আমি পূর্ব-আফ্রিকার সেরেঙ্গেটি, লেক মানীয়ারা অথবা গোরোংগোরো ক্র্যাটারেও দেখিনি একসঙ্গে। সিমলিপাল পৃথিবীর একটি অন্যতম ধনী ন্যাশনাল পার্ক।

মজাটা হলো ট্যুওরিজম্‌এর স্বার্থ আর কনসার্ভেশানের স্বার্থ অনেকক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী। বিশেষকরে কোনো বনাঞ্চলকে যখন "কোর্-এরীয়া" হিসেবে গড়ে তোলা হয়। সিমলিপালেও বনবিভাগ হয়তো পর্যটনবিভাগকে পূর্ণ সহযোগিতা দিতে চান না শুধুমাত্র এই কারণেই। "ক্রীসমাস ইভ্"-এর পার্টি করার অনেকই জায়গা আছে। বনের বুকের কোরককে ছাড় দিলেই বনবিভাগ এবং বিশেষকরে টাইগার-প্রজেক্টের আমাদের মতো কর্মীরা খুশি হতেন। বনে সকলেই আসেন আজকাল ভীড় করে কিন্তু কম মানুষেরই বনে আসার যোগ্যতা আছে। এটা দুঃখময়। কিন্তু সত্যি। আজ এতোই শীত যে আঙুল কুঁকড়ে যাচ্ছে। "কোয়েলের কাছের যশোয়ন্ত-এর মতো অথবা "কোজাগর"-এর রথীদার মতো "ভূত আমার পুত পেত্নী আমার ঝি" হুইস্কী-সোডা পেটে আছে শীত করবে কি ?" সে বিশ্বাস তো আমি করি না। তাই শীত পড়লে, শীতে কাবু হই।

ভালো থেকো।

ইতি—রাজর্ষি

* * *

কলকাতা

অরণ্যদেব

আজ অশেষ চলে যাবে। তাই আপনার চিঠির প্রাপ্তিস্বীকারই করছি শুধু। অনেক ভেবেটেবে এই সিদ্ধান্তেই এলাম যে বিংশ শতাব্দীতে আপনিই একমাত্র শিক্ষিত যুবক যিনি ক্রীস্‌মাস ইভ্-এও মদ্যপান করেন না। আপনি শুধু অরণ্যদেবই নন বাঙালী জাতির মধ্যে এক প্রাগৈতিহাসিক প্রকৃষ্ট প্রজাতির স্পেসিমেনও বটেন। আপনার প্রজাতির বংশবৃদ্ধি হলে বুদ্ধিজীবী বাঙালী জাতের সমূহ সর্বনাশ হবে। মদ না খেলে এবং অবিরাম মদ না খেলে নিঃসংশয়ে বুদ্ধিভ্রংশ হয় বলেই তো বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশ বিশ্বাস করেন। তাই না ?

আপনি আমার নিজের সরল বুদ্ধি পর্যন্ত ঘোলা করে দিলেন। এ যুগে আপনি সত্যিই অচল৹। মাদক বর্জন সমিতির সভাপতি হবার মতো একজন পুরুষও পাওয়া গেলো যে এইটেই আমার কাছে মস্ত খবর।

ভালো থাকবেন।

ইতি—গুণমুগ্ধা ঋতি

পুনশ্চ "পুল-ওভারটা" কি শ্রুতি পৌঁছে দিয়েছে আপনাকে। এই শীতেও যদি না পেয়ে থাকেন তো পরবেন কবে ? পছন্দ হলো কি না জানাবেন। শ্রুতি পাঠালো কি না তাই বা কে জানে! যদি এতোদিনেও না পাঠিয়ে থাকে তাহলে বলার কিছুই নেই।

ঋতি রায়.
বালীগঞ্জ প্লেস

বেতলা, পালামৌ
৩০/১২/৮৭।

হাজামৎ মানে নাপিত। জানাতে ভুলে গেছিলাম। তুমি অনেকদিন আগেই জানতে চেয়েছিলে।

আমার টোট্‌কাতে উনি কি এখন সম্পূর্ণ নিরাময় হলেন ? জানিও।

পুল-ওভারটি সত্যিই দারুণ হয়েছে। আমাকে এত ভালো জিনিস কেউই কোনোদিন বুনে দেয়নি নিজে হাতে। অশেষ কৃতজ্ঞ আমি। তবে মানাবে না। তাছাড়া রঙটি এতোই বেশি পরিশীলিত ও সুরুচিকর যে জঙ্গলে তার পর্যাপ্ত অমর্যাদাই হবে। তবু, তোমার নিজের হাতে বানানো বলেই পরি। এবং পুলওভারটি যখনই পরি, আমার এমনই এক সিরসিরানি অনুভূতি হয় যে, অদেখা তুমি যেন আমার খুবই কাছে আছো। যেন পেছন থেকে লতানো হাত দুখানি দিয়ে আমাকে জড়িয়েই আছো শীতের পড়ন্ত বেলায়।

কল্পনাতে তো কোনো দোষ নেই। কলঙ্কও নেই। আর কল্পনার অধিকার শুধুমাত্র মানুষেরই। অন্য প্রাণীদের তো এ দান দেননি সৃষ্টিকর্তা। তবে তোমাকে সে রাতে ভালো করে দেখতে পাইনি তাই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেও ঠিকমতো লিখতে পারি না। তুমিও পারো না নিশ্চয়ই।

আমার মনে হয়, আমাদের পত্রমিতালি এমনই এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে দুজনেরই উচিত অন্যজনের একটি সাম্প্রতিক ফোটো হাতের কাছে রাখা। টেবলের উপর তোমার ফোটোখানি থাকলে চিঠি অনেকটা সহজে লেখা যাবে। নইলে ক্রমশই নিরাকার ঈশ্বরের সাধনার মতোই হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। তুমি হয়তো উচ্চকোটির জীব, নিরাকার ঈশ্বরেরই মতো এই অদেখা বন্যমানুষকে (বনমানুষও বলতে পারো) তোমার কল্পনাতে হয়তো ধরতে পারো, কিন্তু আমার মতো অশিক্ষিত প্রাকৃতজনের পক্ষে তা সত্যিই দুরূহ।

তোমার চিঠিতে এর আগে দু একবার "ঈশ্বরই জানেন" কথাটি সম্ভবত লক্ষ্য করেছি। না কি তা আমার মনের ভুল ? জানতে ইচ্ছে হয় তুমি ঈশ্বর মানো কি না ! কখনও সময় করে জানালে খুশি হবো। যদি মানো, তবে জানিও কেন মানো ? না মানলে তাও।

অশেষ কি চলে গেছেন ? জানিও। তাঁর জন্যে মন খারাপ লাগলে আমাকে আরও বেশ করে চিঠি লিখো। আমি বিরহর ভার লাঘব করব চিঠি লিখে। দুধের সাধ যদিও ঘোলে মিটবে না তবুও কলেজ জীবন থেকেই 'প্রক্সী' দিয়ে দিয়ে এমনই বদভ্যাস জন্মে গেছে যে প্রক্সী দিতে পারি নির্দ্বিধায়। জীবনের সব ক্ষেত্রেই। এমন এমন প্রক্সীও দিয়েছি যার রকম-সকম শুনলে তুমি স্তম্ভিত হয়ে যাবে। তাই অশেষের প্রক্সী, শুধুমাত্র চিঠিতেই দেওয়া, আমার পক্ষে অতিই সহজ ব্যাপার।

তাছাড়া জীবনে "করা" বলতে যা বোঝায় তেমন কিছুতো করা হলো না ! ইংলিশ

চ্যানেল পেরুনো হলো না সারা শরীরে গ্রিজ মেখে, মিহির সেনের মতো। সুনীল গাভাসকারের মতো ক্রিকেট খেলা হলো না। উত্তমকুমারের মতো জনপ্রিয়তা পাওয়া হলো না। সত্যজিৎ রায়ের মতো দৈর্ঘ্য ও গলার স্বরের অধিকারী হওয়া হলো না। জঙ্গলে এমন কিছুও কোনোদিনই ঘটলো না যে তোমার মতো কোনো সুন্দরীকে প্রাণে বাঁচাতে গিয়ে “হীরো” হতে পারি ! সেই রাতের হাতির দলটাও এমনই ইনকনসিডারেট যে ভীত চকিত দুজন যুবতীর সামনে হতভাগারা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুমাত্রও করলো না। তাদের দলের একজনও শুঁড় তুলে বৃংহন করলো না, ভয় দেখাবার জন্যে তেড়ে এলো না তোমাদের দিকে। তোমাদের কাছে যে শিভাল্‌রি দেখিয়ে একটু বড় হবো তা হওয়ার সুযোগ পর্যন্ত ঐ বিচ্ছিরী হাতিরা দিলো না।

কোনো কোনো মানুষের কপাল বোধহয় এমনই হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পানাপড়া এদোপুকুরের’ই মতো ভাগ্য তাদের। তাদের জীবনে রাজহাঁসেরা আসে না কোনোদিনও। বড় ম্যাদামারা, নিস্তরঙ্গ লাগে মাঝে মাঝে এই জীবন। যদিও শহরের মানুষদের চোখে আমার জীবিকা ও জীবন অশেষ বিস্ময় ও কৌতূহলের। কিন্তু আমারই মতো ভয়, বিস্ময় এবং কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দুতে যে-সব মানুষের বাস তাদের নিজেদের কাছেই তা নিতান্ত একঘেয়েই লাগে বোধহয়।

তোমার সঙ্গে চিঠিতেই আলাপ তবু তোমার চিঠি পড়ে মনে হয় তুমি অন্যরকম। **you do not belong to the run of the mills**। তুমি খুব গভীর এবং তোমার চরিত্রে ন্যাকামিতো নেইই (অবশ্য তোমাদের বয়সী অধিকাংশ মেয়েদের মধ্যেই ন্যাকামি নেই দেখে ভালো লাগে) তার চেয়েও বড় কথা কোনোরকম সংকোচ বা দ্বিধাও নেই। তোমার মতো চরিত্র নিয়ে যারা জন্মায় তারাই বোধহয় জীবনে সুখী হতে পারে। নিজের স্বার্থে, নিজের শর্তে যারা সুখকে গৃহবন্দী করতে না পারে তাদের পক্ষে সুখী হওয়া ভারী মুশকিল। নিজের চেয়ে অন্যকে দামী মনে করলে, নিজের সুখের চেয়ে অন্যর সুখকে অগ্রগণ্য করলে তার পক্ষে আর যাই হোক সুখী হওয়া হয় না। যে-কারণে আমি কখনোই সুখী হতে পারবো না। বহিরঙ্গে আমি পুরুষ, অনেকে বলে রুক্ষ এবং সাহসীও কিন্তু অন্তরঙ্গে আমার মতো নরম ভীতু নিভৃত কোমল প্রাণের মানুষ বড় কমই হয়। সেই কারণেই নিজের খোলের মধ্যে নিজের নিজস্বতাকে লুকিয়ে রেখে মুখোস পরে নিশিদিন বহির্জগতের মোকাবিলা করি। কিন্তু বেলা শেষে নিজের বাংলোয় ফিরে চান ঘরের আয়নায় নিজের ক্লান্ত বিরক্ত মুখটিকে যখন দেখি তখন প্রতীয়মান হয় মুখোসের ভারে মুখটি একেবারে কেটে গেছে। যে মুখটিকে চান ঘরের আয়নায় দেখি সে মুখের মালিক যে, সে মানুষটি বড়ই অভাগা। যত অনুযোগ তার, যত অভিমান তা সবই তার নিজেরই বিরুদ্ধে। গরম জলের বাষ্পরই মতো সেই অভিমানের বাষ্প আয়নাকে ধোঁয়াটে করে তোলে। তর্জনী দিয়ে সেই ধোঁয়াশাকে যতবারই মুছে দিতে যাই ততবারই নতুন করে দেখি বাষ্পর মধ্যে মধ্যে তর্জনীর দাগ যেন গারদের গরাদেরই মতো ফুটে ওঠে। মনে হয় যেন এই স্বসৃষ্ট গারদের মধ্যেই মাথাখুঁড়ে মরতে হবে এই চিরচেনা অথচ অচেনা আমার আসল আমিকে। তবে বাঁচোয়া এই যে, এই অভিশাপ বোধহয় আমার একার নয়। এই আধুনিক, বড় গোলমেলে সময়ের পুরুষ ও নারীদের মধ্যে অধিকাংশই হয়তো আমারই মতো। হয়তো তুমিও। অসকার ওয়াইল্ড-এর ‘দ্য পিকচার অফ ডরিয়ান গ্রে’তে আছে না ? সেলারে-রাখা ডোরিয়ান গ্রের পোর্ট্রেটের মধ্যে ডরিয়ান গ্রে মানুষটির চরিত্রের এবং ক্রিয়াকলাপের যেসব প্রভাব পড়তো আমাদের চান ঘরের আয়নাতেও ঠিক তেমনই পড়ে

তুমি তোমার সরল, স্বাভাবিক সুরুচিসম্পন্ন মানসিকতায় শরতের রোদে ইউক্যালিপ্টাস-এর পাতারা যেমন হাতছানি দেয় রোদ চমকিয়ে তেমন করে চিঠির মধ্যে দিয়ে যেন এক অনাস্বাদিত অদেখা অননুভূত জগতের আভাস দাও প্রতিনিয়ত আমাকে। যে-জগৎ ঠিক কেমন তা আমি জানি না। সেই জগতে হয়তো আমার প্রবেশাধিকারও থাকবে না কখনও। তবু তোমারই জন্যে আমি জানতে পেরেছি যে এমন কোনো অন্তর্জগৎ এখনও বেঁচে আছে এই পৃথিবীতে, যে পৃথিবীতে ঋতি নামের একটি মেয়ে বাস করে ; যার দুচোখে কৌতূহল, যার অন্তরে নির্মল সততা এবং সংবেদনশীলতা। ভারী অবাক লাগে। মনে হয় তোমাকে লিখি "অবেলায় যদি এসেছো আমার বনে দিনের বিদায়ক্ষণে/গেয়ো না, গেয়ো না চঞ্চল গান ক্লান্ত এ সমীরণে"

চৌধুরী দম্পতির হাতে তোমার জন্যে SUZANNE VEGA-র একটি এল পি রেকর্ড পাঠালাম। টীন-এজার মেয়ে। কী ভালো গলা ! শুনো, আগেই যদি না শুনে থাকো। অবশ্য অশেষ হয়তো তোমাকে এনেই দিয়েছে। Vega-র একাধিক রেকর্ড ইতিমধ্যেই লন্ডনের বাসিন্দা আমার এক ইংরেজ বান্ধবী আইলীন পাঠিয়েছিলো তার এক জার্মান বয়-ফ্রেন্ড-এর হাতে বেতলাতে। প্রত্যেকটি গানও SUZANNE VEGA-র লেখা। প্রত্যেকটি গানেরই বাণী আশ্চর্য করার মতো। একটি গান আছে নাম LANGUAGE, সেটি শুনতাম আমি বারেবারেই। এবং ভাবতাম যে চিঠি-টিঠি লেখার কোনো মানে হয় না। মানুষের সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হতে এখনও বোধহয় অনেকই দেরী। ভাষা, যা ভাবের বাহন তাই এখনও সম্পূর্ণতা'ও পারফেকশানে এসে পৌঁছলো না। তুমি হয়তো বলবে কিছু কিছু ক্ষেত্র থাকে যেখানে মৃত্যু আর পারফেকশান সমার্থক। মানিও সে কথা। তবে হয়তো শুধু মনের ভাষার বেলাই নয়, কথা বলে চিঠি লিখে এমন কী কারো সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েও বোধহয় একজন আধুনিক মানুষ অন্যলিঙ্গ অন্যকে তার যা বলার তা বোঝাতে পারে না। অন্যতে, সর্বস্বতায় পরিপূর্ণতায় নিঃশেষে পরিপ্লুত হতে পারে না। কী দুর্দৈব ! তাই না ? এ বড় কষ্টর ঋতি। মানুষ হয়ে জন্মানোই বড় কষ্টর। আমার তো তাই মনে হয়।

চৌধুরী-দম্পতি পাপড়ি ও কিশোর, কলকাতায় তোমাদের বাড়ির কাছেই থাকে। ওরা এক পাগল দম্পতি। হাতি নিয়ে গবেষণা করছে। বনসংরক্ষণের জন্যে ওদের মমত্ববোধটা পাগলামির পর্যায়েই পৌঁছেচে। মারুমারে মহুয়াডাঁরের পথে হাতির রাজত্বে নিজেদের ছোট্ট বাংলো বানিয়েছে। শীতে-গ্রীষ্মে রোদে-চাঁদে ওরা কলকাতা থেকে এতদূরে এসে থাকে অনির্দিষ্টকাল। মারুমারতো বেতলা থেকেও কম দূর নয় !

কিশোর আফ্রিকাতেও গেছে। "আম্মো গেছি" বলে চালবাজির গল্প করার জন্যে যাঁরা যান তাদের মতো যায়নি। হাতি সম্বন্ধে জানতে গেছিলো। হাতি বিশেষজ্ঞ দম্পতি। ওড়িয়া এবং ডগলাস হামিলটনদের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে ওদের। চৈনিক ফিলসফার কনফ্যুসিয়াস বলেছিলেন "When a man has more solid worth than polish he appears to be uncouth, and when a man has more polish than solid worth, he appears urbane. The proper combination of solid worth and polish alone makes a man a gentleman."

জঙ্গলে নানারকম শহুরে মানুষ আসে। কিশোরের মধ্যে এই ভদ্রলোকের সংজ্ঞা পুরিত হয়েছে। ওর ছেলেমানুষ স্ত্রী পাপড়ির বাহাদুরীও কম নয়। বাঙালী মেয়ে হয়েও স্বামীর সখের পথে বাধা হয়নি এমন কমই দেখা যায়। ওরাই "নইহার" হোটেলটি করেছে। আগে বলেছি। পাপড়ি ও কিশোর চৌধুরী দক্ষিণ কলকাতার সুরেন ঠাকুর রোডে থাকে।

তোমাদের বালীগঞ্জ প্রেস থেকে কাছেই হবে অনুমান করি। ওরা বলেছে কলকাতায় পৌঁছেই তোমাকে রেকর্ডটি পৌঁছে দেবে। ওদের সঙ্গে আলাপ করে রেখো। আমি হয়তো এ অঞ্চলে আর বেশিদিন থাকবো না। কোথায় বদলি হয়ে চলে যাব কান্‌হা না সিমলিপাল না বান্ধবগড় না মুদুমালাই কে বলতে পারে। পাপড়ি আর কিশোরই তোমাকে ও অশেষকে আমার অনুপস্থিতিতে এই পালামৌ অঞ্চল ঘুরিয়ে দেবে ভালো করে।

সুসান ভেগার গানটির কটি পংক্তি তুলে দিলাম। কেমন লাগলো গান শুনে তাও জানিও।

“Words are too solid
They don’t move fast enough
to catch the blur in the brain
That flies by and is gone
Gone
Gone
Gone
I’d like to meet you
In a timeless
Placeless place
Somewhere when out of the Context
And beyond all consequences.

...দারুণ। না? ঋতি?

ভালো থেকো।

—ইতি তোমার চিঠি-মুগ্ধ রাজর্ষি

রাজর্ষি বসু, বেতলা
C/o টাইগার প্রজেক্ট পালাম্যু, জেলা পালাম্যু, বিহার

রাজা এবং ঋষি।

আপনার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগলো। হ্যাপী ন্যু ইয়ার।

আমার মনটা যখন খুবই খারাপ হয়েছিলো তখনই এলো আপনার চিঠি। সত্যি বলছি, মন ভালো হয়ে গেলো। তবে এও বলব যে আপনার চিঠি না পেলে যেমন মন খারাপ হয়, কখনও কখনও পেলেও হয়।

চিঠির মতো ভালো ও দামী উপহার আর বোধহয় হয় না। অথচ চিঠি লেখার পাটইতো উঠে যাচ্ছে শুনি দেশ থেকে। এখন টেলিফোন, টেলেক্স, টেলিফ্যাক্স এর দিন।

চিঠিতে একজন মানুষ অন্যজনকে এবং অন্যজনের কাছে যেভাবে উন্মোচিত হতে দেখে এবং উন্মোচিত করে নিজেকে তেমন বোধহয় নিরাবরণ হয়ে একে অন্যর সামনে দাঁড়ালেও করতে পারেন না। নিরাবরণ হলে শরীরটা মুখ্য হয়ে ওঠে। তীব্র ঔৎসুক্য এসে গ্রাস করে সুস্থ এবং যথার্থ মানবিক অনুসন্ধিৎসাকে। ঔৎসুক্য এবং অনুসন্ধিৎসার মধ্যে একটি মানের তফাৎ থাকেই। নইলে একটি শব্দই দুটিরই অর্থবাহী হতে পারতো। তাই না?

নানা কারণেই শিশুকাল থেকেই আমার চিঠি পেতে ও দিতে খুবই ভালো লাগে। আমার একজন জার্মান এবং একজন ইতালিয় পত্র-বন্ধু এখনও আছে যারা নিয়মিত চিঠি লেখে। দুজনে গত পাঁচ বছরের বিভিন্ন সময়ে আমার এখানে থেকে গেছে এসে। নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেছে আমাকেও যাবার জন্যে বারবার করে। জামনীর বন্ধু বলেছে পশ্চিম জার্মনীর ব্ল্যাক-ফরেস্ট দেখাবে যদি ওখানে যাই। যাবেন তো বলবেন ? একসঙ্গে যাওয়া যাবে কোনো সময়ে।

পুল-ওভার প্রসঙ্গে আপনি আমার মনের কথাটিও বলেছেন। হয়তো শুধু আমারই নয় প্রত্যেক মেয়েরই মনের কথা। যেকোনো মেয়েই কোনো পুরুষের জন্যে যদি ভালোবাসা প্রীতি বা স্নেহ উলের লাছির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কোনো কিছু বুনে দেয় এবং সেই বোনা জিনিস যদি তার যাকে দেওয়া, সে পরে, তখন প্রত্যেক মেয়েরই কল্পনাতে তার নরম দুটি হাত জড়িয়ে থাকে তার প্রিয়জনকে। বা স্নেহর জনকে বা প্রীতির জনকে। প্রেমের জনের জন্যে বুনলে কী রকম অনুভূতি হয় বলতে পারব না। কারণ, প্রেম ব্যাপারটা যে কী, কাকে বলে তা জানিনি এখনও যদিও সকলের সঙ্গে আমিও বলছি যে অশেষকে বিয়ে করতে যাচ্ছি বছর খানেক পরে। সে আমার বন্ধু। তার সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ হয়েছি বহুবার (চরম ঘনিষ্ঠতা নয়), কাছ থেকে দেখেছি, যদিও তার জন্যে আমার মনে একধরনের গভীর বোধ আছে, তার জন্যে আমার মাঝে মাঝে মন কেমনও করে, অথচ জানিনা তাকেই প্রেম বলে কী না ?

সব মেয়েই বোধহয় তার পুতুল খেলার দিন থেকে একজন আদর্শ পুরুষের স্বপ্ন দেখে। মনে মনে তখনও তার মনে প্রেম বা স্বামীর কোনো আদল গড়ে ওঠে না। সে পুরুষ শুধুই আদর্শ পুরুষ। স্বপ্নের রাজপুরুষ-এর মতো। সে পুরুষ সেই ছোট মেয়ের বেনিয়ানের সঙ্গে মিশে থাকে, তার ফ্রকের দৈর্ঘ্যর সঙ্গে বেড়ে ওঠে।

তার স্নিগ্ধ অপাপবিদ্ধা সরল অনভিজ্ঞা সত্তার পরতে পরতে অদৃশ্য হয়ে জড়িয়ে থাকে তাকে। অথচ প্রতি বছরই এই সময়ে এবং ফাল্গুন-চৈত্র মাসে যত আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের বিয়ে হয় এই কলকাতায়, যখন যাই সেই সব অনুষ্ঠানের স্বামী-স্ত্রীদের সেই মুহূর্তে নানাবিধ কর্তব্যের ভারে পীড়িত এবং প্রচণ্ড খুশিও দেখে আসি। কিন্তু সাম্প্রতিক অতীত থেকে দেখছি বিয়ের পরে তাদের সম্পর্কটা এমনই হয়ে আসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে মনেই হয় না তারা নববিবাহিত। কোনো দম্পতিকে দেখে মনে হয় যেন তারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। কোনো দম্পতিকে দেখে মনে হয় তারা তখনও বুঝি অপরিচিতই একে অন্যর কাছে। কেউ কেউ বা চোখকান বুঁজে আমাদের ছেলেবেলার "ক্যাস্টরঅয়েল" গেলার মতো টাকা রোজগারের পুরীয়া গিলে যাচ্ছে আরো টাকা আরও টাকা করে। অনেক টাকা আসার পর কি যে করবে বা করা উচিত সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা পর্যন্ত তাদের নেই। সেই যে আগেকার "ফেয়ারী টেইল্‌সে" পড়তাম না ? রাজপুত্র রাজকন্যার বিয়ে হলো আর তারপরেই 'দে লিভড হ্যাপিলী দেয়ার আফটার'। তেমন যেন ঘটে না আর। প্রিন্স চার্লস আর প্রিন্সেস ডায়ানার বিয়েই তো ভেঙে যেতে বসেছে। কিন্তু কেন এমন হয় ? ভেবে পাই না। ভেবে না পেয়ে আরও ভাবি। আরও ভাবলে মাথা গরম হয়ে যায়।

পারেন কিছু দাওয়াই বাৎলাতে ?

ভালো থাকবেন মহারাজ। ভালো থাকবেন সবসময়।

ইতি আপনার ভক্ত—ঋতি

পুনশ্চ কিছু বুঝি না। এতোদ্দিন ঋতির ঋতি ছিলো জলপিপির। অবাধ নিঃশঙ্ক বিচরণ

ছিলো তার জলে জলছড়া এঁকে-এঁকে এঁকে-বেঁকে জীবনের বিবিধ রঙা ধূসর, নীলাভ, হরিতাভ মানবিক সম্পর্কর নিত্যনতুন জলাতে। আপনি মশাই রাজা এবং ঋষি, জলপিপির শান্ত নিয়মবদ্ধ জীবনের জঙ্গলে বুনো গন্ধর ঘূর্ণিঝড়ের তোড় তুলে বড়ই বিপদ ঘটালেন।

জলপিপিরা হাঁস নয়। তারা বড় কুনো। ছোটখাটো স্রোতহীন নির্ঝঞ্ঝাট তাদের জীবন। জলছড়া দিয়ে স্বল্প দৈর্ঘ্য দৌড়ে যাওয়ার আরেক নামই জীবন তাদের কাছে। সেইসব জলার বুকে জলজ সব নল, শর, কচুরিপানা, কলমি আর উজ্জ্বল সবুজ ঝাঁঝি, যে ঝাঁঝিকে শীতের দুপুরের রোদে স্বচ্ছ জলের নিচে বেগনে দেখায়, সেই জলাতেই তাদের সারা জীবনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। সামান্য জলপিপি বলেই আমি সমুদ্র চিনি না, চিনি না নদী। সাইক্লোন, টাইফুন, টোর্নাডোর কোনো খবরই রাখি না। আপনার স্বল্প পরিচিত এই সরলা বঙ্গবালা! তার এই ছোট্ট পরিসরের সিক্ত অঙ্গনে রাজহাঁসের মতো রাজর্ষির হঠাৎ আগমন বড় বড় ঢেউয়ের দোলায় হয়তো তাকে আত্মঘাতীও করে তুলতে পারে। বঙ্কিমবাবুর নায়িকার মতো ঋতিরও মরে প্রমাণ করতে হতে পারে একদিন যে ঋতি মরেও মরেনি দিব্যি বেঁচে আছে, ড্যাবড্যাবে চোখে চেয়ে। সত্য বলছি! জলপিপির বড়ই বিপদ মশাই। দিন না একটি ছররা গুলি মেরে। ঘাড় নেতিয়ে ভেসে থাকি চিরচেনা জলে। বুকের সব উষ্ণতা মরে আসুক ক্রমশ। সব দুঃখের শেষ তাহলে। নিজের সব অহঙ্কার, দম্ভ, নিজের সম্বন্ধে সব ভালোবাসাকে চৈত্র হাওয়ায় ঝরা ফুলের মতো ঝরিয়ে দিয়ে। আঃ! কী সুখ। ভারহীনতার মতো সুখ কী আছে? অপমানে বাঁচতে হবে যেখানে। সে বাঁচার চেয়ে মরা ভালো। মরার তো কত রকম আছে! দিন না বাজা একটি ছররা মেরে এই দ্বিধার অবসান ঘটিয়ে। বুদ্ধি দিন ঋষি, ঋতিকে তার নিজস্ব ঋতিতে ঋতিমতী রাখতে!

* * *

ঋতি রায়,
বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা

বেতলা, পালামৌ
জানুয়ারী

ঋতি পাগলিনী,

আমার হেপি ন্যু ইয়ার হয় বৈশাখ মাসে। তবুও ধন্যবাদ।

তুমি সকালে এবং সন্ধ্যায় বায়োকেমিক ওষুধ ক্যালি ফস্ সিক্স-এক্স, চারটি করে বড়ি নিয়মিত খাওয়া শুরু করো। অন্যথা না হয়। সি রিঙ্গার, মহেশ ভট্টাচার্যি ইত্যাদি নামী দোকান থেকে আনিয়ে নিও। ইন্টারন্যাশনাল হোমিও রিসার্চ থেকে আনাতে পারো। ওঁরাও খুব বড় কম্পানী। রামমোহন মল্লিক গার্ডেন লেন-এ ওঁদের অফিস। কলকাতা-৭০০০১০ প্রয়োজনে মিহিজামের ডঃ ব্যানার্জীর জুনিয়র ডঃ সান্ত্বনা মুখার্জীকেও দেখাতে পারো একবার। খুব ভালো ডাক্তার। আমার এই ওষুধ ধন্বন্তরি। সারা জীবনই খেয়ে যাও। জলাতেই থাকো কী সাগরে। মাথা ঠাণ্ডা রাখে। মেয়েদের প্রেগনান্সির সময়েও এই ওষুধ অত্যন্ত কার্যকরী। ঘুম যদি না আসে তবেও গোটা আস্টেক বড়ি দু-তিন চামচ টেপিড-ওয়াটারে গুলে খেয়ে শুয়ে পড়ো। তক্ষুনি ঘুম আসবে। ক্যালি ফস্-এর সঙ্গে মা কালির কোনো রকম আত্মীয়তা আছে কি না জানি না তবে এ স্লীপিং ট্যাবলেট-এর

বাবা ' অথচ কোনোরকম খারাপ প্রভাব নেই। তোমার রোগের আশু উপশমের জন্যে নিম্নলিখিত প্রেসক্রিপশানও দিলাম। অবশ্য-পালিতব্য। পথ্যও অবশ্য সেবনীয়। তোমার এই রোগের নাম "চিত্ত উচাটনী"। জঙ্গলের মঙ্গলময় বাবা রাজর্ষি মহারাজ কবিরাজের ডায়াগ্নোসিসে।

১। ভোরে উঠেই যোগ ব্যায়াম করবে। চোখ মুখ ধুয়ে।
২। দু চামচ মধু খাবে একটু লেবুর রস দিয়ে।
৩। ফলের রস আর দুধ বেশি করে খাবে।
৪। অফিস থেকে পনেরো দিন ছুটি নেবে। যদি পারো তো কোথাও বেড়াতে চলে যেও।
৫। আমার কাছে এসো না।
৬। অশেষকে রোজ একটি করে বড় চিঠি লিখবে। অন্তত পাঁচ-পাতা। কষ্ট হলেও লিখবে। তোমার অনেকে আছে। কিন্তু সে বিদেশে একা।
৭। ক্লাসিকাল গান শুনবে। ইন্ডিয়ান। একা ঘরে। গভীর রাতে।
৮। টিভি দেখবে না। ভি সি আর যদি থাকে তবে কোনো ছবি দেখবে না।
৯। সকালে ও বিকেলে একটি ঘণ্টা সময় একা থাকবে, যে করেই হোক।
১০। উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্ট কা'রো সঙ্গেই দেখা করবে না। বাড়িতে বা অফিসে। লোকে যা বলে বলুক। লোকে তোমার কোন্ উপকারটা করেছে আজ পর্যন্ত? ভেবে দেখো ত! তবে সেই লোকেদের ভয়ে নিজের ভারসাম্য, নিজের জীবনের যা কাজ, ব্রত (চাকরি করা আর টাকা রোজগার করতেই একজন মানুষ এখানে আসে না। আসা উচিত নয় অন্তত) তা নষ্ট করতে দেবে কেন?
১০। আমার মনে হচ্ছে তোমার জীবনের কম্পাসে কিছু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। সামান্যই। এই প্রেসক্রিপশান যদি মানো তবে পনেরো দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সাতদিন পরে কেমন আছো জানালে ওষুধ বদলে দেব। পথ্যও। এই পনেরো দিন নিরামিষ খাবে। সম্ভব হলে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটবে। একসঙ্গে কমপক্ষে পনেরো মিনিট। শবাসন করবে দু তিন বার দিনে। রাতে শোবার সময়ে অশেষের মুখ মনে করবে। রোজ। পাগল ভালো করো মা।

—ইতি মঙ্গলময় রাজ কবিরাজ

রাজর্ষি বসু
হাকিম সাহেব, সেলাম আইলেকুম

কিশোর, জানুয়ারী
কলকাতা

আপনার খাল-খরিয়াৎ, রাহান-সাহান, হাল-হকীকৎ এসব কিছুরই খবর পাই না। আগের চিঠি কি পাননি? সময় মতো এবং Preferably পত্রপাঠ উত্তর দেন না কেন?

জানেন না কি ? শিক্ষা থাকে মানুষের ব্যবহারে, চেহারা, কথাবার্তায় । আলমারীর ড্রয়ারে যে সব পাকানো কাগজ থাকে ন্যাপথালিনের গন্ধ-ভরা অবশেষে ইঁদুর বা তেলাপোকার খাদ্য হবে বলে তা আর শিক্ষা সমার্থক নয় । অনেকেই পাকানো কাগজগুলিকেই শিক্ষা মনে করে মহানন্দে পৃথিবীর তাবৎ মানুষের সঙ্গে অশিক্ষিতর মতো ব্যবহার করে । তারাই আবার তাদের কেউ অশিক্ষিত বললে বেদম চটে যায় ।

না । হাকিম সাহেব আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে চিঠির উত্তর না দেওয়া, সে যারই চিঠি হোক না কেন এবং পত্রপাঠ না—দেওয়ার চেয়ে বড় অভদ্রতা, অশিক্ষা একজন শিক্ষিত মানুষের মধ্যে আর কিছুই ভাবা যায় না । নিজেকে ভদ্রলোক বলে প্রমাণ করুন । ওষুধ খাচ্ছি । ফারস্ট ক্লাস । দামেও কম, কাজেও বেশি । ঋতি ।

* * *

ঋতি রায়
৩৮ই বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯

বেতলা
৩/১/৮৮

প্রিয় ঋতি ।

আজ বিছানাতে শুয়ে শুয়েই তোমাকে চিঠি লিখছি ।

যেরকম ঠাণ্ডা পড়েছে তাতে মনে হচ্ছে না যে এগারোটার আগে কাজকর্ম কিছুই হবে বলে । এ সময়ে বাইরে গেলাসে জল রেখে দিলে সকালে তা বরফ হয়ে যায় । ম্যাকলাস্কিগঞ্জে, নেতারহাটে, গাড়ু, কুমাণ্ডি সব জায়গাতেই হয় । মারুমার মহুয়াডাঁরেও । ঠাণ্ডার বাবদে নামী জায়গা সব । তবে এই আবহাওয়া, বনের কোরকের মধ্যেও এই নির্মল পরিবেশ, অক্সিজেন কতদিন থাকবে আর জানি না । জাত হিসেবে আমরা লজ্জাহীন কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে উঠেছি । সম্পূর্ণ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য । কবি কালিদাসেরই মতো যে শাখায় অবস্থান সেই শাখাকেই প্রবল উৎসাহে কর্তন করে চলেছি প্রতিনিয়ত । বন যে ভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এই দেশে, যত দ্রুত, তার পরিণতির ভয়াবহতা সম্বন্ধে ঘুষ-খোর রাজকর্মচারী আর দায়িত্বজ্ঞানহীন অশিক্ষিত মুনাফাবাজদের কোনো ধারণা পর্যন্ত নেই ।

আজকালকার মায়েরা ছেলেমেয়েদের কোন্ শিক্ষা দিয়ে লালন পালন করেন জানি না । তাঁরা কি ছেলেদের যেন-তেন-প্রকারেন টাকা রোজগার করে বড়লোক হবারই যন্ত্র করে দেন আর মেয়েদের দেন সেইরকম কৃতি ছেলেদের বিয়ে করে তার অজস্র চাহিদাগুলি ছেলেটির চাহিদার সঙ্গে মিলিয়ে সতত সুখশান্তির ঘরকে জতুগৃহ করে তুলতে ? সত্যিই জানি না । তুমি মেয়ে । তুমি একদিন মা হবে । মা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গম সুখের কোনো সাযুজ্য নেই । সহস্রবার সঙ্গমের সুখও মা হওয়ার সুখের সমান নয় অথবা দুঃখেরও । কিন্তু মায়ের মতো মা যদি না হতে পারো, নিজের সন্তানকে যদি মানুষের মতো করে বড় করে গড়ে তুলতে না পারো, আদর্শে উদ্বুদ্ধ না করতে পারো, কী আপাতসত্যি আর কী কী সত্যি তার মধ্যে পৃথক করার ক্ষমতা না জাগিয়ে তুলতে পারো তাহলে টাকা-রোজগার করা অগণ্য রোবটের একটি রোবট তৈরির ঝামেলাতে না গিয়ে জম্পেস করে গরমে তেল-কই বা শীতে ছাতুর লিট্টি

বানিও। দেশ ও দশের প্রভূত উপকার হবে। এসব কথা তোমার শহুরে ইংরিজি শিক্ষিত, আধুনিক, বিজ্ঞান-বিশ্বাসী মন মেনে নেবে না জানি। তাড়া নেই কোনো। প্রত্যেকটি জানাকে জানতে হলে তার জন্যে যে সময় নির্ধারিত; তা দিতে হয়। তাড়াহুড়ো করলে হয় না। রামকৃষ্ণদেব তো একদিনে মা কালির দর্শন পাননি? নিখিল ব্যানার্জি একদিনে নিখিল ব্যানার্জি হননি। আলি আকবর খাঁ সাহেব, উস্তাদ রবিশংকর, আমীর আলী খাঁ সাহেব কেউই একদিনে তাঁর জিজ্ঞাসার শেষে এসে পৌঁছননি। বুঝতে যদি দাও, তো নিশ্চয়ই বুঝবে একদিন। সকলকে যে সব বুঝতে হবেই তেমন কোনো মানেও নেই। যার যেমন ভাবনা যার যেমন রুচি, কর্ম সে তেমন জিনিসের পেছনেই সারা জীবন দৌড়ে বেড়ায়। কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ সে কথা আমি জানি না। শুধু জানি, যে-জানাকে আমি হৃদয়ে জেনেছি তা ধ্রুব। তোমারও যে তাকে জানতে হবেই এমন কোনো মানে নেই। তবে যদি কোনোদিন সত্যিই জানতে উৎসুক হও তো জানিও। আমি, এই অত্যন্ত অজ্ঞজন যতটুকু জানি, যতটুকু বুঝেছি সার হিসেবে, অনেক পুঁথি পড়ে নয়; নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে নির্জনে, দিনে রাতে, চাঁদে রোদে সেইটুকুই।

পুবের দিকের জানালাটা খুলে দিয়েছিলাম একটু আগে। রোদ আসছে কৃষ্ণচূড়া আর জ্যাকারান্ডার ফিনফিনে পাতা পিছলে। সামনেই বেতলা টুওরিস্ট লজ্-এর সামনে যেখানে বাইরের টুরিস্টরা এসে টিকিট কেটে, গাইড নিয়ে স্পটলাইট ফিট করে জঙ্গলে যান, তার সামনের মাঠে হঠাৎ হুটোপাটির আওয়াজ। চমকে তাকিয়ে দেখি একদল বুনো কুকুর একটি চমৎকার চিতল পুরুষকে খুবলে খেতে খেতে ধাওয়া করে আনছে। চিতলও দৌড়চ্ছে তীব্র গতিতে, ওরা দৌড়চ্ছে বিদ্যুৎ চমকের মতো। চিতলটা ঐ মাঠেই কাঠের যে দোতলা টিকিট ঘরটি আছে তার প্রায় নিচেই এসে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। তারপর যতক্ষণে তোমাকে এই চিঠি লিখছি ততক্ষণ চাকুম-চুকুম করে তারা হরিণটিকে নিঃশেষ করে দিলো। পড়ে রইলো কঙ্কাল এবং প্রকাণ্ড শিংটি। খুশি বুনো দাঁড়কাক আর অখুশি শকুন ভোজবাজীর মতো উড়ে এলো। মনটা খারাপ হয়ে গেলো খুব। এমন একটি সুন্দর সোনালী ঝালর-ঝোলা সকালে আমারই চোখের সামনে এই ঘটনা না ঘটলেও তো হতো।

তবে এটি একটি ঘটনা। ঘটনাই মাত্র। এতে তোমার আমার দুঃখিত হওয়ার কিছুমাত্র নেই। অরণ্য গভীরে নগরে বন্দরে এই যে জন্ম-মৃত্যু-বিরহর খেলা চলেছে তা এক বৃত্তর মধ্যেই ঘটছে। ইঁদুর খাচ্ছে বুনো ধান, ইঁদুরকে খাচ্ছে সাপ, সাপকে খাচ্ছে ময়ূর, মারছে বেজি, বেজিকে কখনও সখনও শেষ করে দিচ্ছে চিতাবাঘ বা ঈগল। ঘাস পাতা খাচ্ছে চিতল শম্বর, তাদের খাচ্ছে বাঘ-চিতা, বাঘ-চিতার মারা পশুর অবশিষ্টাংশ খাচ্ছে শকুন, হায়না, নানারকম মাংসাশী পাখি। জন্মর মধ্যেও যেমন বিশেষ আনন্দর কিছু দেখি না তেমন মৃত্যুর মধ্যেও বিশেষ দুঃখর কিছু নয়। বৃত্তকে সম্পূর্ণ করার যে অনাদিকালের প্রক্রিয়া ঘটিয়ে চলেছি আমরা অনবধানে তারই দিকে এক সামান্য আলোড়ন এই ঘটনা।

চিতল হরিণটির নিশ্চয়ই নাম ছিল না কোনো। ওদের আলাদা আলাদা নাম কি থাকে? কে জানে? যদি আমাকে ওর নাম দিতে বলতো কেউ আমি দিতাম যতি।

এই নিরন্তর আনন্দধারার মধ্যে যতির ভূমিকা সবচেয়ে বড়। তুমি তো ছেলেমানুষ পাগলী। যখন আমার মতো বড় হবে তখন হয়তো বুঝবে এসব কথা।

রবীন্দ্রনাথের এই গানটি জানো? না জানলে লিখে নিও। বড় ভালো গান। তবে তাল-কাঁচা মানুষদের জন্যে নয়, তালে কেঁচিয়ে দেবেন,

"বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা
বাজে অসীম নভোমাঝে অনাদি রব
জাগে অগণ্য রবিচন্দ্রতারা ॥
একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যে
পরম-এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে।
বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত,
লক্ষশত ভক্তচিত বাক্যহারা ॥"

SUZANNE VEGA-র গান শুনলে কি, কই কিছুতো জানালে না ?

"I Won't use words again
They don't mean what I meant
They don't say what I said
They're just the crust of the meaning
With realms underneath
Never touched
Never touched
Never even moved through
If language were liquid

And it's gone
Gone
Gone
And it's gone

ভালো থেকো। সবসময় খুশি থেকো। ছোট্ট একটা জীবন ভুলে যেও না। একটা মাত্র।

—ইতি রাজর্ষি

* * *

ঋতি রায়,
বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা

জানুয়ারী,
গোলমুড়ি ক্লাব,
গোলমুড়ি, জামশেদপুর

কল্যাণীয়াসু,

গতকাল জামশেদপুরে এসেছি। তুমি নিশ্চয়ই এসেছো এখানে। আমার খুব ভালো লাগে জায়গাটি। অবশ্যই ভালোলাগার কারণ আছে। কোনো কোনো জায়গা স্থান মাহাত্ম্যর কারণেই ভালো লাগে। যেমন আমার বর্তমান কর্মস্থল পালামৌ। জামশেদপুর ভালো লাগে এখানের মানুষজনের জন্যে। যাঁদের জন্যে এখানে আসি। ছুটি-ছাটা পেলেই।

গোলমুড়ি জায়গাটা যেন একটি বাগান। টেলকোর কারখানা আর টিনপ্লেট কোম্পানীর কারখানা কাছে।

টেলকোর ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রডাক্ট ডিভিসানের ম্যানেজার রবি মুখার্জি, আমার রবিদা এবং

মায়া বৌদির বাড়িতেই প্রতিবারে উঠি। কিন্তু রবিদার মেয়ে বাবলার পরীক্ষা সামনেই। তাই পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও এবারে ওঁদের বাড়িতে উঠিনি। আমার স্বভাবে এবং হয়তো চরিত্রেও এমন কিছু আছে যে যেখানেই আমি থাকি না কেন তার চারপাশে এক ধরনের আবর্তর সৃষ্টি করি। অজানিতে এবং অনিচ্ছায়, সেই আবর্ত যে স্বাস্থ্যকর বা শান্তিকারক তা আমার মনে হয় না। আমার মতো মানুষের পক্ষে ছেলেমেয়ের পরীক্ষার আগে কারো বাড়িতেই ওঠাটা ভদ্রজনোচিত কাজ নয়।

আমি বিবাহিত হয়েও দৈব দুর্বিপাকে অবিবাহিত। তুমি জানো সে কথা।-মানে শ্রুতি যেটুকু জানে। এবং জানিয়েছে। যদি যথাযথ বিবাহিতের মতো জীবন আমাকে যাপন করতে হতো তাহলে রবিদা আর মায়া বৌদিকেই দৃষ্টান্ত করে রাখতাম। তাঁদের প্রাণপ্রাচুর্য এবং একে অন্যের প্রতি অভিযোগহীনতার কারণে। এতো প্রেম আমি খুব কম দম্পতীর মধ্যেই দেখেছি। দুজনেই দুজনকে যেন পলকে হারান। প্রেম করে বিয়ে করার পর সচরাচর প্রেমকে এমন উজ্জীবিত উদ্দীপিত করে বাঁচিয়ে রাখা দাম্পত্য সম্পর্ক বড় বেশি দেখিনি।

যাকে জীবনে ভালোবাসা যায় তাকে ভুলেও বিয়ে করতে নেই বোধহয়।

কারণ, বিয়ে ব্যাপারটা একটা বিচ্ছিরী অভ্যেস। যে অভ্যেস একে অন্যকে নিজেদের কাছে অজানিতেই বড়ই বৈচিত্র্যহীন, পুরোনো করে দেয়। এই প্রেক্ষিতে রবিদা-মায়াদিকে দেখে সত্যিই বড় অবাক লাগে।

রবিদা বৌদির আতিথেয়তার কোনো তুলনা নেই। সাহিত্যিক, কবি, চিত্রাভিনেতা যাঁরাই আসেন জামশেদপুরে তাঁদের মধ্যে ওঁদের আতিথেয়তা পাননি এমন মানুষ খুব কমই আছেন। রবিদা স্থানীয় সাহিত্য পত্রিকা "কৌরব" (লিটল ম্যাগ্)-এর একদা-নকশাল এখন থিতু প্রাণচঞ্চল সুদর্শন সম্পাদক সকলেরই পরিচিত এবং অনেকেরই প্রিয় কমল চক্রবর্তীর খুবই কাছের মানুষ। জামশেদপুরে রবিদার সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার কমলেরই মাধ্যমে।

আমি নগণ্য জংলী মানুষ। কবি সাহিত্যিক গায়ক চলচ্চিত্রাভিনেতা কিছুই নই। গুণ বলতে আমার কিছুমাত্রই নেই। সেই আমার জন্যেও ওঁদের হৃদয়ে যে ভালোবাসা এবং উষ্ণতা প্রতিবারই লক্ষ করি তাতে বার বারই মনে হয় যে ভালোবাসা বা উষ্ণতা বোধহয় গন্তব্য-নির্ভর নয়। যাঁদের ভালোবাসার বা অন্যকে উষ্ণতা দেবার ক্ষমতা আছে তাঁরা বোধহয় হৃদয়ের তাগিদেই অন্যকে উষ্ণ করে তোলেন। ভালোবাসেন। প্রসূতি মায়ের স্তনের দুধের মতোই তা না বিলোলে বোধহয় এক ধরনের ভার বোধ করেন ঐ স্তরের মানুষেরা। এই কুটিল, জটিল, স্বার্থপরায়ণ সংসারে যে এমন মানুষেরা এখনও আছেন এই জানাটাই মস্ত জানা!

ওঁদের দুজনের মাধ্যমে যে কত মানুষেরই সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে এখানে বারে বারে এসে কত মানুষের স্বার্থহীন স্বচ্ছতোয়া ভালোবাসা পেয়েছি তা মনে করলেও হৃদয় সুখানুভূতিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে।

গতকাল আমার বুকে হঠাৎ একটা ব্যথা আরম্ভ হয়। অম্বলের ব্যথাই হবে। হৃদয়ঘটিত দৌর্বল্য থাকে তাঁদেরই যাঁদের হৃদয়ের ওপরে অনেকের দাবী থাকে। অথবা যাঁদের দায়িত্ব অথবা অর্থর প্রাচুর্য থাকে। আমি এই তিন শ্রেণীর কোনো শ্রেণীতেই পড়ি না। তবু ব্যথা। ডঃ তাপস সরকার রবিদাদের বন্ধুস্থানীয় ও প্রতিবেশী। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিজে নিয়ে গেলেন টেলকোর হাসপাতালে। এমনই ভাব যেন এ অধমের হৃদয় বন্ধ হয়ে গেলে তাবৎ পৃথিবীর প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে যাবে। কী চমৎকার হাসপাতাল! ঝকঝকে তকতকে। ডঃ

সরকারের উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখেরই মতো। যদিও এখানে এসেছি বহুবার, অসুস্থ হইনি আগে কখনও। তাই হাসপাতাল দেখার সুযোগও হয়নি। আমি ঠিক করেছি মরার সময় এখানে এসেই মরবো। ডঃ চ্যাটার্জি প্যাথোলজিস্ট। অতি সুপুরুষ দীর্ঘকায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক। যৌবনে কত নারীর রক্তে উন্মাদনা জাগিয়েছেন তিনি জানেন। আজ জীবিকার কারণে আমার মতো কুদৃশ্য নির্গুণ মানুষের রক্তের কারবারী! রক্তের রিপোর্ট কাল পাব। মনিতোষ রায়ও ডঃ তাপস সরকারের সঙ্গে আমার চিকিৎসাতে লেগে গেলেন। তরুণ, সদ্য বিলেত-ফেরত টগবগে যুবক। শুনলাম ওঁর স্ত্রীও ডাক্তার। সুন্দরী সপ্রতিভ এবং আধুনিকা। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। পরে জানলাম যে, ওঁর স্ত্রী চিত্রা রাঁচীর মেয়ে। সেও ইংল্যান্ডে ছিলো বহুদিন। মিথ্যে বলব না, এক সময় আমাদের পাড়ার সব ছেলেই রাঁচীর সুন্দরী মেধাবী চিত্রার প্রেমে পড়েছিলাম। কিন্তু হাসিখুশি হলেও ভীষণ কড়া মেয়ে ছিলো ও। কেউই ঘেঁষতে পারিনি কাছে। খুব ভালো লাগলো এতদিন পরে চিত্রাকে দেখে। ডঃ তাপস সরকারের স্ত্রী শুভ্রাও ডাক্তার। উনিও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞা। উনিও সুন্দরী। আত্মার সৌন্দর্যে। আমার কাছে অন্য কারণেও সুন্দরী। কারণ চমৎকার শুঁটকী মাছ রেঁধে খাওয়াবেন বলেছেন আমাকে আগামীকাল রাতে।

টেলকো হাসপাতালের মতো হাসপাতাল দেখার পর আমাদের দেশের সরকারী হাসপাতালগুলির কথা মনে পড়ে যায়। টেলকো ও টাটা কোম্পানীর সাধারণ কর্মচারীদের হাসপাতাল আমি দেখিনি। আশা করব সেই সব হাসপাতালের সঙ্গে এই সব হাসপাতালের বিশেষ তফাৎ নেই। তফাৎ থাকলে তা টাটা-গোষ্ঠীর মতো আধুনিকতা ও আধুনিকতম প্রযুক্তিতে বিশ্বাসী শিক্ষিত গোষ্ঠীর পক্ষে লজ্জার কারণ হওয়া উচিত।

যত দূর মনে পড়ে আব্রাহাম লিঙ্কনই বলেছিলেন যে, যে-মানুষ, যে-দেশ তাদের তৎকালীন সহজ শান্তি সুখ এবং স্বাধীনতার জন্যে শান্তি ভাঙতে ভয় পায় সুখকে বিঘ্নিত করতে ভাবিত হয়, ঘূর্ণীঝড়ের মধ্যে পড়তে দ্বিধা করে; সুদূর ভবিষ্যতে তাদের ভাগ্যে না জোটে শান্তি, না থাকে সুখ। স্বাধীনতা তো পায়ই না। আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কারোই বোধহয় আর ঘুমিয়ে থাকার অবকাশ নেই। তুমি কী বলো? ঋতি? কোথাও পড়েছিলাম, ঠিক কোথায় তা এক্ষুনি মনে করতে পারছি না, খুব সম্ভবতঃ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কোনো লেখাতে যে, মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন হয়ে যায় যদি না সেই শিক্ষা সমাজের সম-সময়ের মানুষের ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে নিয়োজিত হয়। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় তখন লর্ড ওয়াভেল, ভারতের বড়লাট, ইংল্যান্ডের রাজা জর্জ দ্যা সিক্সথ্‌কে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, ‘We have done the worst in the field of education in India as we have given them education of letters only and not of character’। কথাটা পুরোপুরি ঠিক। মস্ত দুঃখের কথা এইই যে কথাটা আজকে দেশ স্বাধীন হওয়ার চল্লিশ বছর পরও আমাদের নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে পুরোপুরি প্রযোজ্য। কথাটা বোধহয় রূঢ় সত্যি। অক্ষর পরিচয় থাকলেই বাংলা ইংরিজি ফরাসী সাহিত্য বা সংস্কৃতির খোঁজ রাখলেই কোনো মানুষ শিক্ষিত হয়ে ওঠেন না। যে-শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠন না করে, যে-শিক্ষা ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়কে পৃথক করতে না শেখায়, যে-শিক্ষা Courage of conviction না দেয় শিক্ষিত মানুষকে সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। তেমন পণ্ডিতদের কখনওই শিক্ষিত বলা যায় না। তা তাঁরা যতবড় পণ্ডিতম্মন্যই মনে করুন না কেন নিজেদের।

ইংরেজদের দোষ দিতে পারি না। আমাদের পূর্ব পুরুষদের যদি তারা Education of

character দিতেনই তবে দীর্ঘ দুশো বছর এই দেশকে পদানত করে রাখা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হতো। কিন্তু দেশ তো স্বাধীনও হয়েছে কম দিন হলো না। এই চল্লিশ বছরে আমরাই বা কী করলাম। কী যে করলাম তা ভাবতেও লজ্জা করে। কিন্তু যাঁরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, যাঁরা ভি ভি আই পি তাঁদের কি লজ্জাবোধ বলে কিছুমাত্রই অবশিষ্ট আছে?

এবারে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। এই গোলমুড়ি ক্লাবটি একটি চমৎকার ক্লাব। একতলার গেস্ট রুমে জানালা দিয়ে যে ঘরে আমি আছি ঝাউগাছের ফাঁক দিয়ে টেনিস লন্-এর বেড়া পেরিয়ে ক্লাব-হাউসের মস্ত উঁচু বাড়িটার আলোগুলোকে দেখে মনে হয় বুঝি কোনো রাজপ্রাসাদ। ইংরেজরা যখন রাজা ছিলেন তখন এই ক্লাব বানিয়েছিলেন। কেন না, শাহ-ওয়ালেস কোম্পানীর বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য তখন বহু দূর বিস্তৃত ছিলো। ইংরেজরা ক্লাবকে তাঁদের জীবনের অঙ্গ হিসেবেই দেখতেন। আমোদ-প্রমোদ শরীর-চর্চা এবং সামাজিক মিলনের পীঠস্থান ছিলো এই ক্লাব। কিন্তু ইংরেজরা শরীর চর্চার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবকিছুর চর্চাও করতেন। ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের সাহেবরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন দেশগুলির যে গেজেটিয়ার লিখে গেছিলেন, বিজাতীয় মূল ভাষা, উপজাতিদের ভাষা জেনে নিয়ে, দেশের অগম্য সব প্রত্যন্ত প্রদেশে গিয়ে এই দেশের মানুষ, সংস্কৃতি, ভাষা, পশু পাখি, ফুল ফল, গাছ-গাছালি সম্বন্ধে যে অসাধারণ অভাবনীয় জিগীষার নিবৃত্তি করে প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন করে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছিলেন তার সঙ্গে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেস এর কাজের কোনো তুলনাই চলে না। কথাটা বলতে লজ্জা করলেও কথাটা—নির্মমভাবে সত্যি যে, তার নগ্ন, জাজ্বল্যমান প্রমাণ আজকের এই ভারতবর্ষ। আজকে দেশের প্রশাসন সাধারণভাবে যাঁরা চালান তাঁদের বিবেক, যোগ্যতা, সততা নিয়মানুবর্তিতা এবং নিজেদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা দেখে অনেক বয়স্কদেরই বলতে শুনি যে ভারতবর্ষ পরাধীন থাকলেই দেশের লোকের বোধহয় ভালো হতো। এই স্বাধীনতা সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের "দেশে বিদেশে" বর্ণিত আফগানিস্থানের স্বাধীনতার সমার্থক হয়ে উঠেছে। ভাবতেও লজ্জা করে। স্বাধীনতার যোগ্যতা বোধহয় এখনও আমরা অর্জন করিনি। হয়তো করবো কোনোদিন বুকের রক্তে।

ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। নেই এ কথা বলবো না। কিন্তু কথায়ই বলে : **'Exception proves the rule'** মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রমীরাই প্রমাণ করেন আজকের শাসকদের সাধারণ মান কোন্ পর্যায়ে নেমে এসেছে।

আজ এখানেই শেষ করি। তোমাকে ডিসটার্বিং সব কথাবার্তা বলে ফেলার কারণে দুঃখিত। ভালো থেকো।
ইতি রাজর্ষি

The Online Library of Bangla Books

জামশেদপুর, গোলমুড়ি ক্লাব
রবিবার

ঋতি রায়
ঋতি, উজ্জ্বলতমাসু

প্রায় সাতদিন কেটে গেলো এখানে। কী করে যে কেটে গেলো ভেবেই পাচ্ছি না।

গোলমুড়ি ক্লাবে আজ সকাল থেকেই খুব ভিড়। গল্ফ-এর টুর্নামেন্ট আছে। ভোর সাড়ে ছটা থেকেই ক্ষণে ক্ষণে মাইকে ঘোষিত হচ্ছে মিঃ চাওলা, মিঃ পাওলা, মিস গ্রোভার, মিস্টার মাসুদ, মিস্টার কোদন্ডরমনদের নাম। এবং সরল ব্যানার্জি। ইয়েস একজন মাত্র বাঙালির নাম শুনে পুলকিত হলাম।

বাঙালিরা বোধহয় আজকাল শুধুই রাজনীতি আর লিটল ম্যাগাজিন করে। অন্য কোনো কিছুই করে না। প্রথম সারির কোনো বাঙালি খেলোয়াড় ক্রিকেটে, টেনিসে, গল্ফে, ব্যাডমিন্টনে বা স্কোয়াশে নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় ফুটবল। তাও চিমা ওকারিদের ভিড় ক্রমশই বাড়ছে। কলকাতারই বুকে। তবে ব্যতিক্রম বোধহয় এখনও রাইফেল শুটিং, সাঁতার এবং সম্ভবত রোয়িং-এ আছে। রাজর্ষি বসুর এখানে রাজার মতোই খাতির যত্ন হচ্ছে।

আমার দরজায় একটু আগে টোকা মেরে গেছে গৌতমদার ছেলে ওস্তাদ। নেমন্তন্নর কথা মনে করিয়ে দিয়ে। ডঃ গৌতম দাশগুপ্ত ই· এন· টি· আর তাঁর স্ত্রী শান্তিনিকেতনের সুন্দরী কল্যাণীদি বলতে গেলে একেবারে গোলমুড়ি ক্লাবের দোরগোড়াতেই থাকেন। ঝিলম রোডে। ওস্তাদের মতো লাজুক মুখচোরা পনেরো বছরের ছেলে বড় একটা দেখিনি। ওর মা-বাবা মধ্যপ্রদেশের উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে ভরপুর আবহাওয়ার একটি জায়গায় যখন ছিলেন তখন ওস্তাদের জন্ম। তাই নাম ওস্তাদ। জীবনে একাধিক ক্ষেত্রে পরে ওস্তাদি দেখাবে এমন আশা রাখার কারণ আছে।

এই ঝিলম রোডেই থাকেন অর্থনীতির সপ্রতিভ অভিজিৎ সেন এবং সবিতাদি। ডঃ তাপস সরকারের বাড়ি ইতিমধ্যে একদিন নেমন্তন্ন খাওয়া হয়ে গেছে। তাপসদা নিজেও শুঁটকি মাছের একটি পদ রেঁধেছিলেন। আজ নেমন্তন্ন আছে কল্যাণীদি ও গৌতমদাদের বাড়ি। গতকাল রাতে সবিতাদিও চমৎকার খিচুড়ি খাইয়েছিলেন। অবশ্য আমারই অনুরোধে। খাওয়াতে চেয়েছিলেন পোলাও মাংসই। বললেন, এমন অতিথি নিয়ে ঝামেলা নেই। পোলাও মাংস ফেলে খিচুড়ি খেতে চায় এমন বাঙালি অতিথিদের মধ্যে আজকাল সত্যিই দুর্লভ। অবশ্য সঙ্গে কাটিসার্ক টুয়েলভ ইয়ার্স ওল্ড স্কচ হুইস্কিও খাইয়েছিলেন অভিজিৎদা।

আমি এ সব রসে বঞ্চিত হলেও খেয়ে দেখেছিলাম।

সাধুসঙ্গে মন্দ লাগেনি। জানি না অসৎ সঙ্গে কেমন লাগবে। বেশ রাজা রাজা ভাব হলো কিছুক্ষণের জন্যে। গৌতমদাও ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট খাইয়েছিলেন। আর রবিদা তো

একেবারে কালো-কুকুর। মানে ব্ল্যাক ডগ। আয়ুব খাঁর ব্র্যান্ড। তবে মনটা হুইস্কি খেলে বড়ই দ্রবীভূত হয়ে যায়। প্রেমিক-প্রেমিক হয়ে ওঠে। আমার মতো মানুষের পক্ষে এ সব ব্যাপার থেকে দূরে থাকাই ভালো। যার প্রেমে কেউই পড়ে না তার প্রেমে কি হুইস্কি খেলেও পড়বে কেউ ?

টেলকোর এই নীলডি এলাকাটিতে বসে থাকলে মনেই হয় না যে কোনো বড় শিল্পনগরীতে আছি। কাছেই কুর্চিবনের নিভৃত নির্লিপ্তি। আম, জাম, কাঁঠাল, সোনাঝুরি, শিশু, বাঁশ, নানারকম শৌখিন সব দিশী-বিদিশী গাছ প্রত্যেক বাড়িতে। এই উপনগর যখন বানানো হয় তখন বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছিলো যাতে অরণ্যর ন্যূনতম ক্ষতিও না করা হয়। এই মনোভাব এবং প্রকৃত শিক্ষা যদি আমাদের দেশের সব শিল্পপতি আর বড়লোকদের থাকত ! কানাডাতে একটি গাছ কাটলে দশ বছরের জেল হয় জানো ? এমনকি আমাদের দেশের ব্যাঙ্গালোরেও যে বাড়িতে যত বেশি বড় গাছ তার করপোরেশান ট্যাক্স তত কম। নীল্‌ডি আসলে নীলডিহ। ডিহ মানে আদিবাসীদের ভাষাতে ডেরা। কুকড়াডিহ, যশিডিহ, গিরিডিহ ইত্যাদি। সভ্য শিক্ষিত ইংরেজরা যেখানেই গেছে সে পূর্ব-আফ্রিকাই হোক কী ভারতবর্ষ, কি বার্মা সেখানেই ভালো ভালো জায়গাগুলোর দখল তারা নিয়েছে ক্রমে ক্রমে আদি বাসিন্দাদের স্থানচ্যুত করে। কেনীয়ার নাইরোবি ছিলো মাসাইদের অন্যতম আদিবাস। নাইরোবি শব্দটিও একটি মাসাই শব্দ। তার মানে হচ্ছে 'খুব ঠাণ্ডা'। কিন্তু মাসাইরা বহুদিন হলো চলে গেছে নাইরোবি ছেড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। মূলত তাদের বাস এখন টানজানিয়ার সেরেংগেটি প্লেইনস-এ। পৃথিবীর বৃহত্তম মৃত আগ্নেয়গিরি "গোরোংগোরোর" চারপাশে। আফ্রিকার গ্রেট রিফ্‌ট ভ্যালী, যেখানের "ওলডুভাই গর্জ"-এ জার্মান অধ্যাপক লিকি আদিমতম মানুষের ফসিল আবিষ্কার করেছিলেন সেই সব অঞ্চলে। এখন অবশ্য পুরাতত্ত্ববিদেরা বলছেন যে আদিমতম মানুষ আফ্রিকার রিফ্‌ট ভ্যালীর ওল্‌ডুভাই গর্জ-এ নয়, ভারতের সাতপুরা রেঞ্জেই বাস করতেন। সাম্প্রতিক অতীতে সেখানে নাকি ওল্‌ডুভাই গর্জ-এর চেয়েও পুরোনো ফসিল আবিষ্কার করেছেন তাঁরা।

বারান্দার রোদে বসে তোমাকে চিঠি লিখতে লিখতে দেখি মোটর সাইকেলে চেপে মাথায় হেডগিয়ার চড়িয়ে কমল এবং তার কমরেড বারীণ আসছে ভট্‌ভটিয়ে। চিঠি এখন থামছে না। দূর থেকে কমল হাঁক ছাড়লো এই যে রাজর্ষিদা। অন্যান্যবারে আমি এসেছি জানলে যাওয়া-আসা করে ও। বয়সে ও আমার চেয়ে, কিঞ্চিৎ ছোটই হবে। তাই দাদাই বলে। খুব প্রাণবন্ত ছেলে। কমলের এবারে কিন্তু আমাকে দেবার মতো একটুও সময় নেই। কলকাতা থেকে যশস্বী কবি সাহিত্যিকরা আসছেন নাকি—কমলের কবিতার কাগজ "কৌরবের" পঞ্চাশতম সংখ্যা প্রকাশের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

এবার কমল ও বারীণের সঙ্গে একটু গল্প করি। ওদের কফি-টফি খাওয়াই। পরে লিখবো তোমাকে ফিরে। ওরা এখন সত্যিই খুব ব্যস্ত। এতো বড়ো একটা ব্যাপার করতে যাচ্ছে এবং তার বেশিদিন বাকিও নেই। বাজেট নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকার। আমারই ভাবলে ভয় করে। অন্য অনেক লিটল-ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের তো অজ্ঞান হয়ে যাবারই কথা। কফি ও স্যাণ্ডউইচ খেয়ে এই মাত্র ওরা চলে গেলো। সত্যিই বেচারীরা খুবই ভাবিত। কমল বলছিলো যে একজন "ফালতু" লেখক ওকে 'হ্যাঁ' 'না','না' 'হ্যাঁ' করে করে ভারী বেগ দিচ্ছে। সত্যিই আসবেন কিনা তা ঝেড়ে কাশছেন না।

তা শুনে আমি বললাম শুধু ফালতু লেখক কেন, ফালতু লোকেরাও তো ওরকমই করে। তাঁদের স্বভাবই ওরকম। দর বাড়াতে চান। আসলে দর নেই বলেই।

কমল বললো যা বলেছেন রাজর্ষিদা। গুলি মারো তাকে।

আমি বলল্যুম্।

ও বললো, তাই-ই মারবো। সেই ফালতু লেখকের নামটি উহ্যই থাক। কারণ ফালতু হলেও তাঁর হাতেও কলম আছে। আমার মতো সামান্য বনপালককে তাঁরা কাঁচপোকার মতো টিপে মেরে দিতে পারেন ইচ্ছে করলেই। পাগল আর্মড কনস্টেবল-এর হাতের রাইফেল আর ফালতু লেখকের হাতের কলম দুই-ই সমান বিপদের। পাগলই যখন তখন তাঁদের সাঁকো না নাড়াতে বলাটাই ভালো।

একটা ছোট্ট মৌটুসী পাখি ঝাউবনে এসে বসলো। ঝাউবনেও কি মধু থাকে? জানি না বটানিস্টরাই বলতে পারবেন। এবারে যেতে হবে। রবিদা-মায়াদি দুপুরে খেতে বলেছেন সেখানে কৃষ্ণা সেনগুপ্ত (এন জি সেনগুপ্তর স্ত্রী) রুই মাছের একটি পদ রেঁধে নিয়ে আসবেন আমার জন্যে।

এখানে এসে ইস্তক যেরকম আদর যত্নর বহর দেখছি তাতে বিয়ে করিনি অথবা করেও demotion হয়েছে বলে কোনো দুঃখ বোধ করার হেতুই নেই। বিয়ে করলে বড়জোর একজন শাশুড়ী এবং এক-দুজন শালী থাকতো আদর করার। এমন ডজনে ডজনে আদর করার লোক কোথায় পেতাম?

রবিদা-মায়াদি অবশ্য খুব টেনসানে আছেন কারণ কমলের এই দক্ষযজ্ঞের হোম-এর অনেকখানি দায় রবিদাদের উপরই ন্যস্ত আছে। সাগ্রহে প্রতিবারই ওঁরা করেন। এই দক্ষযজ্ঞ শুরু হবার আগেই দূরদেশী এই রাখাল ছেলের বটের বাটের ছায়ায় বাঁশি হাতে ফিরে যাওয়াটাই মঙ্গলের হবে।

শীতের দুপুরের রোদে নীলডির এই কলোনীর মধ্যে হেঁটে যেতে ভারী লাগে। কী সুন্দর সব রাস্তার নাম। নদীর নামে নাম অনেক। পাহাড়ের নামেও। রভি রোড, ঝিলম্ রোড, ভিয়াস্ রোড, খড়কাই রোড, দলমা রোড ইত্যাদি।

রবিদাদের বাড়িতে লাঞ্চ খাওয়ার পর একটু গল্পটল্প করে গৌতমদা-কল্যাণীদের বাড়ি যেতে হবে বিকেলে চায়ের নেমন্তন্নে। হাল্কা করে ফুল ফুল চিঁড়ে ভাজা। মধ্যে বাদাম, ধনেপাতা। সঙ্গে শুকনো লংকা ভাজা কড়কড়ে করে। ভাবতেই জিভে জল আসছে। মায়াদি বলেছেন আজ শর্ষে ধনেপাতা দিয়ে পার্শে মাছ রাঁধবেন। সঙ্গে বাসমতী চালের ভাত। নারকোল কুচি-দেওয়া ছোলার ডাল। টাটকা পালং শাকের তরকারী।

আঁধুনিকা ঋতি, তুমি কি জানো যে এ যুগেও একজন পুরুষ, আমার মতো বোকা পুরুষতো বটেই, কারো হাতের ভালো রান্না খেয়েই তার হৃদয়টা রাঁধুনীর হাতে দিয়ে আসতে পারেন? সে রাঁধুনী দাড়িওয়ালা বদরপুরী মুসলমান বা বড় মামার মুখে গল্প-শোনা বরিশালের নদীভাঙা ফ্লোরিকান গারো বা বাদা স্টিমারের কুকই হন কী কোনো ডাগর চোখের মহিলাই হন। রান্নার যে কতবড় গুণ তা তোমার মতো আধুনিকারা বুঝেও বুঝতে চাও না। বেতলাতে গতবছর একটি অত্যন্ত সপ্রতিভ বুদ্ধিমতী বিদূষী এবং সদ্বংশজাতা এম-এ পড়া মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিলো। সে বলেছিলো যে বিয়ে হলে পাঁউরুটি মাখন বা বেক্ড-বীনস্ বা সসেজ বা হ্যাম বা ওমলেট খেয়েই থাকবে। রান্নার মতো প্রি-হিস্টরিক ব্যাপারে সে নেই। মেয়েটি হয়তো জানেনা যে পুরুষদের মধ্যে সম্ভবত নব্বুই জন (এখনও নব্বুই জন, সে যতই 'মড' হোক না কেন) বিশ্বাস করে যে "the only way to the heart is through the stomach" এবারে বেরোবো। তোমাদের কলকাতার আর বালীগঞ্জের খবর দিয়ে চিঠি লিখো। চিঠির সঙ্গে TEL Co আর

TINPLATE CO'র কলকাতার ঠিকানা দিচ্ছি। ওখানে সকালে চিঠি দিলে পরদিনই পেয়ে যাবো। পাঠাচ্ছিও চিঠি সেইভাবেই। Daily courier service আছে।

আমি আরও বেশ কদিন থাকব এখানে। বেশ লাগছে। ভাবছি, ছুটি বাড়াবো।

ভালো থেকো।

রাজর্ষি

গোলমুড়ি ক্লাব
চার নম্বর ঘর, জামশেদপুর বিহার

বালীগঞ্জ প্লেস

এই যে বুনো মশাই।

আচ্ছা লোকতো! নীলডিতে বসে আছেন এতোদিন আর শ্রুতির মা বাবার সঙ্গে দেখা করলেন না? জি এম মিস্টার খুরানা অথবা আপনার অশেষ গুণসম্পন্ন রবিদাকে বললেও তো ঠিকানা পেতেন! এখন আর রাঁচী থেকে শ্রুতির বাবা মায়ের ঠিকানা জেনে আপনাকে জানানো সম্ভব নয়। রভি না ভিয়াস কী একটা নদীর নামের রাস্তা যেন! জামশেদপুরে তো এলেনও রাঁচী হয়েই। ঠিকানাটা তো শ্রুতির কাছ থেকে নিয়েও আসতে পারতেন? সত্যি! যা বুঝতে পারছি বেশ গুছিয়ে বসেছেন ওখানে।

শম্বর, শজারু, নীলগাই, খাটাস, বাঘ, হাতী আর জঙ্গলের মেয়েদের সঙ্গেই যার ওঠা-বসা তাকে বধ করার সবচেয়ে সোজা উপায় হচ্ছে শহরে এনে ফেলা। চোখ ধেঁধে যাবে, কানে তালা লেগে যাবে। আমি কী আর জানি না ভাবেন কেন আপনি কলকাতায় আসেন না? বন্যরা শহরে এলেই অভিমন্যু হয়ে যায়। বাঘা-বাঘা বুনো-ওস্তাদকে এনে চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বিকেল বেলা রাস্তা পেরুতে বলা হলে রাত এগারোটা অবধি একই জায়গাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে দেখেছি। বন্যেরা বনে সুন্দর কিন্তু তারা শহুরে বৌদিদের এক আঙুলের টোকাতেই টাকা-কেন্নোর মতো গুটিয়ে যান। আমার ঢের ঢের দেখা আছে।

তাড়াতাড়ি জঙ্গলে ফিরে যান ভালো চানতো। নইলে আমি কিন্তু সত্যিই রেগে যাব। ভয়টা আমার অন্যদের নিয়ে নয়। আপনাকে নিয়েই। আপনি নিজেকে যতটুকু জানেন বলে মনে করেন তার এক কণাও আপনি আসলে জানেন না। আপনার মতো নরম মনের soft-skinned animals-দের গুলতি দিয়েই আমাদের বালীগঞ্জের যে কোনো স্কুলের মেয়ে বধ করতে পারে। বন্দুক-ফন্দুকেরও দরকার নেই। আপনি একটি নিতান্ত ছেলেমানুষ। শিশুর মতো। অভিভাবকহীন অবস্থায় আপনার একা চলা-ফেরা করা ঠিক নয়। সত্যিই বলছি। আমাদের বিপদ জঙ্গলে। আপনার শহরে। জামশেদপুর ছোট হলেও শহর। কী আর বলব! কী করে আর বলব জানিনা। এতো সব বলার পেছনে আমার নিজের কোনোই স্বার্থ নেই। আপনার ভালোর জন্যেই এতো কথা বলছি।

ও একটা জরুরি কথা আছে। আমার এক বন্ধু আর তার স্বামী অরা আর প্রযত সামনের রবিবারে আপনাদের ওখানে যাচ্ছে। ওরা হাজারিবাগের 'রাজভেরোয়া ন্যাশনাল পার্ক'-এ

গেছে তাই এখন ওদের খবর দেওয়া বা জানানোও যাবে না। ওরা পৌঁছবার আগেই আপনি বেতলাতে না গিয়ে পৌঁছলে আমি খুবই এম্‌বারসিং সিচুয়েশান-এ পড়বো। জামশেদপুরে যে ছুটিতে আসবেন আপনি তা আমাকে জানাতে পারতেন না? আসলে ইচ্ছেই হয়নি।

পরশুর মধ্যেই জামশেদপুর থেকে প্যাক-আপ্ করে বেতলাতে চলে যাবেন। অবশ্যই। সত্যিই বলছি। অরারা যাবার আগে আপনি যদি না গিয়ে পৌঁছোন তাহলে আমার আর মুখ থাকবে না। আপনার কথা বড় মুখ করে বলেছিলাম। বলেছিলাম, আপনি…ভালো থাকবেন। বেশি খিচুড়ি, বা সর্ষে তেল অথবা ঘি-এর রান্না বা ঝাল, বা তেল-জবজব চিঁড়েভাজা কি স্বাস্থ্যর পক্ষে ভালো? নিজেই ভেবে দেখবেন। তার উপরে আবার শুঁটকি মাছ? আনথিংকেবল্। আপনি কি গুহা-মানব?

ইতি ঋতি

* * *

রাজর্ষি বসু
চার নম্বর ঘর, গোলমুড়ি ক্লাব/জামশেদপুর-৩/বিহার

১৫ই জানুয়ারী
বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯

অসভ্য,

আপনি কেমন মানুষ বলুন তো! ছিঃ। কাল সন্ধ্যেবেলা অরা আর প্রযত আমাদের বাড়িতে এসেছিলো। ওরা একেবারেই অনভ্যস্ত। নিজেদের পুরানো গাড়ি নিয়ে পৌঁছেছিল নিজেরাই ড্রাইভ করে। জঙ্গলে একে ঐরকম ঠাণ্ডা। তার উপর আপনি ছিলেন না। লাগাতার টিপটিপ করে বৃষ্টিও হচ্ছিল।

মোহন বিশ্বাস, যে দয়ালু ভদ্রলোক আমাদের গাড়ি দিয়ে রাঁচী পৌঁছে বিপদ-উদ্ধার করেছিলেন তাঁর দয়াও ওরা পায়নি। ডালটনগঞ্জে গিয়েও নয়। ওঁর লোকজনের কাছে শুনেছে যে তিনি নাকি ওঁর ঐ অঞ্চলের ব্যবসা গুটিয়ে আনছেন এবং এখন আর আগের মতো "অদানে-অব্রাহ্মণে" নষ্ট করার মতো সময়, জনবল এবং অর্থবলও ওঁর নেই। অন্যত্র ব্যবসাতে তিনি এখন খুব ব্যস্ত থাকেন। যাই হোক, মোহনবাবুর উপরে আমার জোর আর কতটুকু! যার উপরে আসলে ভরসা করে পাঠালাম অরাদের সেই আপনিই ছিলেন না! দেখলাম আমার বন্ধু অরা এখনও নাক টানছে। এমনই সর্দি। প্রযতর বুকে ঠাণ্ডা বসে নিউমোনিয়ার মতো হয়ে গেছে। সে তো শয্যাশায়ীই। এক্ষুনি অরা ফোন করেছিলো। উডল্যান্ডস্-এ ভর্তি হতে হবে প্রযতকে কাল সকালে। এই শীতকালের বৃষ্টির মধ্যে কন্টিন্যুয়াস এক্সপোজার কি সহ্য হয়? ওরা তো আর জংলী নয়!

আমি জানি আপনি বলবেন যে এমন "মাখনবাবু" আর "নেকুপুষুদের" শীতকালে বৃষ্টির মধ্যে বিনা বন্দোবস্তে জঙ্গলে যাওয়ার দরকারই বা কি?

বদলে আমিও বলব যে দরকার তো অনেক কিছুরই থাকে না। আপনারই বা ঠিক ঐ সময়েই জামশেদপুরে হঠাৎ যাওয়ার দরকার কি ছিল?

যাকগে অরাদের কথা। এনাফ ইজ এনাফ। এতো কিছু লেখার অধিকারও হয়তো

আমার নেই।

আমার পরিচিত, বন্ধুও বলতে পারেন, জ্যোৎস্না, চিঠি লিখেছে আমাকে জামশেদপুর থেকে। রাজর্ষি বসুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আপনারই পরিচিত একজনের বাড়িতে। জ্যোৎস্না তো রাজর্ষির প্রশংসাতে পঞ্চমুখ। জ্যোৎস্নার কাছেই শুনলাম যে আপনি নাকি ওখানে আপনার ভাজা-মাছটি না-উল্টে-খেতে জানা ভিজেবেড়াল অ্যাটিচ্যুডে খুবই জনপ্রিয় হয়েছেন। সকলেই ভালো চোখে নিয়েছে আপনাকে। জ্যোৎস্না নিজেও হাইলি ইমপ্রেসড। লিখেছে রাজর্ষি বসুর জঙ্গলের রাজত্বে একবার যাবে। আমি লিখেছি ওকে যে, আপনি আসলে একটি বৃদ্ধ ভাম। জঙ্গলের প্রাণীর চোখে শহরের আলো পড়লে প্রথম প্রথম তা চক্‌চক্‌ করেই। চোখ দুটিকে মনে হয় ঐশ্বরিক। অথবা ভৌতিক। কিছুদিন পরই সব কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে যায়। কি? ঠিক বলিনি?

বলুন?

আপনার সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি। আর চিঠি দেবো না।

ইতি—ঋতি

* * *

শ্রীরাজর্ষি বসু

বৃহস্পতিবার

সবিনয় নিবেদন,

আচ্ছা, আপনি কীরকম ডেঞ্জারাস লোক বলুন তো? ইম্পার্টিনেন্টও কম নন! আপনি আমার শেষ চিঠিরও উত্তর দিলেন না! আপনি কি অন্য মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করেন না?

প্রযত কাল উডল্যান্ডস থেকে ছাড়া পেয়েছে। ওর একটি ল্যাংসে প্যাচ্ হয়ে গেছে। সম্ভবত প্লুরিসী বা টিউবারকুলোসিস ডেভালাপ করবে। আমি দীর্ঘদিন ভেবে এসেছিলাম যে আমি আপনার কাছে একজন বিশেষ লোক। আ স্পেশ্যাল পার্সন। আমার ভুল ভেঙে গেছে।

নিজেকে আপনার কাছে কত যে ছোট করেছি বিনা কারণে এখন তাই ভাবি। ভাবি, আর নিজের উপরেই ঘেন্না হয়। আত্মহত্যা করা এক ধরনের ইডিয়সী। নইলে হয়তো আত্মহত্যাও করতাম। এমন অপমান আমাকে কেউই করেনি।

আমি হিন্দুস্থান লিভারে একটি চাকরী পেয়ে গেছি। লোকে বলছে খুব ভালো। আমার মতে মোটামুটি। ম্যানেজমেন্ট ক্যাডারে। প্রথম ক'মাস অবশ্য ট্রেনীই থাকতে হবে। তবে পাকা না হবার কোনো কারণ নেই। প্রথমেই বম্বে যেতে হবে। তারপর জানি না কোথায়। কলকাতায় সম্ভবত নয়। বাবা ন্যাচারালী খুবই আপসেট। ওরও ফিরে যাবার সময় হয়ে এলো।

যাক এই সব খবরে আপনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। নিছক আমারই অভ্যাস বশেই দিলাম। যদি বিরক্ত করে থাকি তো মার্জনা করবেন।

আর কী লিখব! আর কিছু লেখার নেই। আর আপনাকে লিখবোও না কখনওই।

ইতি—ঋতি রায়

ঋতি রায়
বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯

১৮ই জানুয়ারী
চার নম্বর ঘর, গোলমুড়ি ক্লাব, নীলডিহ
জামশেদপুর-৩

কল্যাণীয়াসু,

আঃ! কার্ল বহুদিন পর ডঃ সুচন্দ্রা আর ডঃ সন্তোষ ভট্টাচার্যর বাড়ি জম্পেস করে কড়াইশুঁটির কচুরি আর আলুর তরকারী খাওয়া গেল।

সুচন্দ্রাদি ঘণ্টায় ঘণ্টায় সিজারিয়ান সেকশান অপারেশন করে অগণ্য শিশুদের ধরাধামের আলো দেখান বলেই বোধহয় ঈশ্বর তাঁর হাতের গুণই আলাদা করেছেন।

ন্যাচারাল ডেলিভারীর মধ্যে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে সিজারিয়ান করা হলে তা আদৌ থাকে না। কোনো মহিলার তলপেট জীবনে না দেখেও (আমার তিন মাসের জন্যে কাছে থাকা স্ত্রীর ছাড়া) কল্পনা করতে পারি যে শরীরের যে অংশ মেয়েদের সবচেয়ে সুন্দর তাতে কাটাকুটির দাগ অত্যন্তই বিচ্ছিরি লাগার কথা। যাই হোক ন্যাচারাল ডেলিভারীর চেয়ে সিজারিয়ান অনেক বেশি করাতেই কড়াইশুঁটির কচুরি প্রায় বোমার আয়তন নিয়েছিল সুচন্দ্রাদির হাতে এবং প্রভাবও বোমার চেয়ে কিছুমাত্র কম হয়নি। তবে ডাক্তারদের বাড়িতে খেয়েদেয়ে মস্ত লাভ এই যে সেখানে অন্তত খেয়ে মরবার ভয় নেই। সঙ্গে সঙ্গে দুটি অ্যান্টাসিড ট্যাবলেটও খেয়ে নিলাম। রবিদা বেশি খাওয়াতে একটু খোঁড়াচ্ছিলেন। আমি বললাম ভয় নেই, আমার জন্যে খাটিয়া আনতে হবে।

আহ্! আজ সারা সন্ধে, সারা রাতে কড়াইশুঁটির কচুরির গন্ধে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা ম্ঁম্ঁ করবে। আঃ ঋতি রায়! ভালো রান্নার সঙ্গে পৃথিবীর সুন্দরীতমা মহিলারও কোনো তুলনা হয় না। ভালো থেকো। ভালো খেয়ো। ফিগারের জন্যে নিজের স্বাভাবিক ক্ষুধা এবং স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহকে কখনও বিসর্জন দিও না। ডাক্তারদের কথা শুনো না। পুরোনো দিনের মেয়েদের মতো কোমরসমান চুলে ভালো করে তেল দিও। চান করে উঠে চুল শুকিও। ডুরে পেড়ে ধনেখালি শাড়ি পরো। এমন শীতের দিনে রোদে মাদুর পেতে পা-ছড়িয়ে বসে টোপা কুল অথবা গরমে চালতা, নুন চিনি, শুকনো লঙ্কা পোড়া আর ধনেপাতা দিয়ে মেখে খেয়ো। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের চেহারা আলাদা, চরিত্র আলাদা, কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ রোগা, কেউ মোটা, তাই সকলেরই ব্লাড সুগার, ওজন, ক্লোরেস্টোরেল, ব্লাডপ্রেশার এক হতেই পারে না। কখনওই না। ও সব নিয়ে আদৌ মাথা ঘামিও না। চিত্তে সুখ নিয়ে চিরসুখী হও। ডাক্তারদের চক্করে ফেঁসো না। শাড়ি যদি পরতে ইচ্ছে না করে কখনও তবে চকরাবক্‌রা মড ম্যাক্সি পরে গাভওয়াল হাঁসীর মতো জীবন সমুদ্রে ভেসে যাও।

জঙ্গলে খেতে পাই না তো! জামশেদপুরে এসে আমার বৌদিদের আদর যত্নে

একদিনেই আমি একটি কচ্ছপ হয়ে উঠলাম। কচ্ছপদের আয়ু কত জানো ?

ভালো থেকো।

পুনশ্চ আগামীকাল এক বাড়িতে পাটিসাপটা, চিতোই পিঠে আর চষি পিঠে খাবার নেমন্তন্ন আছে। তোমরা তো 'মাখনদি' নামক কোনো মহিলার কাছ থেকে কেনা পিঠে খাও জানতে পেরেছি। ধিক্। ধিক্। তোমাদের। যারা সামান্য পিঠের ব্যাপারেও তঞ্চকতার আশ্রয় নেয় তাদের কোনো ব্যাপারেই বিশ্বাস করা যায় না। উচিতও নয়।

রাজর্ষি

* * *

রাজর্ষি বসু
চার নম্বর ঘর, গোলমুড়ি ক্লাব, জামশেদপুর

শনিবার
বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯

রাজর্ষি,

আপনি কি আমার কোনো চিঠিই পাননি ? আর যদি পেয়ে থাকেন তো জবাব দিচ্ছেন না কেন ? শেষ দুটি চিঠি ক্যুরিয়ার সার্ভিসেই তো পাঠালাম।

যদি পেয়েও নিরুত্তর থাকেন তাহলে জীবনে আপনার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না। সিরিয়াসলি বলছি কিন্তু।

—ঋতি

* * *

চার নম্বর ঘর, গোলমুড়ি ক্লাব
নীলডিহি/জামশেদপুর

ঋতিরানী

ঋতুরাজের আসার সময় হয়ে এলো। তুমি কি ভুনিখিচুড়ি রাঁধতে জানো ? কড়াইশুঁটির চপ ?

আমারই মতো, যারা জীবনকে ভালোবাসে তারা জীবনকে পুরোপুরি ভালোবাসে। জীবনের সবকটি দিকই। জীবনের সমস্তটুকুই ; একটুও বাকি না রেখে। নারীর শরীর থেকে বসন্ত-বিকেলের গন্ধ, বর্ষারাতের কদম আর করবী ফুলের গন্ধ আর কড়াইশুঁটির চপ সমস্তকিছুই সে ভালোবাসে—কিছুমাত্র বাকি না রেখে। ঠোঁট থেকে স্তনসন্ধি, স্তনসন্ধি থেকে নাভির নরম নিভৃত গহ্বর, নাভি থেকে উরুমূলের সুগন্ধি বিচিত্র রহস্য ; সব সব। জীবনকে চেটেপুটে খাওয়ার আরেক নামই তো ভালাবাসা।

ভোজরাজ রাজর্ষি

২১শে জানুয়ারি

* * *

রাজর্ষি বসু,
চার নম্বর ঘর, গোলমুড়ি ক্লাব, জামদেশপুর

২৩শে জানুয়ারি
কলকাতা-৭০০০১৯

রাজর্ষি

You are an incorrigible, rustic, shameless, glutton. You are an indecent and perverse animal. You are the concept of crudeness [আপনি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা বা চিঠি লেখবারও যোগ্য নন। আপনি একটি অসভ্য। আকাট। জংলী। পৃথিবীর কোনো ভদ্র-সভ্য মেয়েরই আপনাকে ভালো লাগতে পারে না। আপনি আমাকে আর চিঠি লিখবেন না। আমি আপনাকে ঘৃণা করি। I despise you for everything you are and all that you represent!

—ঋতি

* * *

ঋতি

বুধবার,
হাজারীবাগ, ন্যাশানাল পার্ক

কল্যাণীয়াসু,

কী ব্যাপার ? জামশেদপুর থেকে অতগুলো চিঠি লিখলাম আর একটিরও উত্তর দিলে না যে !

জানিনা, হয়তো চিঠি আসতে সময় লাগে। কিন্তু, ক্যুরিয়ার সার্ভিসের চিঠির তো আসা উচিত ছিলো !

অনেকদিন পর এখানে এলাম। এই পার্কে এসেছো কখনও ? গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড-এর বরহি থেকে অল্পই পথ। আবার গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোডেরই বগোদর দিয়ে ঢুকে হাজারীবাগ শহর হয়েও এখানে আসা যায়। রাঁচী থেকেও আসা যায় হাজারীবাগ হয়ে। হাজারীবাগ আমার খুব প্রিয় জায়গা। ছেলেবেলার অনেকটা সময়ই এখানে কেটেছে। বছর তিনেক হাজারীবাগের সেন্ট-জেভিয়ার্স স্কুলেও পড়েছিলাম। এই পার্ককে রাজডেরোয়া কেন বলে জানো ? বরহি থেকে হাজারীবাগ শহরের দিকে যেতে পথের ডানদিকে পদ্মার রাজার প্রাসাদোপম বাড়ি পড়ে। এই জঙ্গল অনেকদিন আগে পদ্মার রাজার খাস জঙ্গল ছিলো। রাজার ডেরার সংলগ্ন জঙ্গল বলেই এর নাম "রাজডেরোয়া"। এই পার্কে কিছুটা ঢুকলেই 'টাইগার্স ট্র্যাপ' আছে। রাজার আমলে বাঘ ধরা হতো। সিমেন্টে বাঁধানো মস্ত কুয়ো আছে একটা। অথচ

জল নেই তাতে। পুরোটাই বাঁধানো। পরিধিও মস্ত বড়। সেই কুয়োর নীচ থেকে একটি মস্ত সুড়ঙ্গ কুড়ি ডিগ্রী মতো কোণে উপরের জমিতে এসে উঠেছে। সেই কুয়োর উপরটাতে ডাল পাতা দিয়ে ক্যামোফ্লেজ করে রাখা হতো। একপাশে বাঁধা থাকতো মোষ। বাঘ মোষের লোভে এসে পড়ে যেতো কুয়োর মধ্যে। কিন্তু কুয়োটা এতোই গভীর এবং তার চারপাশে এমন মসৃণ করে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো থাকতো যে একবার পড়ে গেলে বাঘ কিছুতেই আর উপরে উঠে আসতে পারতো না। যত বড় বাঘই হোক না কেন। লাফিয়ে আর চিৎকার করে পুরো বন তখন বাঘ সরগরম করে তুলতো।

কয়েকদিন অভুক্ত পিপাসী অবস্থায় থাকার পর সেই সুড়ঙ্গের মুখের সঙ্গে মিলিয়ে একটি মোটা গরাদের খুব ভারী লোহার খাঁচা এনে বসানো হতো। তার দরজা উপরে টেনে দিয়ে খাঁচাটির সামনে কোনো গৃহপালিত পশু এবং জল রাখা হতো। বাঘ তা দেখে যখন খিদে তৃষ্ণায় বেপরোয়া হয়ে তা ধরতে আসতো তখন খাঁচার দরজা উপর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হতো। কোনো বাঘ যেতো চিড়িয়াখানায়। কোনো বাঘ যেতো বেয়াই বেয়ানের জমিদারীতে। শালীকে বা শালাজকে উপহার দেওয়া হতো কোনো বাঘ বা বাঘিনী।

যদি এদিকে কখনও আসো তো আমাকে জানিও। 'হারহাত্'-এর বাংলোতে থেকে যেও দুটি দিন। ছোট্ট বাংলো। নীচ দিয়ে ঝরঝর শব্দ করে বয়ে গেছে হারহাত নদী। হানিমুনের জন্যে বা প্রেমিকার সঙ্গে লাগাতার সহবাস করার চমৎকার জায়গা এ। একটু ভয়, একটু অপরাধবোধ না থাকলে যে-কোনো আনন্দই বোধহয় বড় জোলো হয়ে যায় হলুদ কাঁচালংকার ঝোলেরই মতো। স্বীকার তোমাকে করতেই হবে যে আমাদের মতো "থীওরীতে" জবরদস্ত ছাত্র বড় কমই পাবে। প্র্যাকটিক্যাল অবশ্য বেয়ারার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া নিরুপায়।

হাজারীবাগের পার্কে বড় বাঘ নেই। নেই বলছি তা বলে প্রথম থেকেই ছিলো না এমন নয়। ইদানীংও আসে মাঝে মাঝে। তবে বাঘের জন্যে এ পার্ক বিখ্যাত নয়, এই পার্কের হিন্টারল্যাণ্ডটি বিশেষ সুবিধার নয়। পার্কটি একটি পকেটেরই মতো। সে কারণেই জানোয়ারদের নিরবচ্ছিন্ন চলাফেরা এখানে সীমিত। একটি কলোনিরই মতো বলতে পারো। শম্বর আছে অনেক। বার্কিং ডিয়ার। ময়ূর। শুয়োর। ভাল্লুক। চিতা। আমার কাছে এই পার্কের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নীলগাই। বিধুর বিকেলে হারহাতের দিকের পথে পশ্চিমাকাশের শান্ত স্নিগ্ধ নীল সন্ধ্যাতারাটির আর তরুণ হরজাই জঙ্গলের পটভূমিতে যখন ধূসর-নীল রঙা একা পুরুষ নীলগাই আকাশের দিকে মুখ করে ভাবনাতে বুঁদ হয়ে যায় তখন তার মধ্যে আমি যেন আমাকেই দেখতে পাই। পুরুষ মাত্রই বোকা। আর বোকা মাত্রই একা। তার চারধারে ভিড় থাকলেও সে একা।

গতকাল সকালে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। বেশ শীতে। হাজারীবাগ শহরও শীতের জন্যে বিখ্যাত। এখনও রেল লাইন হয়নি বলে জায়গাটি অন্য শহরের মতো কলুষিত হয়নি। কিন্তু রাজডেরোয়াতে শীত আরও অনেক বেশি। শিশিরে ভেজা ছিলো জঙ্গল। একটি অগ্নিশিখা গাছ। গাছটিকে দেখেই বুকের মধ্যেটা যেন কেমন করে উঠলো! নিভে গেলো ক্রমশ উষ্ণ হয়ে ওঠা ভোরের সব আনন্দ। আর দু মাস পরেই ফুল ধরবে। রবীন্দ্রনাথ এই গাছেরই নাম দিয়েছিলেন অগ্নিশিখা। জানো নিশ্চয়ই। আফ্রিকান টিউলিপ।

আফ্রিকার তানজানীয়াতে যখন একটি সেমিনারে যোগ দিতে গেছিলাম তখন আরুশা শহরের পথে ঘাটে দেখে এলাম এই টিউলিপের সার। ভারী সুন্দর গাছ। ভারী সুন্দর ফুল। জানো ঋতি, এবারে জামসেদপুরে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো তার নাম তোড়া। খুব

ভালো লেগে গেছে তাকে। এখনও যে নিজের মধ্যে ভালোলাগার ক্ষমতা, ভালোবাসার ক্ষমতা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি তা জেনে বড় খুশি হয়েছিলাম। নিধুবাবুর সেই একটি গান আছে না, "আঁখিতে যে যত হেরে সকলি কি মনে ধরে ? পোড়া মন যারে মনে করে ওগো সেই হয় তারি মনোরঞ্জন।" চোখ তো সারাদিনে, সারাজীবনে কত নারীকে বা পুরুষকেই দেখে। মনে ধরে তাদের মধ্যে কজনকে ? বহু বছর পরে হঠাৎ একজনকে দেখে মনে ধরল। কিন্তু সম্ভবত সে বিবাহিতা। আমার কপাল। আমার কীই বা আছে বলো যে আমাকে তার ভালো লাগবে ? ভালোবাসা মানেই যে কষ্ট তা আমি বনীকে তিন মাস কাছ থেকে দেখে শিখেছি। তোমাকে বোধহয় ওর নামটি আগে 'নীতি' বলেছিলাম। ওর বাবামায়ের দেওয়া নাম নীতিই। আমিই নাম দিয়েছিলাম বনী। বন থেকে বনী। ভালো নয় ?

আমার মুখ থেকে বনীর কথা না শুনতে পেয়ে তোমার মনের কৌতূহল প্রায় এক্সপ্লোশন-পয়েন্টে এসে পৌঁছেছে। বুঝি। কিন্তু তবু বলব যে তুমি একজন অসাধারণ মেয়ে। অন্য কোনো মেয়ে হলে তার কৌতূহল অনেকই তীব্র হতো। তোমার শিক্ষা তোমাকে বৈদূর্যমণির জ্যোতিরই মতো এক স্থির নিবাত নিষ্কম্প স্থৈর্য দিয়েছে যা তোমার অন্যতম স্বাতন্ত্র্য।

পরশু এখান থেকে ফিরে যাব। হাজারীবাগ শহর হয়ে, টুটিলাওয়া সীমারীয়া হয়ে চাতরার রাস্তাকে ডানদিকে ছেড়ে বাঘড়া মোড় হয়ে বাঁদিকে ঘুরব চাঁদোয়া-টৌড়ির পথে। চাঁদোয়া টৌড়ি থেকে ডানদিকে। লতেহার হয়ে ডালটনগঞ্জ শহরের আগে বাঁদিকে ঢুকে যাব। ঐ টুটিলাওয়া সীমারীয়া আমার স্মৃতিতে বড় স্পষ্ট আছে। তখন তো আর পথঘাট পিচের ছিলো না। এতো গাড়ি ঘোড়াও ছিলো না। বলব তোমাকে কখনও আমাদের ছেলেবেলার হা-হা হাসির ধমকে ভয় পাওয়ানো সব পুরুষালি বনমেলার আর বনলীলার কথা। কোনোদিন।

তোমার চিঠি না পেয়ে সত্যিই একটু অবাক এবং চিন্তিত আছি।

ভালো থেকো।

পুনশ্চ গতকাল রাতে ঘুম আসছিলো না কিছুতেই। শীতও ছিলো ভালো। এখন তো আগেকার মতো ঘরে ঘরে ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বলে না। হিটার থাকলেও লোড শেডিং-এর জন্যে কাজ করে না। তাই টুপিটা মাথায় দিয়ে উইন্ড চিটার গায়ে দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটছিলাম রাতের খাওয়ার পর। শীত যতই থাক না কেন কিছুক্ষণ হাঁটতেই গা গরম হয়ে যায়। পথের দুপাশে রাত-চরা পাখি ডাকছিলো। উজলা রাত। যদিও পূর্ণিমার দেরী আছে। চোখের জলের মতো ঘোলা আলো শিশির ভেজা গাছ গাছালিতে পড়ে উজ্জ্বলতা পাচ্ছে। কান্নার পরে যেমন পায় চোখের তারা। তখনও, কেন জানি না অগ্নিশিখার কথা মনে হলো। তার চোখ দুটি মুখের স্মিত হাসি ফুটে উঠলো যেন চোখের সামনে। অথচ কথা হয়নি তার সঙ্গে তেমন। দেখাও হয়েছে অতি সামান্য। কেন যে এমন হলো, কী যে হলো ! তখনও নিধুবাবুর গান মনে পড়েছিলো। "কী হলো আমারো সই বলো কী করি লাগিলো নয়ান যাহে কেমনে পাশরি। হেরিলে হরিষচিত্তে না হেরিলে মরি তৃষিত চাতকী যেন থাকে আশা করি ঘন সুখ হেরি সুখী, দুখী বিনে বারি। কী হলো আমারো সই বলো কী করি ॥" ঋতি, তুমি জার্মান কবি স্যাসোর এই কবিতাটি পড়েছো ?

Do what manhood bids thee do
From none but self expect

applause
He noblest lives and noblest dies
Who makes and keeps his self
made-laws.

All other life is living death
A World where none but phantom
dwells.
A breath, a wind, a sound, a voice,
A tinkling of the camel bell.

Manhood শুধু নয় Womanhood-এর বেলাতেও এ কবিতা পুরোপুরি প্রযোজ্য।

হায় অগ্নিশিখা! 'তবে প্রেমে কী সুখ হতো। আমি যারে ভালোবাসি, সে যদি ভালোবাসিত, কী সুখ হতো।'

ও ঋতি! আমি কি সত্যিই প্রেমে পড়ে গেলাম?

ভালো থেকো।

ইতি—রাজা+ঋষি+রায়

* * *

শুক্রবার,
রাজডেরোয়া;
হাজারীবাগ ন্যাশনাল পার্ক,
হাজারীবাগ

ঋতি,
কল্যাণীয়াসু,

না গো! আমি সত্যিই প্রেমে পড়েছি। বড়ই বিপদ আমার। যা খেলা বলে ভেবেছিলাম তা যে, খেলা নয় এখন তা বুঝছি। এমন কখনওই হয়নি আমার আগে। একটি মুহূর্তও তার মুখ সরে না, নড়ে না আমার দু চোখের সামনে থেকে। কল্পনাতে সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার দু কাঁধে এমন করে হাত রাখে যে মনে হয় তার খুউব ইচ্ছে তাকে আমি একটি চুমু খাই।

একদিন চলে যাবার সময় বললো, আপনি কিছু জানেন না। সাহেবরা মেমসাহেবদের হাতের পাতায় চুমু খায় বিদায়ের সময়ে তাও জানেন না? আমি তার হাত তুলে নিয়ে হাতের পিঠে চুমু খেলাম। বললাম, এই তো মেমসাহেব। কিন্তু কী বলব ঋতি। সমস্ত গায়ে আমার শিহরণ খেলে গেলো। তার গায়ে কি কিছু হলো? হয়তো কিছুই হয়নি। জানবো কি করে? তোমরা মেয়েরা বড় চাপা। তোমরা বড় বিচ্ছিরী। পুরুষদের মিছিমিছি ভীষণ কষ্ট দাও তোমরা। জিনস পরো আর কম্পুটার সায়ান্সই পড়ো মেয়েরা চিরদিনেরই মেয়ে। তোমরা তাই থাকবে। এবং আমাদের এমনি করেই জ্বালিয়ে মারবে।

অগ্নিশিখার একটি ফোটোও যদি থাকতো আমার কাছে। শুধুমাত্র কল্পনায় সেই তোড়াকে কতদিন বাঁচিয়ে রাখবো বলো? কল্পনায় গড়া মূর্তি রোজ সকালে একটু করে

বদলে যায় যে। কী যে করি। তার ঠিকানা পর্যন্ত জানি না। মনের মধ্যে নিত্য নতুন ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে তোড়া বাঁধাই কাজ হলো এখন। কল্পনার বাগানের এই নতুন মালাকার—আমি। ছিঃ!

—রাজর্ষি

ঋতি রায়,
বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা

সীমারিয়া ডাকবাংলো
জেলা হাজারীবাগ, বিহার

নীরব ঋতি,

কতদিন যে তোমার চিঠি পাই না! যদি জামশেদপুরের ঠিকানাতে লিখে থাকো তা হলে ওরা হয়তো রি-ডায়রেক্ট করে দেবে কিন্তু দিলেও তা বেতলা পৌঁছতে পৌঁছতে অনেকই দেরি হয়ে যাবে।

আশা করি আমার লেখা সবকটি চিঠিই তুমি পেয়েছো।

যদি কখনও গাড়িতে এদিকে আসো তো সীমারিয়াতে অবশ্যই এসো। তবে আমাদের বড় কষ্ট লাগে এসব জায়গা এখন দেখলে। কী গভীর জঙ্গল ছিল চারদিকে। বনাদাগ থেকে একেবারে বাঘড়া মোড় পর্যন্ত। আমরা যখন ছেলেবেলায় এই অঞ্চলে দৌরাত্ম্য করে বেরিয়েছি, তখন তো জানতাম না যে জীবিকাতেও আরণ্যক হবো! হাজারীবাগ শহর থেকে একটি পথ চলে গেছে বগোদর। বগোদরে গিয়ে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডে মিলেছে। ডানদিকে গেলে ইসরি, ধানবাদ। বাঁদিকে গেলে বর্‌হি। যে বর্‌হি ধরে রাজডেরোয়া ন্যাশনাল পার্কের পাশ দিয়ে আবারো হাজারীবাগে এসে পড়া যায়। আগে এই রাস্তাকে হাজারীবাগের মানুষেরা বলতো "গয়া রোড"। এখন নাম হয়েছে বর্‌হি রোড। সঙ্গতভাবেই।

হাজারীবাগ থেকে আর একটি রাস্তা বেরিয়ে গেছে রাঁচির দিকে। রামগড় হয়ে। পথটি রাঁচিতে এসে মিলেছে একেবারে ফিরায়েলালের চওকে। বগোদর থেকে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডকে কেটে হাজারীবাগ থেকে আসা পথটি চলে গেছে হাজারীবাগ রোড স্টেশনের দিকে। জায়গাটির নাম 'সারিয়া'। ট্রেনে যাঁরা হাজারীবাগ আসেন তাঁরা এই স্টেশনেই নামেন। গোমো আর কোডারমার মাঝে। হাজারীবাগ রোড স্টেশন ও বগোদর পেরিয়ে পথটি হাজারীবাগের দিকে যখন যাচ্ছে তখন পথে বিষুনগড় পড়ে। খুব বড় হাট লাগে এখানে। এখান থেকেই ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস লিমিটেডের ফ্যাক্টরি গোমিয়াতে চলে গেছে। সুন্দর জায়গা। পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে এক-একটি প্লান্ট বসিয়ে পুরো প্লান্টটি সাজানো। অতিরিক্ত সাবধানতার কারণে। একটি পাহাড়ের নাম "টড হান্টার"। তৎকালীন আই সি আই কোম্পানির (আই ই এল-এর হোল্ডিং কোম্পানি) একজন বড় সাহেবের নামে। গোমিয়া থেকে যাঁরা রাঁচি যান তাঁরা অবশ্য তেনুঘাটের বাঁধের ওপর দিয়েই চলে যান কম সময়ে।

হাজারীবাগ শহর থেকে বাজারের গা ঘেঁষে একটি রাস্তা চলে এসেছে সীমারিয়া।

টুটিলাওয়া হয়ে। টুটিলাওয়ার সঙ্গে অনেকে টাটিঝারিয়াকে গুলিয়ে ফেলেন। টাটিঝারিয়া পড়ে হাজারীবাগ শহর আর বগোদরের মধ্যে। সেখানে এখনও দারুণ কালাজামুন আর নিমকি আর চা পাওয়া যায়। ঐ পথে কখনও গেলে খেতে ভুলো না যেন!

টুটিলাওয়ার একটু পরেই আগে একটি পুরনো পথ ছিলো গভীর ও সুন্দর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। তার নাম ছিলো ওল্ড চাতরা রোড। সে সময়ে হাজারীবাগ থেকে চাতরা গেলে ঐ রাস্তা ধরেই যেতে হতো। বড়মামার সঙ্গে একবার হুডখোলা বেন্টলী গাড়ি করে ঐ পথে রাতেরবেলা চাতরা যাওয়ার সময় এমন সুন্দর একটি চিতাবাঘ দেখেছিলাম যে আজ অবধিও তেমনটি দেখলাম না। সীমারিয়া থেকেও অবশ্য পিচ রাস্তা চলে গেছে ডানদিকে। চাতরা অবধি। আর বাঘড়া মোড়ে এসে পৌঁছলে তার বাঁদিকে চান্দোয়া টোড়ি আর ডানদিকে চাতরা। চাতরা যাবার আরেকটি রাস্তা। চান্দোয়া টোড়ি থেকে এগারো মাইল (কিঃ মিঃ নয়) (আমার মাইলই মুখস্ত আছে) সোজা গেলে রাঁচি-নেতারহাটের পথে পড়ে কুরু। আর ডানদিকে সাতান্ন মাইল গেলে ডালটনগঞ্জ। যাক এতোক্ষণে তুমি হয়তো বিরক্ত হয়ে গেছ রাস্তাঘাটের ফিরিস্তি শুনে। কিন্তু আমি তো বাংলাতে 'নবেল' লিখি না যে একটি জায়গা নিয়ে অনেক ধাব্বি-টাব্বি করে নায়ক-নায়িকার প্রেম, সঙ্গম এমন কি বিবাহ পর্যন্ত ঘটিয়ে দেব কিন্তু জায়গাটার হদিসের "হ"-ও দেবো না যাতে নায়ক-নায়িকার বন্ধুরা অথবা তাদের বাবা-মায়েরাও নিদেনপক্ষে সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারেন! কোনো জায়গার বর্ণনাই পথ-ঘাটের বর্ণনা ছাড়া আমি দিতে পারি না। এটাকে আমার দোষও বলতে পারো। কিন্তু কল্পনার গরু গাছে চড়ানোর মতো ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী আমি নই। ক্ষমা কোরো। এখন রাত আটটা। এখানে শীত এখনও বেশ প্রবল। যদিও হাজারীবাগ বা রাজডেরোয়ার মতো নয়।

চৌকিদার তার ঘরে আটা মাখছে তুলসীদাসের রামায়ণ সুর করে আবৃত্তি করতে করতে। ছোলার ডাল আর আলুর চোকা বানাবে। মোড়ের দোকান থেকেই দিনমানে একটু গোঁড় লেবুর আচার ও সংগ্রহ করে এনেছে। অবশ্য সীমারিয়া এখন আর আমাদের চেনা পুরনো সেই গ্রাম নেই। প্রায় আধা শহরই হয়ে গেছে। হাতির বৃংহনের চেয়েও তীব্র অনাবশ্যক হর্ন-এ কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করে ধুলো উড়িয়ে বড় বড় বাস আসছে আর যাচ্ছে। জঙ্গলের হাল দেখলে কান্না পায়। বি ডি ও অফিস ব্যাঙ্ক এবং নানা অফিসও বসেছে। ব্যবসা নানারকম।

জানো ঋতি, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে ব্যাঘ্র প্রকল্পর অফিসারি না করে যদি "মনুষ্য প্রকল্প"-র সঙ্গে যুক্ত হতে পারতাম তা হলে হয়তো যা করছি তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু করার আনন্দ পেতাম। আমার দেশের মানুষজনকে শুধু বাঁচানোই নয়, তাদের মনুষ্যত্ব রক্ষা করার জন্যেও একটি প্রকাণ্ড প্রকল্প করার খুবই দরকার। মানুষই সব। কল-কারখানা রাস্তা ফ্লাইওভার অ্যাটমিক সেন্টারের কোনো দামই নেই যদি না টান-টান মেরুদণ্ডর মানুষ তার পেছনে থাকে।

এখন সীমারিয়ার বাইরের আওয়াজ প্রায় মরে এসেছে। তার প্রধান কারণ কুরু থেকে সীমারিয়া এবং বিশেষ করে বাঘড়া মোড়ে পর পর কয়েকটি ডাকাতি হয়েছে পথে সাম্প্রতিক অতীতে। বহু বছর ধরেই এই পথটুকুর বদনাম। এদিকে একাধিক ডাকাতের দল অপারেট করে। নিয়মিত। পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু হাইওয়েতেও করে। যেমন ইলামবাজারের কাছে। এদের মোডাস-অপারেন্ডি বড় অদ্ভুত। পুলিশ এদের বড় ভালোবাসে। মাঝে মাঝে যুদ্ধের ভাণও হয়। তারপর সব ঠিক-ঠাক। পুলিশের উপর মহল

থেকে সার্কুলার যায়। কিন্তু ভূত যে সর্ষের দানার মধ্যে ঢুকে বসে আছে! তাকে তাড়াতে বড় সাহস আর জোরের দরকার। সে ওঝা কোথায়? দেশ যেমন ঠিক-ঠাক চলছে তেমনই ঠিক-ঠাক চলে। আমি খুশি, তুমি খুশি, আমলারা খুশি, মন্ত্রীরা খুশি। যে যার কাঁচের স্বর্গে বসে হেসে-খেলে দিন কাটাচ্ছি।

এতো সব বলার পেছনে আমার নিজের স্বার্থ যে একেবারেই নেই তা নয়। আমি ভাবি, আমি যখন রিটায়ার করব, তখন যা পেনসান এবং গ্রাচুইটি পাবো, তখনও যদি একাই থাকি তবুও আমার নিজস্ব একটি মাথা গোঁজার জায়গা এবং দু বেলা খাওয়ার সংস্থানও হবে না তা দিয়ে। এমন সর্বগ্রাসী মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে গত চল্লিশ বছরে!

তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেকই ছোট। আমার বয়সে এসে তুমিও ভাববে এসব কথা। অথচ কেউই এর প্রতিবাদ করে না। খবরের কাগজে জ্বালাময়ী ভাষায় একখানি চিঠি লিখে ফেলে এবং পাঠিয়ে দিয়ে নিজের বাংলা বা ইংরিজির চমৎকারিত্বে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গিয়ে দুটি পান চিবিয়ে পত্রলেখকরা ঘুমিয়ে পড়েন। জনসংখ্যা এমনভাবে চোখের সামনে বাড়ছে আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছি যে আমাদের সমস্ত সাধ্যর, আয়ত্তাধীন সমস্ত উপায়েরই বাইরে চলে যাচ্ছে ব্যাপারটা। কিছুতেই আমরা এতো মুখে খাবার তুলে দিতে পারবো না। দেশে যতো উৎপাদনই বাড়ুক। সব জেনে-শুনেও প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই এ ব্যাপারে চুপ করে আছেন। কী করবেন! ভোটে হাত পড়ে যাবে যে! পরের নির্বাচনে অথবা তার পরের তারও পরের নির্বাচনে ভোটার আরও বাড়বে। জনগণের দরদে রাতে ঘুম-না-হওয়া জননেতাদের হাত আরও শক্ত হবে।

তোমাদের কলকাতায়ই বা কি করছো তোমরা? 'হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টুডে ইন্ডিয়া থিংকস টুমরো'র দেশে? একটা রাজ্যর সমস্ত মানুষের কর্মক্ষমতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং শিষ্টতাও নষ্ট করে দেওয়া হলো চোখের সামনে। তোমরা কেউই প্রতিবাদ করো না। করলে না। কলকাতার স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, জন-যান ইত্যাদি সবকিছুর অবস্থা দেখে তোমাদের কি লজ্জা হয় না?

তোমরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা নিজের শাড়ি বা পাঞ্জাবিতে আগুন না ধরলে আগুন যে ঘরে আদৌ লেগেছে তা বিশ্বাসও করো না। যে সর্বনাশ ঘটানো হয়েছে কটি ভোটের প্রত্যাশার বিনিময়ে তার ক্ষতি পূরণ করতে লাগবে এখন বহু বছর। কখনও এ ক্ষতি পূরিত হবে কি না আদৌ জানি না। এ ক্ষতির পূরণ করা সত্যিই কঠিন।

তোমরা মায়ের জাত। তুমিও মা হবে একদিন। এমন সন্তানকে গর্ভে ধোরো না যার মাথা উঁচু করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস নেই। তাকে শুধু ট্রিপল-অ্যান্টিজেন বা পোলিওর ইনজেকশানই দিও না, তার মেরুদণ্ড যাতে অর্বুদকবলিত না হয় তার প্রতিষেধকেরও বন্দোবস্ত অবশ্যই কোরো। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই যারা মানুষ তেমন মানুষে এই দেশ ছেয়ে গেছে ঋতি। তোমাদের উপরে অনেকই দায়িত্ব দেশকে মানুষের মতো সন্তানের জন্ম দিয়ে একে শুদ্ধ করো, মুক্ত করো।

যখন দেশের দশের কথা ভাবি তখন আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে এতোই তুচ্ছ বলে মনে হয় যে কী বলব! কিন্তু আমি-তুমি তো প্রত্যক্ষ রাজনীতির মানুষ নই। তবুও তুমি-আমি তো একাও নই। তোমার এবং আমার সন্তানরাও আমাদের নিরাসক্তির শিকার হবে। তারা ছেঁড়া জামাকাপড় পরে, নাকে সিকনি নিয়ে পথের ধুলোয় হামাগুড়ি দেবে তাদের নিজেদের কোনো দোষে নয়, আমাদেরই সকলের নিষ্ক্রিয়তার বলি হয়ে।

বড়ই ক্লান্ত, বিধ্বস্ত লাগে ঋতি। এই সব প্রসঙ্গ, এই সব আলোচনা দেশকে ভালোবাসি

বলেই। এই ঘটনাসমূহ ও তুমুল নিষ্ক্রিয়তা আমাকে বড়ই আলোড়িত করে। রক্তচাপ বেড়ে যায়। কি করি ? কি করা উচিত তা ভেবে না পেয়ে খুবই অসহায় বোধ করি। কী জানি ? সকলেই কি ঘুমিয়ে আছে ? কেউই কি ভাবে না ? জেগে নেই কি কেউই ?

ইতি—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কিন্তু গর্বিত
রাজর্ষি

* * *

রাজর্ষি বসু
বেতলা, পালামৌ

বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা

অপরিচিতেষু,

প্রথমেই বলতে হবে আমাকে ক্ষমা করবেন কি না!

নানা কারণে আমার প্রথম চিঠির সম্বোধনেই ফিরে এলাম। এই-ই ভালো।

আমি জানি না, কী করে আমি এতোখানি লিবার্টি নিলাম আপনার কাছে। চিঠি লেখালেখি বোধহয় খুবই সাংঘাতিক জিনিস। কখন যে চিঠির মাধ্যমে আপনাকে এতো কাছের লোক বলে মনে করতে শুরু করেছিলাম, তা নিজেই বুঝতে পারিনি।

এখন ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পারছি যে ভালো করিনি। ধাক্কাটা আপনার দিক থেকে আসেনি, এসেছে আমারই ভিতর থেকে। সেটাই যা একমাত্র বাঁচোয়া।

আমার বন্ধুদের দেখাশোনা যে আপনি করতে পারেননি তার দোষ আপনার একটুও নয় তা আমি স্বীকার করছি। এও স্বীকার করছি যে প্রযতর মতো লম্বা চওড়া পুরুষের অমন সেজারিয়ান-বেবির মতো কোল্ড-প্রোন হবার পেছনেও আপনার কোনোই দোষ নেই। আপনি বেত্‌লাতে ফিরে আমার এই চিঠি যখন পাবেন তখন আমি তো কলকাতায়ই পৌঁছে গেছি। আপনার কাছে আমার অসভ্য অভদ্র চিঠির জন্যে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চাইতে গেছিলাম। অফিস থেকে দু-দু দিন ছুটি নিয়েছিলাম শনি-রবির সঙ্গে। রাঁচি পৌঁছে শ্রুতিদের কাছে গিয়ে শ্রুতি, তার এক বেয়ারা এবং আমি এই বিপজ্জনক যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। ড্রাইভার অথবা বেয়ারাও নেবো না ভেবেছিলাম। নিজেরা একা গাড়িতে থাকলে এবং গাড়ি চালালে যেমন মন খুলে কথা বলা যায় তেমন তো আর ড্রাইভার থাকলে বলা যায় না। কিন্তু কাকা ছাড়লেন না।

যাই হোক আপনার খিদমদগার এবং অফিসের লোকদের কাছে আপনার যা গল্প শুনলাম তাতে তো প্রেমেই পড়ে গেছি রীতিমতো। যতটুকু বাকি ছিলো তা বেডরুমের ড্রেসিং টেবলের উপরে আমার বুনে-দেওয়া সোয়েটার-পরা ফোটোটি দেখামাত্র পূরিত হলো। আমার চোখ-মুখ দেখে শ্রুতি বললো, তুই যে মরেছিস রে!

আমি বললাম, মরে আর 'লাভ কি ? রাজর্ষি যে অনেকবারই মরেছে। অনেকের জন্যেই। এরকম আনডিপেন্ডেবেল অসিলেটিং এবং ভ্যাসিলেটিং পুরুষের প্রতি কোনো মেয়েরই একটুও দুর্বলতা থাকার কথা নয় যদি তার মাথায় বুদ্ধি ছিটেফোটাও থেকে থাকে। শ্রুতি শুধোলো বহুবার মরেছে মানে ? আমি বললাম, প্রথমবার বনীর হাতে। দ্বিতীয়বার

তোর হাতে। (ভালো করিনি বলে ? ও তো একেবারে আপনার জন্যে হেড ওভার হীলস্ পড়েছে)

ও বললো, আর তৃতীয়বার ?

তৃতীয়বার জামশেদপুরের নীল্‌ডিতে। কে না কে অগ্নিশিখা বলে একটি বিবাহিতা মেয়ের প্রেমে পড়েছে।

শ্রুতি বললো, বিয়ে না হলে প্রেমের কেউ কিছু বোঝে না কি ? যেমন তুই ! কী পুরুষ ! কী মেয়ে ! বিয়ের আগে যাকে আমরা প্রেম বলে জানি তার অনেকখানিই তো মোহ। আজকাল অবশ্য অনেকে প্রি-মারিটাল ফিজিক্যাল অ্যা স্টমেন্ট-টেন্ট নিয়ে ভাবছে। দূর্। শরীরের মধ্যে আছে কি ছাই। পুরুষগুলোই জানে। আমার তো যাচ্ছেতাই লাগে। তোর কাকাকে নিয়ে পারি না। এমন করে না যে, কী বলব ! তবে দ্যাখ আমি যদি ধূর্ত মেয়ে হতাম তবে এই শরীরটা ভাঙিয়েই নিজের বরের কাছ থেকেই কি কিছু কম আদায় করে নিতাম ? কত্ব মেয়ে করে। আমাদের বাংলোর কাছেই মিসেস মজুমদার আছেন। একটু জংলী গোছের। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। উনি নাকি স্বামীকে আদর করতে দেওয়ার আগে বলেন, আগে বলো, আমাকে একটা কানপাশা গড়িয়ে দেবে ? কোনোদিন বলেন, আগে বলো, একটা শাড়ি দেখেছি ফিরায়েলালে, কিনে দেবে ?

আমি শ্রুতিকে বলেছিলাম স্তম্ভিত হয়ে, সে কী রে ! সেতো প্রস্টিট্যুশান !

শ্রুতি কি বললো জানেন ? বললো, কলেজে পি সি-র ক্লাসে পড়িসনি—এই কথাটাই তো উনি বলেছিলেন। "ম্যারেজ ইজ লিগ্যালাইজড প্রস্টিট্যুশান"।

সত্যিই বলেছিলেন। মনে পড়ে গেলো আমার। গা ঘিনঘিন করে উঠলো। বিয়ে-টিয়ের মধ্যে আমি নেই মশাই। আপনার সঙ্গে বিয়ে তো আউট অফ্ দ্য কোয়েশ্চেন। আমি অনাঘ্রাত পুরুষকে বিয়ে করব, যদি আদৌ কখনও করি।

যাক, যা বলছিলাম। এই যে আপনাকে চিঠি লিখছি, আমার লেখার টেবলের সামনেই আপনার ছবিটি আছে। মানে ফোটো। আমি যেন বেশ কথা বলছি আপনার সঙ্গে। আপনি যেন সওয়াল জবাব দিচ্ছেন। খুব সহজ হয়ে লিখতে পাচ্ছি। আপনিও নিশ্চয়ই সহজ হবেন। আমারও একটি ছবি তো আপনার ছবি যেখানে ছিলো ঠিক সেখানেই রেখে এসেছি। আমি দেখতে কী রকম ? বাড়িতে আয়না আমারও আছে। কী রকম তা আমি জানি কিন্তু আপনার চোখে কী রকম ? আমাকে দেখার পরও (ছবিতে) আমাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করছে ? না করলে লিখবেন না।

আপনার চোয়াল দুটি কিন্তু ভারী সুন্দর। যে কোনো আধুনিকা আপনাকে শুধু চোয়াল দেখেই চুমু খাবে। আজকালতো আর আলুভাতে জামাইমার্কা চেহারা কেউ পছন্দ করে না। আপনি অথবা ক্লিন্ট ইস্টউড-এর মতো নায়ক চায় তারা। তা বলে ভাববেন না আমিও চুমু খাবো। তেমন মেয়ে আমি নই। চোয়াল দেখে ওয়েলার-ঘোড়া বা ল্যাব্রাডর-কুকুরকে চুমু খাওয়া যায়। কোনো মানুষকে নয়। ফোটো দেখে একজন মানুষকে যত না বোঝা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি বোঝা যায় তার চিঠি থেকে, তার কথা থেকে। যা বোঝার তা বুঝেছি। মনের কথাটি রহিবে গোপনে।

শুনেছি শ্রুতির কাছে যে, আপনার গলার স্বরও নাকি হ্যারী বেলাফন্টের মতো। আমি বিশ্বাস করি না। শ্রুতি আপনার প্রেমে পড়েছে তাই। প্রেমে পড়া হতভাগিনীদের একটি কথাও ধর্তব্যর মধ্যে নয়। তাই নিজ কানে না শুনে নম্বর দিতে পারছি না।

আগেই বলেছি যে, আমার বিচ্ছিরী বিচ্ছিরী চিঠির পাপক্ষালন করার জন্যেই ওখানে

গেছিলাম। চিঠিতে আমি আপনার সঙ্গে এমনই ব্যবহার করেছি যেন আপনি ক্লাস ফাইভের মেয়ে আর আমি অবিবাহিতা, বিগতযৌবনা এবং খিটখিটে কোনো মেয়ে স্কুলের হস্টেল-সুপারিন্টেন্ডেন্ট ! তার জন্যে ক্ষমা নিশ্চয়ই চাইতে হতো। কিন্তু আরও একটা কারণ ছিলো আমার যাওয়ার। আমি যে বম্বে চলে যাবো ! যাবার আগে রাজা ও ঋষির সঙ্গে দেখা হবে না একবারটিও এ কথাটা ভাবতেই বড় খারাপ লাগছিলো।

তবে আপনার হাজারিবাগের চিঠি পাওয়ার পর আর খারাপ লাগছে না। সত্যিই বলছি। আপনার "অগ্নিশিখা" আপনাকে কমলা আভায় মুড়ে রাখবে। আর জামদেশপুর তো বেতলা থেকে মোটে ঘণ্টা ছয়েকের ড্রাইভ। বম্বে তো অনেকই দূর। আরব-সাগর পারে। সেখান থেকে কলকাতা ঘুরে একখানি চিঠি আসতেও লেগে যাবে বহুদিন। যাই হোক, নিজের অজানিতেই আমি যেন আমাকে আপনার লোকাল গার্জেন অ্যাপয়েন্ট করে বসেছিলাম। দেখুন তো কাণ্ড ! চিঠি কত অপকর্মই না করে !

শুনেছি, অনেকেরই কাছে যে একসময়ে বৎসরাধিক প্রবাসী ভৃত্যদের নাকি চিঠিতে পুত্রলাভের খবরও আসতো এবং সে খবর শুনে পুলকিত হয়ে তারা লাড্ডু বিতরণও করতো। কী সুন্দর সরল বিশ্বাসের দিন ছিলো বলুন তো সে সব ! "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর"। সাধে কি বলেছে ! আমরা এক অবিশ্বাসী যুগে বাস করছি বলেই আমরা কিছুই পাই না, পাওয়ার মতো।

যাই হোক। শ্রুতিকে বলবো যে আপনারই হিতার্থে অগ্নিশিখা সম্বন্ধে জামশেদপুরে একটু খোঁজখবর নেবে। তবে আপনি যে তার প্রেমে পড়েছেন এটা জেনেই আমার খুব ভালো লাগছে। যাকে ভালো লাগে, তার ভালো লাগাই তো আমার ভালো লাগা। এর চেয়ে বড় খুশির কারণ আর কী হতে পারে। এই জগতে প্রেম ব্যাপারটাই তো বাতিল হয়ে গেছে। 'প্রেমে'র মানে বোঝে এমন মানুষও বড় কম। সত্যিই বড় কম। যদি অগ্নিশিখার মধ্যে আপনি তেমন কোনো মেয়েকে দেখে থাকেন তা হলে সত্যিই দারুণ আনন্দর কথা, আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানবেন। সত্যিই আন্তরিক। অগ্নিশিখাকেও আমার অভিনন্দন জানাবেন। তাঁর ঠিকানা আমার চাই না। বরং আমি বম্বে চলে যাবার আগে "বনী"র ঠিকানাটা যদি দেন (যদি দিতে আপনার কোনো আপত্তি না থাকে) তা হলে খুব খুশি হব।

টেক্ কেয়ার
—ইওরস্ ঋতি

শ্রীমতী ঋতি রায়
বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা

বেতলা, পালামৌ

অভিমানী ঋতি,

তুমি একটি অবলা হরিণীর চেয়েও সহজে বধ্য। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে জেনে যে বাণ আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। আরও একটা কথা। খেতে ভালোবাসাটাও যে "চরিত্র দোষের" মধ্যে পড়ে সেটাও জানা ছিলো না। অনেকদিন তোমার কোনো চিঠি না পেয়ে আমার

কেমন সন্দেহ হচ্ছিলো যে, কোনো কারণে তুমি আমার উপরে চটে রয়েছো বা আমাকে ভুলে গেছো। অথবা তোমার মন সরে গেছে আমা থেকে।

'অগ্নিশিখা' নামক কোনো মেয়ের প্রেমেই আমি পড়িনি। কী করে অগ্নিশিখা নামটি মাথায় এলো তাও বলছি।

জামশেদপুরে আমি উঠেছিলাম গোলমুড়ি ক্লাবে। তাতো তুমি জানোই। ওখানেই এসে উঠেছিলেন কলকাতার এক বিখ্যাত কবি। অনেকে বললো 'বিখ্যাত' তাই আমি বিখ্যাত বলছি। যার নামই খবরের কাগজে বড় হরফে ছাপা হয় সেই তো বিখ্যাত! তার পেটে খোঁচা দিয়ে বিদ্যে যাচাই করার রেওয়াজ তো নেই! গুণ্ডার মতো সেই কবির চেহারা। নাম, মনা ঘোষ।

মনা দত্ত বলে একজন নামকরা ফুটবলার ছিলেন জানতাম আমার বাবাদের আমলে। মনা গুহ বলে নামকরা গোলকিপারও ছিলেন মোহনবাগানের একজন। কিন্তু মনা ঘোষ বলে কোনো কবির নাম আমি জন্মে শুনিনি। লোকটা কবি না হয়ে কোনো গুরু-ফুরুও হতে পারতো। কোনো "জী" বা "স্বামী" বা "ঠাকুর"। সারাক্ষণই শুধু মহিলাদের ভীড় তার কাছে। একজন যান তো অন্য জন আসেন। তবে স্বামীরাও সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন অণুক্ষণ। থাকাটাই উচিত ছিলো। যা চেহারা-ছিরি কবির! মনে হয় 'কবি'দের সম্বন্ধে আমার সব ইমেজ এই মনা ঘোষকে দেখে গলে গেলো। ইলেকশানের আগে গুণ্ডা হিসেবেও পার্টিদের হয়ে ভাড়াও খাটে। কারো টেংরী খুলে "লেয়" হয়তো অবলীলায় কারো লাশ ফেলে দেয়। এই বস্তুটির মধ্যে জামশেদপুরের সুন্দরী সব কৃতবিদ্য মহিলারা যে কী দেখলেন তা তাঁরাই জানেন!

একদিন আমি সন্ধ্যেবেলা হাঁটতে বেরিয়েছি, দুপুরে মায়া বৌদির বাড়িতে বড় গুরুপাক খাওয়া হয়েছিলো তাই হজম করতে। দেখি, সেই মনা ঘোষ চলেছেন একটি অপরূপা সুন্দরী, দারুণ ফিগারের মেয়ের সঙ্গে। পথে আলো-আঁধারি একটু চাঁদ। এই রোম্যান্টিক পরিবেশে কবির কবিত্ব যেন একটু চেগে উঠেছে বলে মনে হলো। আমি নিঃশব্দে ওঁদের কাছাকাছি চলে গেলাম এবং রইলাম ওঁদের ঠিক পেছনে। টেরই পেলেন না। পাওয়ার কথাও নয়। বাঘকে আমরা ট্র্যাক করি। আমাদের পায়ের শব্দ কলকাতার কবি পাবেন কি করে?

তুমি হয়তো বোরড্ হয়ে যাচ্ছো। কিন্তু আরেকটু শোনো।

নিজকর্ণে শুনলাম, মেয়েটির নাম তোড়া। কিন্তু সেই তোড়া নাম অপছন্দ হওয়াতে কবি মনা ঘোষ তার নাম দিলেন "অগ্নিশিখা"। অগ্নিশিখা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে। হুবহু উত্তমকুমারের সময়ের বাংলা ছবির শট-এর মতো ব্যাপার স্যাপার। ভাবলাম, এক্ষুনি গানও শুনতে পাবো।

কবি আড়াই পা সামনে হেঁটে, দেড় পা বাঁয়ে ঘুরে অগ্নিশিখা গাছের মগডালের দিকে ঘাড় স্ট্রেইন করে তাকিয়ে হঠাৎ গেয়ে দেবেন "মৌ বনে আজ মৌ জমেছে, বউ কথা কও ডাকে, মৌমাছিরা আর কি ঘরে থাকে।"

হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ।

ভাগ্যিস মনা ঘোষ গান জানেন না। খুব বেঁচে গেলাম।

ব্যাস! মাথায় খেলে গেলো দুষ্টুমি। কবির না-ফোঁটা অগ্নিশিখাকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলাম তোমার দিকে। চিঠিতে। অগ্নিকাণ্ড যদি ঘটতো, তা হলে বুঝতাম এতোদিনে আমার প্রতি তোমার দুর্বলতা জন্মেছে একটু। কিন্তু আগুন আমার ছাই করে দিলে তুমি। যেখানে

ক্ষত হবে ভেবেছিলাম, সেখানে আঁচড়ই লাগলো শুধু। উল্টে তোমার কোপে পড়লো বেচারী বৌদি আর সবিতাবৌদিরা, এবং অনেকে। মায়াবৌদিরা, কল্যাণী আমায় দেদার খাইয়েছেন বলে।

কেউ কারো ঘরে শুঁটকি মাছ খেলেও যে অন্যর এতো রাগ হতে পারে এ তথ্য জানা ছিলো না। এখন হলো তো তোমার অগ্নিশিখা রহস্যভেদ ? সবচেয়ে মজার কথা এই যে কবি মনা ঘোষের চেহারা দেখে যা ভেবেছিলাম আসলে তা আদৌ নয়। তুমিও আমার ফোটো দেখে আন্ডার-এস্টিমেট কোরো না। লোকটার মধ্যে যথেষ্ট রসকষ আছে।

পরদিন প্রায় সেই সময়েই তার সঙ্গে আবার ঐ জায়গাতেই দেখা। সেদিন পরনে সাহেবী পোশাক। কত ভেকই ধরতে জানেন। উল্টোদিক থেকে আসছিলেন। মুখোমুখি হতেই আমি বললাম, আজ অগ্নিশিখা নেই ? ভদ্রলোক চমকে গেলেন। কিন্তু হাইলি ইন্টেলিজেন্ট। পোটেনশিয়াল এনিমিকে তক্ষুনি বন্ধুতে পরিণত করে ফেললেন। বললেন, তুমি তো রসিক বট হে। নামটি কি ?

আমি বললাম, খগেন।

খগেনবাবু।

আমি বললাম আমার নাম রাজর্ষি।

একী ! মিনিটে মিনিটে নাম বদলাও কীরকম লোক তুমি ?

বললাম, আপনি অন্যর নাম বদলে দিতে পারেন আর আমি নিজেরটা বদলালেই দোষ ! মনা ঘোষ বললেন, ভায়া হে ! কবিদের অনেকেই দুঃখ। গম্ভীর মুখে থাকলে লোকে বলে, লোকটা গোমড়ামুখো। হাসলে বলে, ছ্যাব্‌লা। বলেই বললেন, তুমি রবীন্দ্রনাথ পড়েছো ? লোকটার এই তুমি-তুমি আমার পছন্দ হচ্ছিলো না।

কবি বললেন, আমি তুই আর তুমি দিয়েই জগৎ পারাপার করি। আপনি শব্দ আমার অভিধানে নেই। রবীন্দ্রনাথ পড়েছো কি না বলো ? রবীন্দ্রনাথও পড়েনি এমন শিক্ষিত লোক কি আছে ?

আমার স্যুটের দিকে চেয়ে তিনি বললেন কোট-প্যান্টুলুন পড়লেই তো আর শিক্ষিত হয় না হে। তেমন শিক্ষিতই বেশি।

বলেই বললেন, রবীন্দ্রনাথের "কবি" কবিতা পড়েছো ? একটু শোনাই তবে। মনে পড়ে গেলেও যেতে পারে। বলেই আবৃত্তি করলেন, হাসি হাসি মুখে, জলদ গম্ভীর গলায়। "কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো। আঁধার করে রাখেনি মুখ, দিবারাত্র ভাঙছে না বুক, গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব হাস্যমুখেই বয় গো ॥

খাবলা খাবলা মনে আছে। পুরো মনে নেই।

কবি বললেন, শোনো।

"শত্রুরা কয় লোকটা হালকা—কিছু কি তার
নেইকো ভিত্তি। কাব্য দেখে যেমন ভাবো কবি
তেমন নয় গো। চাঁদের পানে চক্ষু তুলে রয় না
পড়ে নদীর কূলে, গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব মনের
সুখেই বয় গো ॥ "সুখে আছি" লিখতে গেলে
লোকে বলে—প্রাণটা ক্ষুদ্র ! আশাটা এর
নয়কো বিরাট, পিপাসা-এর নয়কো রুদ্র।
পাঠকদলে তুচ্ছ করে অনেক কথা বলে

কঠোর। বলে একটু হেসে খেলেই ভরে যায়
এর মনের জঠর।”

আমি হাসলাম।

উনি বললেন, আর একটু শোনো,

“কাব্য যেমন কবি যেন তেমন নাহি হয় গো।
বুদ্ধি যেন একটু থাকে, স্নানাহারের নিয়ম
রাখে—সহজ লোকের মতোই যেন সরল গদ্য
কয় গো ॥

বলেই নিজে হাঃ। হাঃ। হাঃ। করে হাসতে লাগলেন।

আমিও যোগ দিলাম অনাবিল হাসি নিয়ে সেই হাসিতে।

কবি বললেন, আমার কোনো লেখা তুমি পড়েছো ?

লজ্জিত হয়ে মাথা নাড়লাম।

কবি বললেন, ফারস্ট ক্লাস ! বুদ্ধিমান বাঙালি এখনও কিছু আছে তবে ! লজ্জা পাবার কী আছে এতে !

আমি বললাম, অগ্নিশিখা ?

আছে।

কোথায় ?

উপরে চেয়ে বললেন, ঐ তো। গাছে।

ফুটবে না ?

ফুটবে বইকী ! আমি চলে গেলেই ফুটবে। নিজের ফুলদানীতে যারা পৃথিবীর সব ফুলকে আঁটাতে চায় তারা মুদি ; কবি নয়। কবির কাজ ফুল ফুটিয়ে যাওয়া তার চলার পথে পথে। সে ফুল কাকে গন্ধ দিলো, কার খোঁপায় বা ফুলদানীতে উঠলো তা দেখা তার কাজ নয়।

আমি বললাম, আমি তো আপনার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি মশাই।

কবি বললেন, থাকা হচ্ছে তো ক্লাবেই। যদি আমার প্রেমে পড়েই থাকো তবে আমার কাছে মেয়েদের ভীড় আড়চোখে চোখ সরু করে দূর থেকে চোরের মতো দেখো না। কারো সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে থাকলে, নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার ঘরের সামনে এসে বোসো। ফুলের বাগানে আমার ঘর। তা বলে আমি মালাকার নই। ফুলের মধ্যে রঙ, কেশরের মধ্যে গন্ধ এই সব জোগানোই হলো কবির কাজ। তারপরই তার ছুটি। বুয়েচো ?

বুয়েচি।

বহুদিন পরে একজন গ্রেট লোকের সঙ্গে আলাপ হলো। যাই বলো। তুমি কি পড়েছো মনা ঘোষের কবিতা ? পড়ে থাকলে, তার দু-একটি বই আমাকে পাঠিও। মানুষটিই যদি এতো ইন্টারেস্টিং হন তা হলে তাঁর লেখাও নিশ্চয়ই ইন্টারেস্টিং হবে। আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে সত্যিই আমার তেমন যোগাযোগ নেই। সামান্য কজন অত্যন্ত বিখ্যাত কবির নাম জানি। তাও তাঁদের কবিতা কিছুই পড়িনি। ভালো থেকো। মাথা থেকে অগ্নিশিখাকে বিদেয় করো।

‘এসেছিলে তবু আসো নাই জানায়ে গেলে,
সমুখের পথ দিয়ে পলাতকা ছায়া ফেলে।’

যখনই ভাবছি যে এলে তবু দেখা হলো না এতো খারাপ লাগছে যে কী বলব !

ইতি—রাজর্ষি

পুনশ্চঃ তোমার ফোটোর তুমি এক্ষুনি হেসে উঠলে আমার দিকে চেয়ে।

৮

ঋতি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা
রাজর্ষি পাগল,

আসল কথাটারই কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। কখনও যে যাবে তারও স্থিরতা নেই। বম্বে যাওয়ার আগে দেখা কি হবে না?

আপনি নেই অথচ আপনার বাথরুমে চান করে এলাম। আমার সাবানের গন্ধ কি আপনি ফিরে আসা অবধিও ছিলো? আপনার খিদ্‌মদ্‌গার লালুয়া তো প্রথমে ঢুকতেই দেবে না। ও বেচারী কী করে জানবে আমাদের পত্র-মিতালির কথা! তবে শ্রুতি সঙ্গে থাকায় এবং ঠেট্ হিন্দী বলতে পারায় লালুয়া নরম হয়ে আমাদের ঠাঁই দিলো।

তবে আমার জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো। কখনও কোনো একা পুরুষের বাড়িতে এর আগে রাত কাটাইনি। শ্রুতি তো বিবাহিতা। পুরুষজাত সম্বন্ধে ওর মোটামুটি একটা ধারণা আছে। কিন্তু যেহেতু আমার কোনো দাদা নেই এবং বাবাকেও খুব বেশি কাছে পাইনি বড় হবার পরে, পুরুষজাত সম্বন্ধে আমার জ্ঞান চিড়িয়াখানার জীবজন্তুদের জ্ঞানেরই সমগোত্রীয়। বেশ লাগলো কিন্তু। শিকার-কাহিনীতে যেমন পড়েছি, বাঘের অনুপস্থিতিতে শিকারী বাঘের গুহাতে গিয়ে যেমন রোমাঞ্চিত বোধ করেন আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার বাড়িতে থাকাটাও আমার কাছে প্রায় সমান রোমাঞ্চকারী। আমার সম্পূর্ণই অচেনা অভিজ্ঞতা-পর্ব বেশ একটা বাঘ-বাঘ, পুরুষ-পুরুষ গন্ধ বাড়িময়। শেভিং-কিট্, ব্রুট-এর পারফ্যুম (কার দেওয়া?) পায়জামা-পাঞ্জাবি, বনবিভাগের অফিসারের পোশাক-পরিচ্ছদ, জঙ্গলের ম্যাপ এবং বাঁদুরে টুপি আপনার অনুপস্থিত উপস্থিতির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো।

একদিন বাঁদুরে টুপি সম্বন্ধে কুৎসা করেছিলাম। কিন্তু এখন ভেবে দেখছি সেটাও পুরুষালিরই অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। কোনো মেয়েকে কখনও বাঁদুরে টুপি পরতে দেখিনি। এদেশে অন্তত নয়। বেশ কাটিয়ে এলাম ক'টা দিন। আবারও জঙ্গলে গেলাম। আপনি ছাড়াই। এবারে বাঘও দেখলাম। গাইড বললো, বাচ্চা। এ যদি বাচ্চার নমুনা হয় তবে বুড়ো দেখার সাধ আর আমার নেই। এমন করে চাইলো চোখের দিকে যেন নির্ভুল দেখতে পেলো কবে কোন্ পরীক্ষায় আমি কম মার্কস পেয়েছিলাম! কিছু নোংরা পুরুষ আছে না? যাদের চোখের চাউনি মেয়েদের নিরাবরণ করে দেখে; বাঘেদের চাউনিও প্রায় সেরকমই। ভারী অসভ্য বলে বোধ হলো জানোয়ারটিকে। কোনো কোনো জানোয়ার-পুরুষেরই মতো। পরে যখন জানলাম যে সে বাঘ নয়, বাঘিনী তখন ভারী অস্বস্তিতে পড়েছিলাম। এখন বলতে হয়, মেয়েদের মধ্যেও জানোয়ার হয়। হয়তো কেউ কেউ।

আপনার জন্যে পাঞ্জাবির কয়েকটি কাপড় এবং একটি হাফ-স্লীভস্ সোয়েটার নিয়ে গেছিলাম। আশা করি পেয়েছেন। সোয়েটারটি তিনদিনে বুনেছি। আপনার রঙ ফর্সা তাই শর্ষে-রঙা উলে বুনেছি। পছন্দ হলো কী না জানাবেন! মার্চ মাস অবধি তো হাফ-হাতা সোয়েটার কাজে লাগবেই জঙ্গলে। এপ্রিলের প্রথমেও লাগবে হয়তো সন্ধ্যের পরে।

আপনাকে ছাড়া আমি কাউকেই "দুটি সোয়েটার" দিইনি একই শীতে নিজে হাতে বুনে। আমার কাছে আপনার কতখানি ইম্পর্ট্যান্স নিশ্চয়ই তা বুঝবেন।

বেতলাতে ফিরেই চিঠি দেবেন।

ইতি—ঋতি

* * *

রাজর্ষি বসু
বেতলা, পালামৌ

কল্যাণীয়াসু,

কী আপশোষ এর কথা বলো তো। এলে তবু দেখা হলো না। নিজেকে আর হাজারীবাগ-সীমারীয়াকে শাপ-শাপান্ত করে মরছি।

ক্ষমা চাইবার জন্যে তোমার আসার দরকার ছিলো না আদৌ। বরং আমাকেই ক্ষমা কোরো"হুজৌরএ হাজির" না থাকার জন্যে। তোমার সোয়েটার এবং পাঞ্জাবির কাপড়ের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। সত্যিই আমি অভিভূত। আমার প্রতি তোমার আন্তরিকতার প্রতিদান কী করে দেবো জানি না। অবশ্য তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা চিঠির হলেও যেরকম খোলামেলা হয়ে উঠেছে তাতে ধন্যবাদ জানানোর বা প্রতিদান দেবার মতো পোশাকি আর নেই। তবু অভ্যাসবশেই জানালাম। আমি না-থাকাতে এসেছিলে। এবার একবার আগে জানিয়ে থাকতে থাকতে এসো। সত্যিই খারাপ লাগছে আমার খুবই।

তুমি লিখেছো, আমাকে ছাড়া তুমি আর কাউকেই এক শীতে দুটি সোয়েটার বুনে দাওনি। কথাটা সত্যি এবং আন্তরিক। আমি জানি, তবুও আমি লোক বিশেষ সুবিধের নই বলে শিব্রাম চক্রবর্তীর একটি গল্পর কথা মনে পড়ে গেলো। গল্পটির নামও মনে নেই। গল্পটিও ভুলেই গেছিলাম যদি না আমার বন্ধু সুধীর মনে করিয়ে দিতো। সে এসেছিলো গত ডিসেম্বরে এখানে। তোমার সোয়েটার পাঠানোর কথা বলতেই সে এই গল্প বলেছিলো। তাকে এবং আমাকে নিজগুণে মার্জনা করো।

একটি মেয়ে তার ছেলে বন্ধুকে খুব ভালবেসে সোয়েটার বুনে দিয়েছিলো। এবং সোয়েটারের ভেতরের দিকে অন্যরঙা উলে লিখে দিয়েছিলো "তোমাকে মালতী"। সেই সোয়েটার ব্যবহারে ব্যবহারে নোংরা হয়ে যাওয়ায় পাড়ার ডাইং-ক্লিনিং এর দোকানে ছেলেটি একবার ধুতে দিলো। কিন্তু ডেলিভারীর দিনে দেখা গেলো তার সোয়েটারের বদলে অন্য একটি সোয়েটার দিচ্ছেন ক্লিনার। বন্ধু রেগে বললেন, ব্যাপারটা কী! এ সোয়েটার তো আমার নয়। আমার সোয়েটারের ভিতরের দিকে লেখা ছিলো "তোমাকে মালতী"। আমার সোয়েটার খুঁজে বের করুন।

ক্লিনার ক্ষমা চেয়ে বললেন, সাতদিন পরে আসুন আমি "তোমাকে মালতী" সোয়েটারটা খুঁজে রাখব। সাতদিন পরে মালতীর বন্ধু পাড়ার সেই দোকানে গিয়ে যখন জিগগেস করলেন সোয়েটারটি পাওয়া গেছে কি না? তখন দোকানি কাঁচুমাচু মুখে বললেন, পাওয়া গেছে। আবার যায়ওনি।

ব্যাপারটা কি?

মালতীর উত্তেজিত বন্ধু রাগতস্বরে শুধোলেন।

দোকানী লজ্জিত মুখে বললেন, এ পাড়ার কাস্টোমারদের মধ্যেই সবশুদ্ধ সাতটি সোয়েটার খুঁজে পাওয়া গেছে যার পেছনে লেখা, 'তোমাকে মালতী'। সাতটিই দেখাচ্ছি আপনাকে। কোনটি আপনার মালতীর তা আপনি খুঁজে নিন।

আমি জানি যে, এই চিঠিতে এর পরে আর যাই-ই লিখি না কেন, তুমি তা রাগে পড়বেই না। তাই এখানেই শেষ করলাম আজ।

শিব্রাম চক্রবর্তীর গল্পটি হয়তো সঠিকভাবে উদ্ধৃত করা গেল না তবে যেটুকু পারা গেল তাই তোমাকে ক্রুদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট।

ভালো থেকো। আশীর্বাদক—ইতি

রাজর্ষি বসু

* * *

ঋতি রায়
বালিগঞ্জ প্লেস

রাজা,

খুব মজা লাগলো আপনার চিঠি পেয়ে। ঐ চিঠিতে রাগ করবো এমন বেরসিক আমাকে ভাবলেন কি করে?

আপনি মানুষটি সত্যিই বেশ রসিক। তবে মাঝে মাঝে এমন চিঠি লেখেন যে মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয়, কত দূর থেকে ; বুঝি অন্য কোনো গ্রহ থেকেই লিখছেন। ফোটোও তো দিয়ে এলাম। এখনও কি যাকে লেখেন তার সঙ্গে একাত্মবোধ করেন না? ভাবলেও দুঃখ হয়।

আপনাকে দেওয়ার মতো অনেক খবরই আছে।

এক নম্বর আমার বম্বে যাওয়া আপাতত ছ' মাস পেছিয়ে গেলো। আমার কোম্পানির এক বড় সাহেব কলকাতাতে এসে আমাকে মীট করেছিলেন। শীয়ার বাই-চান্স। নইলে ঐ লেভেলের মানুষের সঙ্গে আমার মতো সামান্য অ্যাসিস্ট্যান্টের দেখা হতে বছর কুড়ি লাগার কথা ছিলো নর্ম্যালি কোর্সে। কেন জানি না, উনি খুবই ইম্প্রেসড্ হয়েছেন আমার সঙ্গে কথা বলে।

শুনেছি, মানুষটি বাইরে পাকা সাহেব কিন্তু ভেতরে একশোআনা বাঙালি। আমাকে বলেছিলেন হোয়াট উ্যড উ লাইক টু হ্যাভ আজ আ বোনাস? আই মীন, অ্যাজ আ স্পেশাল গিফ্ট ফ্রম মী?

আমি বলেছিলাম, বম্বে যাওয়াটা কি মাস ছয়েক পেছোনো যেতে পারে? আই হ্যাভ টু্য টেক কেয়ার অফ লট অফ থিংগস্ হিয়ার ; আই মীন, ইন দ্যা ওয়ে অফ ওয়াইন্ডিং আপ্..." উনি বললেন, ডান্। ফর সিক্স মান্থস। কিন্তু এর পরে যেখানে যখন পোস্টিং হবে, যতদিন থাকতে হবে 'না' করলে চলবে না। তারপর গলা নামিয়ে বলেছিলেন বাঙালিরা এই করেই কুনো বদনাম কিনেছে। কথাটা মিথ্যেও নয়। যাক্গে। যে-করেই হোক আরো ছ' মাস

এখন কলকাতার পাখি কলকাতায় থাকতে পারে। কিন্তু কেন যে এই অনুরোধ করতে গেলাম তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। তার চেয়ে বললে পারতাম, বম্বেতে আমার ফ্ল্যাটটা যেন গেলেই পাই। অ্যাকোমোডেশান পাওয়া, বম্বেতে কলকাতার চেয়েও অনেকই বড় সমস্যা। ফ্ল্যাট অবশ্য একটা ছোটখাটো পাবোই। কোম্পানীরই লিজ নেওয়া আছে। কিন্তু তবু এই ছ'টি মাস আরও থাকতে চাওয়ার পেছনের প্রয়োজনীয়তা এবং যুক্তি সম্বন্ধে নিজেই এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারছি না। যে জায়গা, যে অনুষঙ্গ, ছেড়ে যেতে হবেই তা ছেড়ে যাওয়াটা বিলম্বিত করলে দুঃখ শুধু বাড়েই, আগেকার দিনের মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া প্রলম্বিত করারই মতো।

একটা কথা ভেবে ভালো লাগছে যে, যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে দেখা একবারটি হবে অন্তত।

ভালো থাকবেন। বেতলাতে আছেন কি না জেনেই এ চিঠি লিখছি।

—ঋতি

* * *

বেতলা, পালামৌ

ঋতিরানী,

ঋতুরাজ বসন্ত কিছুদিনের মধ্যে এসে যাবে বনে। কোথাওই যাইনি তাই। কোনো অচেনা প্রব্রাজিকার পথ চেয়ে বসে থেকে, না-গেয়েই গাইছি আমি

“আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি/
তুমি অবসরমতো বাসিও/আমি
নিশিদিন হেথায় বসে আছি তোমার যখন মনে পড়ে আসিও।”

তোমার বন্ধু অশেষ, বসন্ত ভালোবাসে না ? পক্স এর কথা বলছি না, মানে বসন্তর কথা বলছি, পরজ বসন্ত, হলুদ বসন্ত, বসন্ত, বসন্ত-বাহারের কথা। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া “আমি এ গন্ধবিধুর সমীরণে” অথবা নীলিমা সেনের “তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে গোপনে গো—/ফুলের গন্ধে বাঁশির গানে, মর্মরমুখরিত পবনে ”॥ শুনলেই বুকের মধ্যে কেমন যেন করে ওঠে। প্রকৃতিতে তখন হিমেল আমেজ কাটতে থাকে। দুপুরের দিকে সমস্ত বনের বুকের মধ্যে মচ্‌মচানি উঠতে থাকে প্রথম ঝরা-পাতাদের ব্যালেরিনা-নাচে। ফুলদাওয়াই আর জীরহুল আর পিলাবাবাদের দিন শুরু হয়। এক যুবতী সর্পিনি যেন শীতভর ঘুম শেষে তার সব খিদে তৃষ্ণা নিয়ে নতুন চিত্রল শরীরে এঁকে বেঁকে বেরিয়ে আসে অন্ধকার বিবর থেকে প্রতীকী বসন্তেরই মতো। বসন্তই বসন্তর প্রতীক।

বনে-পাহাড়ে এই সময়ে দুপুরবেলা একরকম ঝাঁঝ ওঠে, সদ্যযুবতীর উদ্ধত যৌবনের গর্বর ঝাঁঝের মতো। ঠোঁট ফাটতে থাকে। গাল চড়্‌চড় করে। চোখ জ্বালা করে। এসব শুধু দুপুরেই। সকাল আর রাত কিন্তু তখনও শীতের দিকে পিছন ফিরেই চেয়ে থাকে। সকালের কোকিলের মুহুর্মুহু কুহু-কুহুর সঙ্গে তখনও মিশে থাকে শীতকালের উহু-উহু ভাব। রাতপাখির ডানায় শিশিরের গন্ধ থাকে। থাকে রাতের নদীতে হিম।

বসন্ত ক্ষণস্থায়ী বলেই বোধহয় এত সুন্দর ! “ফ্যামিলিয়ারিটি ব্রীডস কনটেম্পট”, এই

কথার সত্যতা প্রমাণ করতেই যেন সে এসেই পালিয়ে যায়। তাকে মুঠিতে ধরা যায় না। সে বাস্তবে বাঁধা পড়ে না   কল্পনায় আঁটে।

বসন্ত দেখতে হলে, তাতে বুঁদ হতে হলে   জঙ্গলে এসো বসন্তে। প্রকৃতির মধ্যে না থাকলে, তাতে সম্পৃক্ত না হলে নারীপ্রকৃতি সম্পূর্ণতাই পায় না। নারীও তো প্রকৃতি। ধরিত্রী। সৃষ্টি পালন-কারী।

তুমি হয়তো ভাবছো, হঠাৎ এতো নারী-প্রশস্তি কেন ? উত্তরে সবিনয়ে বলব যে, প্রতি বসন্তেই নারীস্তুতি করার জন্যে আমার মন উচাটন হয়। কিন্তু সেই স্তুতি নিবেদন করার পাত্রী জোটে না। বহুদিন পর হাতের কাছে নিরাপদ তোমাকে পেয়ে (মানে, তোমার ফোটোকে) নিজেকে উজোর করে দিলাম।

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই বোধহয় কখনও কখনও এরকমটি ঘটে থাকে। আত্মনিবেদনের সময়ে বাদ সাধতে নেই। পাপ হয় তাতে। আমি তো নিবেদন করেই খালাস। কতখানি নৈবেদ্য দেবীর পায়ে পৌঁছলো আর কতখানি মাঝ পথের টেকো লোকেদের টাকে গিয়ে টক্‌রালো তাতে নিবেদনকারীর কীই বা আসে যায় ! সব আনন্দ তো দেবারই মধ্যে। সে ফুলই হোক   কী মন।

আনন্দ থাকে শুধু দেবার মধ্যেই নয়, নেবার মধ্যেও। আমার জীবনে আমি খুব বেশি মানুষের সংস্পর্শে আসিনি যাঁরা দিতে জানেন। কিন্তু আরও অনেক কম মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, যাঁরা নিতে জানেন। নেওয়াটা কিন্তু দেওয়ার চেয়ে অনেকই বেশি কঠিন। যদি তোমার জীবনে তেমন কোনো মুহূর্ত আসে তখন বুঝবে আমার মতো বুনো মানুষের এই সরল বক্তব্যর সারমর্ম।

এবারে চিঠি শেষ করি। এই চিঠিটি যেন আমার বহু পরিচিত এক আচার্যর বক্তৃতার মতো হয়ে গেলো। অনেক কিছুই বলা হলো বটে কিন্তু বরফের চাঁই-এরই মতো তার ঠাঁই হলো না তোমার মনে। বলা শেষ হতে না হতেই বক্তব্য গলে জল হয়ে গেলো। আজ শেষ করি।

ইতি—রাজর্ষি

* * *

বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা

রাজর্ষি,

চেঞ্জ অফ সীজন-এর জন্যে খুব ভুগে উঠলাম সর্দি-কাশীতে। আপনার বসন্ত-বিলাস। আমার সর্দি জ্বর।

আপনি কেমন আছেন ? বসন্ত তো অপগত হতে চললো। এমনই বিমোহিত যে চিঠি লেখারও সময় পান না বুঝি আজকাল ? আর আমার "কখন বসন্ত গেলো এবার হলো না গান"।

অশেষের চিঠি পেয়েছি গতকাল। এবারে যখন এসেছিলো তখনই মনে হচ্ছিলো আমাদের সম্পর্কর তার দ্রুত যাচ্ছে ঢিলে হয়ে। তারের বাজনার তার ছিঁড়ে গেলে নতুন তার জোড়া যায় কিন্তু বাজনা পুরোনো হলে তার পুরোনো "কানে" ঢিলে হয়ে যাওয়া তারকে

আর টানটান করা যায় না। সুর লাগে না তাতে। মেরজাপ্-এর সঙ্গে ঘষা খেয়ে তখন শুধুই কাকের কর্কশ আওয়াজের মতো আওয়াজ বের হয়। যার কানে সুর আছে তার পক্ষে সে বড় লজ্জাকর অবস্থা। তখন সে বাজনাকে ঘরের বা মনের কোণে তুলে রাখাই ভালো। নয় কি ? আপনি কি বলতে পারেন আমাদের দেশের ছেলেরা পরবাসে গেলেই পর হয়ে যায় কেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ?

পরবাসে যে যায় তার তো স্ববাসের জন্যে আকুলই হয়ে ওঠার কথা ! সে কেন আপনজনদের পরজ্ঞান করে ? বাবা মাকে অস্বীকার করে ? তার জগৎ কেন শুধুই অর্থসর্বস্ব আমি-ময় হয়ে ওঠে ? এর জন্যেই কি মধ্যবিত্ত মা-বাবা ঋণ করে, নিজেরা অশেষ কষ্ট করে অশেষের মতো ছেলেকে 'মানুষ' করার জন্যে বিদেশে পাঠান ? মানুষ হতে গিয়ে কখন যে তারা অমানুষেরই পর্যায়ে পৌঁছে যায় তা হয়তো তারা নিজেরাই বুঝতে পারে না। এমন দৃষ্টান্ত আমার ভুরি ভুরি জানা আছে। মানুষ আর অমানুষের মধ্যবর্তী সীমারেখা বড় ক্ষীণ। আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই এক প্রান্তিক জীবন যাপন করি, চম্বলের বেহড়ের জীবন। কে যে কখন "বাগী" হয়ে গিয়ে অদৃশ্য রাইফেল হাতে হারিয়ে যাবো নদীপারের নিষ্ঠুর খোওয়াই-এ তা আমরা নিজেরাই জানি না। কিন্তু অশেষকে নিয়ে যে আমার বড় গর্ব ছিলো রাজা। যাকে আমি ভালোবেসেছিলাম, যাকে যোগ্যতম বলে মনে মনে মনস্থ করে মন এবং শরীর নিঃশর্তে দেবার জন্যে তৈরি করছিলাম নিজেকে সে এমন করে নিজেকে ছোট কী করে করলো তা বুঝে উঠতে পারি না। আমার সব বুদ্ধি জড়ো করেও পারি না।

আমার সঙ্গে সে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। কিন্তু গত সপ্তাহের গোড়ায় আমি অশেষদের বাড়ি গেছিলাম অশেষের মায়ের জন্যে একটু বেগুন-বাসন্তী রেঁধে নিয়ে। পোস্ত-ছড়ানো বেগুন-বাসন্তী খেতে উনি খুব ভালোবাসেন। জানি না, এই বেগুন-বাসন্তী আপনি কখনও খেয়েছেন কি না। কিন্তু সব রকম বসন্তরই যে-প্রকার ভক্ত আপনি তাতে মনে হয় বেগুন-বাসন্তীরও প্রেমে পড়বেন অবশ্যই। আপনি এখানে এলে অথবা আমি ওখানে গেলে রেঁধে খাওয়াবো। ভুলি কি করে যে "The only way to the heart is through the Stomach."

যা বলছিলাম। মাসীমা-মেসোমশাই মুখে কিছু বললেন না কিন্তু বুঝলাম তাঁদের বড়ই দুর্দশা। অশেষ তাঁদের টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে এবারে ফিরে যাওয়ার পর থেকেই। শুধু তাই-ই নয় ; আমার কাছে ওঁদের সম্বন্ধে অপমানকর কথা লিখেছে এবং ওঁদের কাছেও আমার সম্বন্ধে। কী বলব জানি না, যার সুবাদে যার সম্পর্কে মাসীমা-মেসোমশায়ের সঙ্গে আমার একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো সেই মানুষের সঙ্গেই সম্পর্কটা ছিঁড়ে বসেছে কিন্তু তার মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ়তর হয়েছে।

আমি ঠিক করেছি, মাইনেটা যখন পাবো কালকে তখন তার আধেকটা মাসীমাকে দিয়ে আসবো। এবার থেকে প্রতি মাসেই তাই করবো ভাবছি। আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা এই যে, সেটা করা কি আমার ঔদ্ধত্য হবে ? অন্যায় হবে কি ? অশেষের সঙ্গে আমার দূরত্ব বেড়ে যাওয়াতেই কি তার মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক নিকট হলো ? অশেষ ছাড়া ওঁদের কেউই নেই। অথচ অশেষই ওঁদের ত্যাগ করলো। লজ্জায় মরি আমি ! কী বিচিত্র সব ঘটনা ঘটে এ সংসারে। তাই না ?

আমার মনোভাব দেখে আমার বাবা এবারে যাওয়ার আগে মৃদু ভর্ৎসনা করে গেছিলেন আমাকে। বলেছিলেন, তোমার নিজের জীবনটা নিজেরই। মহত্ত্ব দেখাতে গিয়ে, ভাবাবেগের বশে সেই জীবনকে নষ্ট কোরো না। জীবন আদৌ ভাবাবেগের ক্ষেত্র নয়।

সুখকে ঘরবন্দী, নজরবন্দী করে রাখতে হলে কিছুমাত্রায় স্বার্থপর ও ভাবাবেগবর্জিত তোমাকে হতেই হবে। পৃথিবীর সব মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মেটানোর ভার তো বিধাতা তোমাকে দেননি? তবে যে দায় পালন তোমার দুটি নরম হাতের পক্ষে অসম্ভব সে দায় তুমি নিতেই বা যাবে কেন?

রাজর্ষি! আমি কি করি এখন বলতে পারেন? আমার বাবাও কি বিদেশে সারাজীবন থেকে অশেষেরই অন্য সংস্করণ হয়ে গেলেন? কিন্তু আমার বাবা তো আমাকে খুবই ভালোবাসেন। আর বাসেনই যদি তবে আমার দুঃখর স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর কোনো স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে এতো সময় লাগে কেন?

আপনার উপর, কেন জানি না, অজানিতেই বড় ভরসা জন্মে গেছে। যে গম্ভীর প্রশ্নর উত্তর নিজের কাছে নেই, ভাবি সেই প্রশ্নর উত্তর আপনি সহজ কৌতুকেই দিয়ে দেবেন। এই ভরসাতেই এই চিঠি। আপনি তো এলেবেলে মানুষ নন। একে বনবাসী, তায় রাজা এবং ঋষি।

আমি বড় বিচলিত আছি। আমাকে আশা করি ভুল বুঝবেন না। আপনার কাছ থেকে সহমর্মিতা ছাড়া আমার কিছুই চাইবার নেই। শুধু উপদেশই চাই।

ভালো থাকবেন।

আপনার—ঋতি

বেতলা, পালামৌ

ঋতি, কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠি পড়ে খারাপ লাগলো। আমার জন্যে নয়। তোমার জন্যে। তোমার তো দুঃখ পাওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং তোমার মানসিকতা জেনে, অশেষের মা-বাবার প্রতি তোমার মনোযোগ ও সমবেদনার স্বরূপ উপলব্ধি করে তোমার মতো বন্ধু আমার আছে বলে জেনে আমি সত্যিই গর্বিত।

আরও কিছু বলার আগে একটি কথা তোমাকে বলে নিই। সে কথা বলা দরকার। তোমাকেও আমারও সহমর্মিতা ছাড়া আর কিছুই দেওয়ার নেই। তা ছাড়া, এর চেয়ে বড় দান বা প্রাপ্তি আর কীই বা হতে পারে! পারে না বলেই তো প্রথমেই সহমর্মিতার কথা তুমি বলেছো। রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখায় পড়েছিলাম যে "আত্মীয়" কথাটির মানে হচ্ছে যে, আত্মার কাছে থাকে। সেই অর্থে অশেষের মা-বাবা তোমার নিকট-আত্মীয়। তুমিও তাঁদের আত্মীয়। এবং তুমি আমারও আত্মীয়। ড্রেসিং টেবলের উপরে তোমার ছবি আছে বলেই শুধু নয়, তোমার চিঠির মধ্যে দিয়ে ঋতি নামের যে মেয়েটি অমলতাস-এর স্তবকের মতো ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছো আমার মনে, তোমাকে চাক্ষুষ না দেখেও তোমার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও মানসিকতা সম্বন্ধে যেরকম ধারণা গড়ে উঠেছে আমার তাতে তুমিও নিশ্চয়ই আত্মীয় হয়ে উঠেছো আমার। সেই সুবাদেই বলি, অশেষের মা-বাবা সম্বন্ধে তুমি যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছো তার জন্যে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জেনো। শুধু অভিনন্দনই নয়, জেনো তোমার পেছনে আমাকে পাবে যখনি ভয় পাবে।

তোমার বাবাকে দোষ দিওনা। আমি “মিছিমিছি” বাবা হয়েও (বনীর মেয়ে তৃণা আমাকে ঐ নামেই ডাকে) পিতৃত্বর কিছু স্বাদ পেয়েছি। মা যেদিন তুমি হবে সেদিন তুমিও জানতে পারবে যে বাঘিনীরই মতো তুমি তোমার সন্তানকে আগলে রাখবে যে তাই-ই শুধু নয়, তুমি চাইবে যে পৃথিবীর তাবৎ ভোগ্য লেহ্য পেয় খাদ্য শুধুমাত্র তোমার সন্তানেরই কুক্ষিগত হোক। চোখ-কান খুলে দেখলে নিশ্চয়ই এ কথা সমাজ এবং দেশের বিভিন্ন স্তরে লক্ষ করেছো।

হয়তো এইটাই স্বাভাবিক।কিন্তু স্বাভাবিকতা সব সময় শিক্ষার সমার্থক হয় না। যে শিক্ষিত মানুষ নিজের সন্তানদের সঙ্গে অন্যের এবং বিশেষ করে তাঁর নিজের চেয়ে কম স্বচ্ছল মানুষদের সন্তানদের সঙ্গে কোনো রকম তারতম্য না করেন তিনিই প্রকৃত সাম্যবাদী। এই সাম্যবাদের সঙ্গে কম্যুনিজম-এর কোনো সাযুজ্য নেই। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদী হওয়া যতটা সহজ ব্যক্তি জীবনে সাম্যবাদী হওয়া তার চেয়ে অনেকই বেশি কঠিন। যদি খোঁজ নাও তো জানবে পুঁজিপতিদের মধ্যে একাংশ তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে সাম্যবাদীদের অধিকাংশদের চেয়ে অনেক বড় মাপের এবং তীব্রমাত্রার সাম্যবাদী। “Charity begins at home.” যে কম্যুনিস্ট বাড়ির কাজের লোককে ত্রিশ টাকা মাইনে দিয়ে দেশের মেহনতী জনতার মজুরী বাড়াবার আন্দোলনে সামিল হন তিনি ফাঁকা সাম্যবাদী। ভণ্ড রাজনীতিক। পুঁথির বাঘ তিনি। তোমার বাবার মধ্যে এই ব্যক্তিগত জীবনের সাম্যবাদ নিশ্চয়ই প্রত্যাশার। এবং তোমার চিঠির মাধ্যমে তাঁকে যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হয় যে আমার অনুমান ভুল হয়নি। তুমি হয়তো তাঁর অপত্য স্নেহর ঘনতাকে তাঁর স্বার্থপরতা বলে ভুল করছো। তুমি যদি সত্যিই সিদ্ধান্ত নাও তাহলে তিনি তোমার পথে বাধা হবেন বলে আমার অন্তত মনে হয় না ঋতি। তুমি দেখো।

এবারে বলি, চিঠি দিতে দেরী হলো কেন। বনী এসেছিলো তৃণাকে নিয়ে দোলের আগে। ও-ও আমার মতো বসন্ত-বিলাসী। কিন্তু বেচারী এমনই একটি অপদার্থকে ভালোবেসেছিলো, তার সন্তান গর্ভে নিয়ে আমাকে বিয়ে করেছিলো (বাজে লোকে বলবেন হয়তো আমাকে “ঠকিয়েছিলো”) যে বসন্ত তার আমার মতো “মিছিমিছি” বরের সঙ্গে কাটিয়ে যেতে হলো। “চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো” আর “ও চাঁদ তোমায় দোলা দেবে কে, কে দেবে কে দেবে তোমায় দোলা” গেয়ে। তৃণার আমার মতো মিছিমিছি বাবার প্রতি যে অকৃত্রিম মমতা, ভরসা, তার যোগ্য আমি কোনোদিনও হয়ে উঠতে পারব বলে মনে করি না। আমি যদি ‘মিছিমিছি বউ’ মিছিমিছি মেয়ে’ নিয়ে বেশ কয়েক বছর দিব্যি আনন্দে কাটিয়ে দিয়ে থাকতে পারি তবে তুমিই বা ‘মিছিমিছি শ্বশুর-শাশুড়ি’ নিয়ে ক’টা দিন কাটাতে পারবে না কেন ঋতি ? জীবন একটা মঞ্চ। এতে কোনো একটি চরিত্রর মেক-আপ নিয়ে উঠে পড়লে নিজের অজানিতেই সে চরিত্রে অভিনয় করে যেতে হবে। না জেনেই, যে অভিনয় করছো।

আসলে “মিছিমিছি” কথাটাই মিছিমিছি। জীবনে যা APPARENT তার অনেকখানিই ; বেশিটুকুই REAL। আবার To See it from the other way round, যা REAL তার অনেকখানি, বেশিটুকুই APPARENTLY REAL, প্রকৃতপক্ষে REAL নয়।

তুমি কি রবীন্দ্রনাথের এই গানটি জানো ? বা শুনেছো ? না জানলে শিখে নিও (আমার মন বলছে তুমি গান জানো) আর না জানলে শুনো

"হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই।
সংসারে যা দিবে মানিব তাই,
হৃদয়ে তোমায় যেন পাই।"

অন্তরা, সঞ্চারী আর আভোগ উদ্ধৃত করলাম না। বার বার এই গানটি গেও বা শুনো দেখবে তোমার মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব দূর হয়ে গেছে, শীতের শেষরাতের নীল পাহাড়ী কুয়াশার বুনোট যেমন রোদ উঠলেই কেটে গিয়ে স্বচ্ছ হয়ে যায় তেমনই স্বচ্ছ হয়ে যাবে তোমার দৃষ্টি। আমি জানি, বনী আর তৃণা সম্বন্ধে তোমার ঔৎসুক্যের শেষ নেই। তুমি আমাকে এক বিশেষ চোখে দেখো বলেই তোমার এই ঔৎসুক্য। এটা স্বাভাবিক। এই ঔৎসুক্য অশালীন অথবা কুরুচিকর নয়। একদিন শিগগিরই তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেব। তবে আজ নয়। চিঠি এমনিতেই বড় হয়ে গেলো তা ছাড়া, আমার মারুমারে বেরুতে হবে এখুনি। এত ভাবনার কী আছে ? অত সহজেই দুঃখ পাও কেন তুমি ঋতি ? সব সময় আনন্দে থাকবে। আকাশ আছে, বাতাস আছে, ভোরের বাতাস, ডানা-মোড়া সোনালি নরম পাখির মতো শেষ বিকেলের আলো আছে, যে আলোর দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর সব ছোটমনের কুচক্রী লোককেই অবলীলায় ক্ষমা করে দেওয়া যায়। ফুলের গন্ধ আছে ঋতি, কুর্চিবনে গান আছে, চাঁদভাসি রাতে একা বসে নিজের মনের বুটি-কাটা বারান্দায় নিজের সঙ্গে নিজেরই কাটা-কুটি খেলা আছে। একা একা। নিজে দুঃখ না দিলে অন্য কেউই তোমাকে দুঃখী করে এমন সাধ্য আছে কার ?

আনন্দম ! আনন্দম ! আনন্দম !

ইতি আনন্দময় রাজর্ষি

রাজর্ষি বসু। টাইগার প্রজেক্ট,
বেতলা পালামৌ ন্যাশানাল পার্ক
পালামৌ, বিহার

বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা

ঋষি,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগল। সত্যিই আপনি ভারী ভাল চিঠি লেখেন। এমন সুন্দর চিঠি আমার জীবনে আর কেউই দেয়নি আমাকে। আপনাকে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো জানি না।

এক সমস্যার উত্তর পেতে না পেতেই আমি এমনই ভেঙে পড়েছি যে কী বলব। আমাদের পাশের বাড়ির পূর্ণাদির বিয়ে হয়েছিল চার বছর আগে। ভারী হ্যান্ডসাম স্বামী। প্রণবদা। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তাদের মেয়ের নাম মিষ্টি। যখনই পূর্ণাদি এই বাড়ি আসত তখনই মিষ্টিকে আমার কাছে পাঠাতো। বোধহয় পুরো সময়ের অর্ধেকটা আমার কাছেই কাটতো ওর। গতকাল রাতে ওরা ফিরে যাচ্ছিল স্কুটারে করে। প্রণবদা চালাচ্ছিলেন। পেছনে মিষ্টিকে কোলে করে পূর্ণাদি। হঠাৎ একটা মিনিবাস কোত্থেকে এসে এমন ধাক্কা মারল যে তিনজনেই আমাদের চোখের সামনে পিষে গেল। ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টিই

কেবল ছিটকে গিয়ে ফুটপাথের ঘাসের ওপরে পড়েছিল। তাই বেঁচে গেছে।

একে কী বাঁচা বলে ? বলুন ?

পূর্ণাদির বাবা নেই। একতলার দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে ওঁরা এ পাড়াতে আছেন আমাদের ছেলেবেলা থেকেই। মেসোমশাই পূর্ণাদির বিয়ের দু মাস পরেই হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। মাসীমা একটি স্কুলে আঁকা শেখাতেন। রিটায়ার করবেন আগামী মাসে। পূর্ণাদি ওঁদের একমাত্র সন্তান। বেশি বয়েসের।

আজ এক্ষুনি ফিরছি হাসপাতাল থেকে। পূর্ণাদি এবং প্রণবদার মৃত্যু, আধ ঘণ্টার ব্যবধানে, আমাকে পাগল, ক্রুদ্ধ, হতাশ করে তুলেছে। মিনিবাসটাও বা কোত্থেকে এলো বলুন তো ? আমাদের বালীগঞ্জ প্লেসে মিনিবাসের কোনও রুট নেই। গ্যারাজে যাচ্ছিল বোধহয়। এই মিনিবাসের ড্রাইভারদের কি কিছুই করা যায় না ? মাঝে মাঝে মনে হয় নিজে পিস্তল চালাতে জানলে আর পিস্তল একটা থাকলে প্যাট প্যাট করে গুলি করে মারতাম অনেককে। এই দেশ যে অবস্থাতে এসে পৌঁছেচে তাতে গায়ের জোরই বোধহয় একমাত্র জোর।

প্রণবদা বাড়ির অমতে পূর্ণাদিকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলো বলেই ওঁর পরিবারের সঙ্গে কোনো সংস্রব নেই। প্রণবদার বাবা ছেলে বিক্রি করে বড়লোক মেয়ের বাবার কাছ থেকে মোটা দাঁও মারতে চেয়েছিলেন। সত্যি ! শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে আজও এমন অসংখ্য মানুষ আছেন ভাবতে অবাক লাগে। সি· আই· টি· রোডের এম· আই· জি· স্কীমের একটি ফ্ল্যাটে থাকতো ওরা। তবে শিগগিরই অন্য ফ্ল্যাটে চলে যেতো। উন্নতির কথাও সব পাকা হয়ে গেছিলো। প্রণবদাদের বাপের বাড়ির দিকের কোনো সাহায্য মিষ্টি পাবে না। ওদিকে মাসীমারও সামর্থ্য নেই। এখন ইমিডিয়েট সমস্যা হচ্ছে মিষ্টিকে প্রাণে বাঁচানো। একেবারেই শিশু। ওর মৃত্যু অবধারিত। ওকে বাঁচাবার কোনোরকম পথই দেখছি না। পূর্ণাদি আবার ব্রেস্ট-ফীডিং করাতো আধুনিক ডাক্তারদের মতানুযায়ী। কী যে হবে ! আমি ভাবতেই পারছি না।

নিজেকে আমি খুব ঠাণ্ডা, কম্পোজড, বুদ্ধিমতী বলে মনে করে এসেছি এতদিন। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমরা কেউই পূর্ণা নই। কখনও কখনও অন্য কারো সাহায্য, সাহচর্য, পরামর্শ এবং উষ্ণতারও প্রয়োজন হয়তো হয়ই। আপনাকেই জানি। তাই গুমোর ছেড়ে আপনাকেই লিখছি। কী করব, করা উচিত ; তা পত্রপাঠ জানান।

ইতি বিস্রস্ত

ঋতি

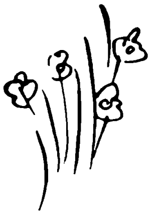

ঋতি রায়
বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯

মারুমার, পালামৌ

ঋতি,

এই মুহূর্তে তোমার কথা বেশ বেশি করে মনে পড়ছে। না, চাঁদের শোভায় বা ফুলের

বাসে নয়।

মারুমারের বাংলোর বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে ভরদুপুরে তোমাকে চিঠি লিখছি। সামনে হুলুক পাহাড়। মাথার উপরে বাজ উড়ছে। ঝাঁঝাঁ করছে রোদ। উগ্র কটুগন্ধ রোদে মাখামাখি হয়ে গেছে। কিন্তু অবস্থাটা এখন কাব্যি করার মতো নয়। আমার জীপ মারুমার থেকে ওক্সি যাবার পথে এক দুর্ঘটনায় পড়েছিল। সকালে। বাঁ পা-টা বোধহয় গেল জন্মেরই মতো। একটি উল্টোপথের ট্রাকে করে এসে এখানে বসে আছি বাসের অপেক্ষায়। বাঁশের স্পিন্টার বেঁধে দিয়েছে চৌকিদার আর ফরেস্ট গার্ড। গাঁদাফুলের প্রায় পাঁচ কিলো পাতা পায়ে নিবেদিত হয়েছে রক্ত বন্ধ করার ব্যর্থ প্রয়াসে। কিন্তু রাজর্ষি বসুর শোণিতস্রোতকে গাঁদাফুলের পাতা কি রুধতে পারে ? রক্ত বন্ধর ব্যর্থ চেষ্টার পর ব্যথা প্রশমিত করার সাধু-উদ্দেশ্যে আমাকে ওরা প্রায় জোর করেই দু বোতল মহুয়া সেবন করিয়েছে। এবং আরো সেবন করাবার চেষ্টাতে আছে। পা যদি বা বাঁচে এ যাত্রা, চরিত্রকে বাঁচানোর কোনো উপায় আছে বলে মনে হচ্ছে না। মদ খেলে তো চরিত্র যায়। তোমরা মেয়েরা তাইই তো বলো। না কি ? এই চিকিৎসাতে ব্যথা কমেছে কী না বলতে পারি না তবে আমার পিঠোপিঠি ছিপছিপে কুচুটে পিসতুতো বোন, যাকে ছেলেবেলায় বাঁ পায়ে বিস্তর লাথি মেরেছি এবং যে এখন বোম্বে ফিল্মের 'টুনটুন'-এর মতোই ফিগার করে তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘোরতর সংসারী তার ছেলেবেলার চিকন মুখটির কথা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেই বলেছিলো তোর বাঁ পাটা যদি ল্যাংড়া না হয় তো আমার নাম নিবেদিতা মিত্র নয় !

ল্যাংড়া বিলক্ষণই হয়েছে।

এখন তাকে খবরটা পাঠালে সে যে কী প্রকার খুশি হবে তাই ভাবছি।

বনে জঙ্গলে থাকার এই অসুবিধা। কলকাতায় তোমাদের কত্ত সুবিধা। ঝকঝকে তকতকে হাসপাতাল। 'অ্যাই' বললেই ট্যাক্সি। ফোন করলেই নিবেদিতপ্রাণ ডাক্তারেরা মাঝরাতে দৌড়ে আসছেন। ডাক্তারীর মতো নোবল্ প্রফেশানে টাকাটা তো সেকেন্ডারী। সেবাইতো আসল। কলকাতার উচ্চশিক্ষিত ডাক্তারেরা এসব কথা বোঝেন। মনে রাখেন। এটা আনন্দের। গরিব বড়লোক কারোই চিকিৎসার ব্যাপারে তোমাদের কোনোই অসুবিধা নেই। প্রায় ইংল্যান্ড-আমেরিকারই মতো। ই-এস-আই আছে। স্টেট সবকিছুই দেখছে। আর এখানে ? বাঘেই খাক কী ভালুকেই খামচাক কী সাপেই কাটুক বা স্ত্রীতেই কামড়াক বহুদূরের হাসপাতালের জন্যে হা-পিত্যেশ করে নিরুপায়ে বসে থাকতেই হবে। অনেকে ডুলি করে রুগী নিয়ে যায়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডুলিটাই গিয়ে পৌঁছয় হাসপাতালে। রোগী পথেই টেঁসে যায়। ডুলিতে যে সব রুগী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় তারা নাকি আবার ভূত-পেত্নী হয়ে যায়। কে জানে কপালে ভূত হওয়া আছে কী না !

দেখা যাচ্ছে, সাইকেলে কাঁকর উড়িয়ে কিরকিরশব্দ করে রেঞ্জার সাহেব আসছেন। তাঁর হাতে একটা লাল-রঙা জলীয়পদার্থর গাব্দা বোতল। মনে হচ্ছে, হুইস্কী। "পিলে, পিলে, পিলে হরিনামকো পেয়ালা/ও মতোওয়ালা মতোওয়ালা, মতোওয়ালা পিলে, পিলে, পিলে, হরিনাম কী পেয়ালা।"

ভাঙ্গা ঠ্যাঙ্গ নিয়ে ড্যাং ড্যাং করে ফিরে তোমাকে লিখবো।

ভালো থেকো।

রাজর্ষি

ঋতি রায়,
বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯

বেতলা, পালামৌ

ঋতি,

ডালটনগঞ্জের হাসপাতালে যাওয়ার পথে আমার ডেরা থেকে তুলে নেওয়া তোমার চিঠি পেলাম।

সেদিন বেশিক্ষণ আর বসে থাকতে হয়নি। রেঞ্জারসাহেব ওয়্যারলেস-এ খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নিজে তিন মাইল সাইকেল চালিয়ে গিয়ে। তক্ষুনি জীপ রওয়ানা হয়ে গেছিলো মারুমারের উদ্দেশ্যে আমাকে নেবার জন্যে। পায়ে অপারেশন হয়েছে। এখনও পনেরোদিন প্লাস্টার করা বাঁ পা শূন্যে উঠিয়ে হাসপাতালে থাকতে হবে, তারপর মাসখানেক বাড়িতে। এমন সময়ে, এই রূপে আমাকে প্লীজ দেখতে এসো না। আগেই মানা করছি। তার উপর ডাক্তারের নির্দেশ এবং গ্রীষ্মর দাবদাহে লুঙি পরে থাকতে হচ্ছে। যা কিছুই ঘটার তার অনেকখানিই প্রথম দেখাতেই ঘটে। প্রেম না ঘটুক ঘৃণা যেন না ঘটে সেটুকু দেখাতো কর্তব্য। না, এখন কোনমতেই এসো না। শ্রুতিকেও পাঠিয়ো না। ভারী খারাপ লাগলো তোমার চিঠি পড়ে। প্রণব, তোমার পূর্ণাদি এবং মিষ্টির কথা জেনে। পূর্ণা নামটির মধ্যে বিধাতা বোধহয় কোনো পরিহাস লুকিয়ে রেখেছিলেন নইলে পূর্ণতার কাছে এসেও তাকে অসম্পূর্ণা হতে হতো না।

সত্যিই তো ! তুমি বেচারী ! আর দ্যাখো তুমি যখন আমার যুক্তি পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখলে আর তখন আমি আমার সামান্য পায়ের কথা লিখে তোমাকে বিব্রত করলাম। জানতাম না তো ! ক্ষমা কোরো আমাকে।

মিষ্টিকে নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। সত্যিই নেই। তোমার তো নেইই। আমারও নেই। তুমি কি টলস্টয়ের একটি গল্প পড়েছো ? গল্পটির নাম 'হোয়াট মেন লিভ বাই ?' মানুষ বাঁচে কিসে ? একেবারে নির্ভুল করে হয়তো বলতে পারবো না, যতটুকু মনে আছে তাই বলছি। ধৈর্য ধরে শুনো।

রাশিয়ার এক প্রত্যন্ত প্রদেশে সাইমন নামের এক মুচি ছিলো। বড় গরিব সে। স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে অতি কষ্টে দিনযাপন করে। বেচারীদের পরিবারে প্রমাণ-মাপের দুটি কোটও ছিলো না। স্ত্রী যখন ঝোরাতে জল আনতে যেতো তখন ওই কোটটা পরে যেতো আর স্বামী যখন তাগাদাতে বেরুতো তখনও ওই কোটটিই পরে যেতো। কাজ অবশ্য বাড়িতে বসেই। লোকে চামড়া নিজেরাই দিয়ে যেতো আর পায়ের মাপ। সাইমন বাড়ি বসে জুতো বানিয়ে দিতো। মাঝে মাঝে শুধু টাকার তাগাদায় বেরোতে হতো।

একদিন বউ বললো, বাড়িতে এক মুঠো ময়দাও নেই। টাকাপয়সা যেখানে পাবে নিয়ো এসো। ফেরার সময় ময়দা কিনে আনতে ভুলো না। তাগাদায় যেতে হবে বেশ দূরে। কিছু পাওনা আছে। বেশ কিছু রুবল। তবে দূরের গাঁ। বেরিয়ে পড়লো সাইমন। পৌঁছলোও

BanglaBoi.org

গিয়ে । কিন্তু যেমন হয় সব দেশেই অধমর্ণরা উত্তমর্ণদের কখনওই একেবারে বা এক কথায় টাকা দেয় না । অধমর্ণ যদি বিত্তবান হয় তবে তো কথাই নেই ।

পুরো টাকা না পাওয়াতে মন বড় খারাপ হয়ে গেলো সাইমনের । যতটুকু টাকা পেলো তা থেকে ভদকা খেয়ে ফেললো বেশি । এবং প্রায় বেসামাল হয়ে উঠলো । বরফ পড়ছিলো । বিকেলও হয়ে এসেছিলো । যেতে হবে অনেক পথ । টলতে টলতে সাইমন তার গাঁয়ের দিকে পা বাড়ালো । একটি বাঁকে পৌঁছেই চমকে গেল । মানুষটিকে খুন করে কেউ ফেলে গেলো কি ? পাগল ? পথের বাঁকে অপরূপ সুন্দর এক দিব্যকান্তি যুবা ওই বরফপড়া বিকেলে বরফের উপরে পড়ে আছে । কিন্তু সম্পূর্ণ নগ্ন সে । প্রথমেই সাইমনের মন বললো, যা হোক তা হোক, শেষে খুনের মামলায় নিজেই ফেঁসে যাবে হয়তো । তার চেয়ে এই অকুস্থল থেকে কেটে পড়া ভালো । তারপর ভাবলো, লোকটা যদি মরে গিয়ে না থাকে তবে ঠাণ্ডাতেই এক্ষুনি মরে যাবে । কিন্তু তাকে বাড়ি নিয়ে যাবে কী, নিজেদেরই খেতে জোটে না । কী যে করে ! একমুহূর্ত ভেবে সাইমন, অথবা সাইমন নামের লোকটির ভিতরের মানুষটি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল শায়িত লোকটির দিকে । নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখলো বেঁচে আছে । লোকটির হাত ধরে তুললো সাইমন । বললো, তোমার নাম কি ?

লোকটি মাথা নাড়লো ।

বাড়ি কোথায় ?

তাও মাথা নাড়লো ।

করো কি তুমি ?

তাতেও সেই একই নেতিবাচক উত্তর ।

সাইমন তো পড়লো ভারী বিপদে । প্রথমে তো তার নিজের চামড়ার কোটটি খুলে লোকটির গায়ে পরালো । নিজের তো তার নীচে যাহোক কিছু তবু ছিলো । তারপর শীতে এবং বউ-এর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পথের এই উদ্ভট অতিথিকে সঙ্গে করে তো রাত নামার পর বাড়িতে এসে পৌঁছলো ।

একে টাকা আনেনি তায় সঙ্গে উটকো আপদ ! যে-কোনো বউ-এর মতো সাইমনের বউও তো মহাখাপ্পা হয়ে উঠলো । লোকটি বসার আর খাওয়ার ঘরের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে অপরাধীর মতো মুখ নামিয়ে বসে সাইমনের বউ-এর গঞ্জনা শুনতে লাগলো । গরিব, সে যত গরিবই হোক না কেন তার বাড়িতেও উনুনে আঁচ পড়ে । যা ছিলো, কোনা-তলা ঝেড়েঝুড়ে সাইমনের বউ তো পাঁউরুটি বানালো একটা । কপি ছিলো, তাই দিয়ে স্যুপ । পরিবারের সকলকে খেতে ডাকলো সে রান্না সেরে । এবং যখন ডাকলো, তখন ওই আগন্তুককেও ডাকলো । আগন্তুকের মুখে এক দ্যুতি ফুটে উঠলো । পরক্ষণেই সেই দ্যুতি ছড়িয়ে গেল এক আশ্চর্য দেবদুর্লভ হাসিতে । সে এসে খেতে বসলো ।

লোকটি কিছুই জানে না । তাকে সাইমন জুতো বানাবার কাজ শেখালো । চটপট সে নিখুঁত কাজ শিখে নিলো এবং এমনই ভালো সে কাজ যে সাইমন নিজেও অত ভালো করতে পারতো না । এখন সাইমন শুধু অর্ডার আনে ঘুরে ঘুরে আর ও জুতো বানায় । দেখতে দেখতে অবস্থাই ফিরে গেলো গরিব সাইমনের । বউ যাকে আপদ বলে বিদেয় করতে চেয়েছিলো সেই হয়ে উঠলো পরম সম্পদ সমস্ত পরিবারের কাছে । লোকটির মুখে কিন্তু কোনো কথা নেই । কোথা থেকে এসেছে, কারা তাকে অমনভাবে সর্বস্বহৃত করে পথের মাঝে বরফপড়া বিকেলে সম্পূর্ণ নগ্ন করে রেখে চলে গেলো, কোথায় সে যে যেতে

চায়, কিছুই সে বলে না। সারাদিন মুখ নীচু করে কাজ করে। খাবার সময় ডাক পড়লে গিয়ে খায়। ঘুমোবার সময় ঘুমোয়। একদিন হলো কী, রাশিয়ার রাজপরিবার, "জার" পরিবারের একজন অল্পবয়সী রাজপুরুষ অনেকগুলো ঘোড়ায়-টানা ঝুমঝুমি-বাজানো গাড়িতে করে এসে পৌঁছলেন সাইমনের বাড়ি। হাতে করে একটি বহুমূল্য চামড়া এনেছিলেন। বললেন, এই চামড়া দিয়ে আমাকে একটা বুটজুতো বানিয়ে দিতে হবে। ভালো করে মাপ নাও। ভালো বানালে ইনাম, না বানাতে পারলে চাবুক পড়বে পিঠে।

রাজপুরুষ যখন সাইমনের সঙ্গে কথা বলছেন তখন লোকটি সেই রাজপুরুষের মুখে চেয়ে হঠাৎ হেসে উঠলো। নিঃশব্দে সেই প্রথম দিনে যেমন হেসেছিলো। সাইমন তা লক্ষ করলো কিন্তু কিছু বললো না।

বুটজুতো ডেলিভারী দেওয়ার কথা যেদিন, সেদিন সকালে সাইমন আবিষ্কার করলো যে ওই বহুমূল্য চামড়াটিকে বুটের মতো করে না কেটে চটির মতো করে কেটে ফেলে তা দিয়ে মনোযোগ দিয়ে চটি তৈরি করছে লোকটি। সাইমনের মাথায় তো বাজ পড়লো। ভীষণ রেগে সে যখন তাকে গালাগালি করছে ঠিক সেই সময়ে ঝুমঝুমি বাজিয়ে অনেক-ঘোড়ায় টানা সেই গাড়িটি এসে দাঁড়ালো দরজাতে। একজন খিদমদগার দৌড়ে এসে বললো, আমার প্রভু মারা গেছেন। বুট চাই না। কফিনে পরে শোওয়ার জন্যে একজোড়া চটি বানাতে হবে। বিকেলে এসে নিয়ে যাবো আমি।

তার কিছুদিন পরে সাইমনের দোকানে, তখন দোকান বড় হয়েছে, এক সুন্দরী এবং অবস্থাপন্ন ঘরের মহিলা সঙ্গে ফুটফুটে ছোট দুটি সুবেশা মেয়ে নিয়ে এসে ঢুকলেন। একটি মেয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলো। সাইমনের বউ তাঁদের যত্ন করে বসিয়ে জিগ্যেস করলো, মেয়ে দুটি বুঝি যমজ ?

ভদ্রমহিলা বললেন, তা নয়। তবে তাই-ই। বলে, মেয়েদুটিকে দূরে গিয়ে খেলতে বললেন একটু।

মানে ? সাইমনের স্ত্রী শুধোলো।

আমাদের গ্রামে এক খুব গরিব কাঠুরে ছিলো। এক দুর্যোগের সকালে সেই কাঠুরে গাছ কাটতে গিয়ে গাছ চাপা পড়ে মারা গেলো। এবং সেই রাতেই তার স্ত্রী যমজকন্যা প্রসব করলো। প্রসবের যন্ত্রণার সময় এই মেয়েটির উপরে মা গিয়ে পড়াতে ওর পাটা খোঁড়া হয়ে যায়। যমজ সন্তান প্রসব করেই ওদের মা মারা গেলো । অল্প কদিন আগেই আমার একটি সন্তান হয়েছিলো। গ্রামের সকলে বললো তোমার সন্তানদের সঙ্গে তুমি ওদেরও তোমার বুকের দুধে লালন করো। নইলে ওরা যে মারা যাবে !

এই অবধি বলতেই, সেই সাইমনের সাহায্যকারীর মুখে আবার সেই আশ্চর্য নীরব জ্যোতির্ময় হাসি ফুটে উঠতে লাগল। ভদ্রমহিলা বললেন, অল্প কিছুদিন পরেই আমার নিজের সন্তানটি মারা গেলো। এরাই হয়ে উঠলো আমার সন্তান। আমার স্বামী আস্তে আস্তে ব্যবসা বাড়িয়ে বড়লোক হলেন। এখন ওরাই আমার মেয়ে।

ভদ্রমহিলা জুতোর মাপ দিয়ে চলে যেতেই সাইমন এবারে তার সাহায্যকারীকে চেপে ধরলো। বললো, তোমাকে বলতেই হবে তোমার এই হাসির মানে কি ? আমি লক্ষ করেছি যে তুমি একমাসে মাত্র তিনবার হেসেছো। কোনো কথা বলোনি। অথচ বিশেষ বিশেষ সময়ে হেসেছো। জার-এর পরিবারের লোকের বুটকে তুমি আগে থাকতেই না জেনে চটি করে কাটলে কি করে ?

তখন সে উঠে দাঁড়ালো। পবিত্র, উজ্জ্বল হাসিতে তার মুখ ঝলমল করছিলো। বললো,

এবার আমার যাবার সময় হলো।

আমি ছিলাম যমদূত। আমাকে একদিন ঈশ্বর এক গণ্ডগাঁয়ে পাঠালেন একটি নারীর প্রাণ আনতে। প্রচণ্ড দুর্যোগ। আমি জানতাম যে আমারই এক সহকর্মী সেই সকালেই সেই মেয়েটির স্বামীর প্রাণটি নিয়ে এসেছে। আমি যখন পৌঁছলাম তখন দেখি সেই নারী প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে। আমার সামনেই যমজ মেয়ে প্রসব করলো সে এবং একটা মেয়ের পাও খোঁড়া হয়ে গেলো। আমি ভাবলাম, আমার পক্ষে এমন নিষ্ঠুর কাজ করা অসম্ভব। এই সময় মাকে নিয়ে গেলে শিশু দুটি তো অবশ্যই মারা যাবে। কেউই তাদের বাঁচাতে পারবে না।

আমি ফিরে গিয়ে ঈশ্বরকে আমার অক্ষমতার কথা বললাম। আর উনি সঙ্গে সঙ্গে আমার দুটি ডানা কেটে পৃথিবীতে ফেলে দিলেন। বললেন, তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। তারপর বললো, সাইমন, তুমি আমাকে পথে যেখানে আবিষ্কার করেছিলে উপর থেকে আমি সেখানেই পড়েছিলাম।

সাইমন, সাইমনের বউ এবং ছেলেমেয়েরা জোড়হাতে ওর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, আমাদের ক্ষমা কোরো। কিন্তু তুমি যে তিনবার হাসলে তার কারণ তো বলে গেলে না। সে বলল, তোমার স্ত্রী অত দারিদ্র, অত অসুবিধার মধ্যেও আমাকে তাড়ালেন না। যখন আমাকে খেতে ডাকলেন তখন আমি জানলাম যে ঈশ্বর মানুষকে সহমর্মিতা দিয়েছেন। সহমর্মিতা মানুষেরই মনুষ্যোচিত গুণ। সহমর্মিতাহীন মানুষ, মানুষ নয়।

দ্বিতীয়বার ?

দ্বিতীয়বার ? দ্বিতীয়বার যখন রাজপুরুষ হম্বি-তম্বি করছিলেন তখন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমারই এক সহকর্মী যমদূত দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পেছনে।

আমি হাসলাম এই ভেবে যে, ঈশ্বর মানুষকে অনেক কিছুই জানতে দিয়েছেন, শুধু জানতে দেননি তার মৃত্যুর ক্ষণটি। যত বড় ধনী বা প্রাজ্ঞ বিজ্ঞই সে হোক না কেন, কোন্ সময়ে **যে তাকে** যেতে হবে তা তাকে জানতে দেন না ঈশ্বর। মানুষ অনেক জানে কিন্তু সব জানে না।

আর, তৃতীয়বার ?

তৃতীয়বারে তো আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হলো। মেয়াদ শেষ হলো এখানের। যে নারীর প্রাণ আমি নিয়ে এসে নবজাত শিশুদুটির অবধারিত মৃত্যু হবে বলে নিশ্চিত ছিলাম তাদেরই তো দেখলাম একটু আগে নিজের চোখেই। ঈশ্বর যা কিছুই করেন না কেন, তার পেছনে তাঁর চিন্তাভাবনা থাকেই। ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকলে ওই নবজাত শিশুদুটির বাঁচার কোনো উপায়ই ছিলো না।

এই কথাকটি বলেই, সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ, সাইমনের বাড়ির ছাদ ফাঁক হয়ে গিয়ে এক আশ্চর্য আলোয় সমস্ত বাড়ি আলোকিত হয়ে যেতেই, হারিয়ে গেলেন।

এই হলো গল্প ঋতি। ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা আজকাল তো এক ন্যক্কারজনক অপরাধ। অশিক্ষা এবং মূর্খামিরই নামান্তর তা। আমি নিজে করি কী করি না সে প্রসঙ্গও এখানে আনছি না কিন্তু টলস্টয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, রবীন্দ্রনাথ করতেন, আমার তোমার চেয়ে সর্বদিক দিয়েই যাঁরা অনেক বড় তাঁদের মধ্যেও অনেকেই করতেন।

এ প্রসঙ্গ আপাতত থাক। তোমার আশু কর্তব্য হলো তোমাদের পাড়াতে কোনো প্রসূতি থাকলে তাঁকে রাজী করিয়ে মিষ্টিকে ব্রেস্ট ফীডিং করানোর বন্দোবস্ত এখুনি করাও। হঠাৎ তুমি তার মা বনতে চাইলেই তো আর বনতে পারবে না। আমার কথা শোনো। ওকে বেবী

ফুড খাইও না। তারপর ঈশ্বর আছেন। তুমি যখন চাইছো, আমিও যখন চাইছি তখন মিষ্টি বেঁচে যাবে। যেমন করে আমার "মিছিমিছি মেয়ে" তৃণা বেঁচেছিলো। তার তো এই পৃথিবীর আলো দেখার কথাই ছিলো না। আমরা চেয়েছিলাম, বণী ততটা নয়, বিশেষ করে আমি, এবং হয়তো ঈশ্বরও ; তাই তৃণা আজ হাসে, কথা কয়, গান গায়, ঝরাফুল আর তাজা ঘাস মাড়িয়ে দৌড়ে যায়।

নাস্তিকতার মধ্যে একধরনের সহজ সপ্রতিভতা আছে কিন্তু এই যুগে নাস্তিক হতে হলে ভাবনাচিন্তা করার ক্ষমতা চাই, সর্বজ্ঞ জনগণের বিরুদ্ধাচারণ করার মতো মৌলিকতা এবং সাহসও চাই। ঈশ্বর ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস বা সুপার-কমপ্যুটারের মতো মানুষি-চালাকি নন। ঈশ্বরবোধ অনেক গভীর ব্যাপার। সকলের জন্যে তা নয়ও। নাস্তিকদের সঙ্গে ঝগড়া কোরো না, তাদের এড়িয়ে যেও। তর্ক বা ন্যায়শাস্ত্রের অধীনে আকাশতলের তাবৎ বিষয়ই যে পড়বে এমন কথাই বা কি আছে ? লিভ অ্যান্ড লেট লিভ। দু পা, দু কান, দু চোখ নিয়ে আকছার মানুষ জন্মেছে ও জন্মাচ্ছে। তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিশ্বাসের অধিকার আছে। এবং সে অধিকার ন্যায্যও। তাদের সঙ্গে ঝগড়া করার প্রয়োজন বা সময় বা ঔচিত্য তিনটির কোনোটিই আমার নেই।

মিষ্টির খবর জানিও।

আমার পিসতুতো বোন নিবেদিতাকে কনগ্রাচুলেট করে একটি চিঠি লিখছি। খুশি হবে। তোমরা মেয়েরাই পারো পরের পা ভেঙেও খুশি হতে। ধন্যি তোমরা।

ইতি রাজর্ষি

ঋতি রায়
বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯

বেতলা, পালামৌ, বিহার

ঋতি, রীতিবহির্ভূতাসু,

আশা করি প্রচুর জ্ঞানগর্ভ চিঠিখানি পেয়েছো এতোদিনে এবং তোমার পূর্ণাদির অসম্পূর্ণা মিষ্টি ভালো আছে। ভুল ভেবো না আমাকে। ঈশ্বর আছেন না নেই তা আমি নিজেই জানি না। তবে যাঁরা জোরের সঙ্গে বলেন যে ঈশ্বর আছেন (বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়েও তাঁরা এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন) এবং যাঁরা ততোধিক জোরের সঙ্গে বলেন যে তিনি নেই এই দু পক্ষকেই আমি সভয়ে এড়িয়ে চলি। তবে আমার এ কথাই মনে হয় যে, যেহেতু ঈশ্বরবোধের সঙ্গে শুভাশুভবোধ, ন্যায়-অন্যায়বোধ সমস্তই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাই কোনো অদৃশ্য শক্তি বোধহয় আছেন যা যুক্তিগ্রাহ্য বা বুদ্ধিগ্রাহ্য না হলেও অবশ্যই অনুভূতি এবং শুভবোধগ্রাহ্য। কোনো কিছু ছুঁড়ে ফেলার মধ্যে যতখানি সপ্রতিভতা থাকে (আদৌ থাকে কি ?) ততখানি শিক্ষা এবং শোভনতা থাকে বলে আমার কিন্তু মনে হয় না।

যাকগে,বড় বেশি ঈশ্বর ঈশ্বর হচ্ছে।এবারে বালীগঞ্জ প্লেসের ঈশ্বরীর খোঁজখবর নেওয়া যাক।

তোমার চিঠি আজকাল বড় বেশি দেরীতে আসছে। ডাকপিওন কি রসের গন্ধ

পেলেন ? নাকি আমার চেয়েও বন্য-মান্য কোনো মানুষের এখন সন্ধান পেলে তুমি ? তা হতেই পারে। সংসারেই তো সব জিনিস থাকে। তাকে শুধু খুঁজে বের করার কষ্টটুকু স্বীকার করলেই হলো। সন্ত তুলসীদাস বলেছিলেন না ? "সকল্ পদারথ্ হ্যায় জগ্‌মাহী কর্মহীন নর্ পাওয়ত্ নাহি।"

তুমি কর্মী নারী, তোমার কথাই আলাদা। যদি তেমন মানুষের সন্ধান পাও তো জানিও। ঈর্ষা করব না, খুশিই হবো। সত্যি ! তাছাড়া শূন্যে ভাঙা-পা ঝুলিয়ে শুয়ে থেকে কাউকে ঈর্ষা করে লাভই বা কি ? কথায় বলে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা !" এই মুহূর্তে আমি অবশ্যই বীরের মধ্যে গণ্য নই। ঈর্ষাও করা যাবে না। ঘৃণাও না। কারণ ঘৃণীত জনকে লাথি মারতে ইচ্ছে করলে পায়ের যন্ত্রণাই বাড়বে এবং নিরাময়ই "দূর-অস্ত" হবে। লাভ আর কিছু হবে না। ঈর্ষার কথা যখন উঠলোই তখন তোমাকে চুপি চুপি কটি কথা বলে ফেলি। স্বরগম্-এর প্রত্যেক স্বরের মধ্যে মধ্যে যেমন শ্রুতি থাকে দুই স্বরের মাঝে তেমন প্রধান রিপুদের মধ্যে মধ্যেও শ্রুতিরই মতো রিপু থাকে অনেকই সূক্ষ্ম শরীরে। তাদের কামড় এবং বিনাশকারী ক্ষমতা প্রধান রিপুদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। শিশুকাল থেকে আমি কখনও ঈর্ষা কবলিত হইনি। কেন হইনি তা বললে তুমি হয়তো দাম্ভিক বলে ভুল ভাবতে পারো আমাকে। দাম্ভিক আমি কোনোদিনই নই। তবে তোমাকে এ কথা বলতে সামান্য শ্লাঘা যে বোধ করছি না এমনও নয়। শ্লাঘা আর দম্ভ এক নয়। যা বলছি তা Statement of fact। কথাটা হচ্ছে এই যে, রাজর্ষি বসুও ঈর্ষা করতে পারে, আমাদের প্রজন্মে এমন বঙ্গনন্দন তো এ পোড়া চোখে পড়লো না আজ অবধি। পড়লে, খুশিই হতাম। প্রতিযোগী না থাকলে ধার কমে যায়, মনোপলি পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং বা এয়ার লাইনস্-এর মতো। হয়তো পড়াশুনোয় বা খেলাধুলোয় বা মনের প্রসারতায় বা চাকরীর ঔজ্জ্বল্যে বা গানের গলায় বা চিঠি লেখার গুণে রাজর্ষি বসুকে হারানোর মতো অনেককেই খুঁজলে পাওয়া যাবে (তাও গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঢ্যাঁড়া পিটোতে হবে গো রাজকন্যে !) কিন্তু সব গুণই যার কমবেশি আছে এমন শর্মা তুমি রাজর্ষি বসু ছাড়া আর কারোতেই পাবে না হাতের কাছে। জানি যে তুমি বলবে এতো গুণ নিয়েও হলো না তো কিছুমাত্রই ! পড়ে রয়েছি তো এই সবুজ গর্তেই !

আমি বলব উত্তরে, আছি, বিধাতার ইচ্ছেতেই। আমার কোনোই তাড়াহুড়ো নেই জীবনের কোনো গন্তব্যতেই যাবার ; কোনো কিছুকেই পাবার। নেই বিন্দুমাত্র ছট্‌ফটানি। যা এবং যতটুকু পাওয়ার মতো পাওয়া তার সবটুকুই যে পাবো সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই। সময় হলেই পাবো। এই পাওয়া কোনো জাগতিক পাওয়া নয়। চাওয়া যেমন, পাওয়াও তো একজন মানুষের তেমনই হবে। যে যা চায়, তাইই পায়। যাদের চাওয়াতে ভুল হয়ে যায় তারা পেয়েও হা-হুতাশ করে। অন্য কিছু চায়। আমার চাওয়া তেমন নয়। ছেলেবেলায় আমাদের পাড়ায় একটি বাচ্চা ছেলে ছিলো, নাম ভুলে গেছি তার। তাকে থালাতে নানারকম সন্দেশ মিশিয়ে দিয়ে মা বলতেন কোন্‌টা খাবি বল ? হ্যাঁ হ্যাঁ। নাম মনে পড়ে গেছে। তার নাম ছিলো ক্ষেপু। ক্ষেপু কিছুক্ষণ দুটি হাত পেছনে করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে থালাটি পর্যবেক্ষণ করে ডানহাতের তর্জনী তুলে বলতো "এতা খাবো, ওতা খাবো, থেতা খাবো ; থব্ খাবো"। বেশির ভাগ মানুষই এই থব্ খাবার লোভে পড়েই মরে। শিশুর ক্ষেত্রে যা ক্ষমার্হ, প্রাপ্ত বয়স্কের ক্ষেত্রে তা নয়।

ঈর্ষা যাঁরাই করেন অন্যকে তাঁরা কোনো না কোনো গভীর হীনম্মন্যতাতে নিশ্চয়ই ভোগেন। তাঁরা অনেকেই হয়তো অযোগ্য, তাঁদের অনেকের অতীত জীবন কুহেলিকাময়।

এই মুহূর্তে তাঁরা মেকআপ করে ভুরু এঁকে অতীতের সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশটিকেই শুধু পাদপ্রদীপের সামনে আনেন। এবং সেই প্রতীয়মান অংশটুকু আজকের তাঁদের ঝক্‌ঝকে জীবনের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে যায়। কিন্তু অনেক কিছুই অতি সাবধানে লুকোচাপা দেবার থাকে তাঁদের পূতিগন্ধ অতীতের। যেহেতু জীবনে যা-কিছু পেয়েছেন তা পাবার পূর্ণ যোগ্যতা তাঁদের নেই এবং পেয়েছেন পেছনের দরজা দিয়ে, ঘুষ দিয়ে, কলকাটি নেড়ে, এবং একথা তাঁদের মতো ভালো করে আর কেউই জানেন না,তাঁরা অন্যকে দেখে ঈর্ষান্বিত হন সবচেয়ে বেশি। অসৎ বক্র মানুষরা সৎ সরল মানুষদের সহ্য করতে পারেন না। খলদের কাছে সারল্য হচ্ছে সাপেদের কাছে বেজীর মতো। আর পৃথিবী তো খল আর ভণ্ডতে ভরে গেছে। ঘোর কলি যে! এখন তো তাদেরই দিন। জয়জয়কার। আমাদের ছেলেবেলার ক্ষেপুরই মতো "এতা খাবো, ওতা খাবো, থব্ খাবোরি মানসিকতা তারা কাটিয়ে উঠতে পারেননি প্রাপ্তবয়সে এসেও। বরং দেখি, আগ্রাসী লোভ আরো তীব্রতর। হজমশক্তির কথাও তাঁরা বিবেচনা করেন না। সবার পেটে যে সব সয় না এই সহজ বুদ্ধিও তাঁরা হারিয়ে ফেলেন।

মিথ্যা আর অর্ধসত্যের নামাবলী জড়িয়ে সারাটা জীবন বেঁচে যাওয়াটা কিন্তু কম কষ্টকর নয়। এই ভণ্ডদের দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। দীর্ঘ শরীরের, হ্রস্ব শরীরের, ফর্সা কালো, মোটা রোগা এই আপাদমস্তক তঞ্চকদের দেখে আতঙ্ক হয় আমার।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলেছিলেন 'It does not really matter where you come from socially. It all matters where do you go.' তিনি লেখক ছিলেন। আমি যাঁদের কথা বলছি তাঁরা লেখালেখির ধার মাড়ান না। কাছ থেকে দেখেছি, জানি, শুধু তাদের কথাই বলতে পারি আমি। বলাবাহুল্য, হেমিংওয়ে সমাজ সম্বন্ধেই এই কথা বলেছিলেন এবং অতীত নিয়ে যে অগণ্য মানুষের এক ধরনের fixation থাকে তাঁদের কটাক্ষ করেই বলেছিলেন।

একজন মানুষ তাঁর সম্পূর্ণতা বোধহয় পান তাঁর অতীতেরই প্রেক্ষিতে। আজকাল অনেক ঈর্ষাকাতর মানুষ দেখি যাঁরা নিজেরা মানুষের পর্যায়ে নিজেদের উন্নীত করতে না পারলেও আন্তর্জাতিকতা, বিশ্বমানবতা ইত্যাদি নিয়ে গলাবাজী করেন। তাঁদের অনেককে দেখে, তাঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় বঙ্গভূমের বিশেষ বিশেষ এলাকাতে এঁরা হেলিকপ্টারে করেই নেমেছিলেন। পথে গায়ের গন্ধটুকু পর্যন্ত রেখে আসেননি পাছে পুলিশের কুকুর গন্ধ শুঁকে অতীতে গিয়ে পৌঁছয়। এমন মানুষেরা যদি তোমায় ঈর্ষা করে ঋতি, তাহলে ক্ষমা করে দিও তাদের। অনুকম্পা কোরো। এমন মানুষের ভিড়ই তো বেশি এখানে।

তবে একথা অবশ্যই ঠিক যে ধারেকাছে ঈর্ষাকাতর মানুষ থাকলে গা ঘিনঘিন করে। কিন্তু কী করা যাবে! কেষ্টর দুনিয়াতে তো সবরকম জীবই থাকবে। এ তো এক চিড়িয়াখানাই। তা নইলে যে জমতোই না। শুধু ঈর্ষা করেই এই মানুষগুলো থামে না, মিথ্যাচার করবে তোমার সঙ্গে। যূথবদ্ধ জানোয়ারের মতো তোমাকে বিনাশ করার চেষ্টা করবে যেন ক্ষুধার্ত জংলী কুকুরের দল! তোমার ভালত্ব, সারল্য এবং গুণই ওদের একমাত্র খাদ্য! ওরা তোমার চরিত্র-হননের নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করবে। ইঁদুর যেমন সবসময়ই কিছু কাটাকাটি না করতে পারলে মরে যেতে বাধ্য হয়, চরিত্রে এই ঈর্ষাকাতররাও ঠিক তেমনই। আরেকজাতের দু পেয়ে ধেড়ে ইঁদুর। যাদের বাস শহরে।

আমার মা বলতেন, যে-সময়ে তুমি অন্যকে ঈর্ষা করবে, অন্যের ক্ষতির কথা ভাববে

সেই সময়ে নিজের উন্নতির জন্যে কিছু করলে তোমার অনেক বেশি ভালো হবে। এই কথাকটি সকলের মায়েরই কথা হলো না যে কেন জানি না। হলে, এই পৃথিবী বড় সুখের জায়গা হতো।

ঋতি, তুমি যে দেশে জন্মেছো এবং বিশেষ করে যে রাজ্যে তাতে তোমার সাফল্য ও কৃতিত্বর পরিমাপ (তা যতটুকুই হোক না কেন) চিরদিনই হবে তোমাকে ঈর্ষা করে, তেমন মানুষদের সংখ্যা এবং তোমার সঙ্গে শত্রুতা করে এমন মানুষদের সমষ্টিরই মাপে। এই হলো আমাদের সাফল্য ও কৃতিত্বের নিক্তি। কী দুঃখের কথা!

তারা যা খুশি করে করুক তুমি ঈর্ষা কোরো না কাউকেই। ঈর্ষা একধরনের দুরারোগ্য অসুখ। হীনম্মন্যতার এক দুরারোগ্য ভাইরাস্ থেকে এর উৎপত্তি। এই রোগ কেউ কেউ জন্মসূত্রে পায়, কেউ বা পায় পরিবেশ থেকে, কেউ আবার পায় যোগ্যতার তুলনায় অনেক বেশি প্রাপ্তিযোগ ঘটলে। তবে তোমার টাইফয়েড বা কলেরা হবার সম্ভাবনা যেমন নেই ঈর্ষা-কাতর হবার সম্ভাবনাও নেই।

ভেবেছিলাম, এই চিঠিতে বনী আর তৃণার কথা বলব! দেখলে তো ঈশ্বর আর ঈর্ষা কেমন এখানকার গ্রীষ্মের 'লু' যেমন করে ধুলো আর ঝরাপাতা উড়িয়ে নিয়ে ঘূর্ণী তোলে জ্বালা-ধরা মধ্যাহ্ন আকাশে তেমন করেই আমার সদিচ্ছাকে উড়িয়ে দিলো।

কথা দিচ্ছি, পরের চিঠিতে 'ঈ'কার সম্পূর্ণই বর্জিত হবে।

আশা করব, ইতিমধ্যে তোমার কাছ থেকে সুন্দর একটি চিঠিও পাবো। ভালো থেকো।

ইতি রাজর্ষি

* * *

রাজর্ষি বসু,
প্রযত্নে টাইগার প্রজেক্ট,
পালামৌ ন্যাশানাল পার্ক, বেতলা

কলকাতা

বিবেক,

শুধু বিবেক না বলে যাত্রাদলের বিবেক বলাই উচিত ছিলো।

আধুনিক যাত্রায় বিবেক থাকে না। আধুনিক মানুষের বিবেক বলে কিছু নেই বলেই হয়তো থাকে না। তবে বাবার মুখে গল্প শুনেছি যে পুরনোদিনের যাত্রায় সাদা পোশাকে মাঝে মাঝেই বিবেক এসে কিছু ভালো কথা শুনিয়ে যেতো। কখনও গান গেয়ে। কখনও কথাতেই। যাত্রার নায়ক-নায়িকার বিবেক জাগাতে।

তবে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন কলকাতাতেই একটি থিয়েটারে, স্টার বা রংমহল হবে, ঠিক মনে নেই আজ; একটি থিয়েটার দেখেছিলাম তাতে বিবেক প্রসঙ্গ ছিলো। একজন মাড়োয়ারী ব্যবসাদার, আটার কল ছিলো, তাঁর গমের সঙ্গে তেঁতুলের বীচি মিশিয়ে চাকি চালালে অনেক মুনাফা হবে এই বুদ্ধি (নাকি দুর্বুদ্ধি) এক বন্ধুর কাছ থেকে পাবার পর স্টেজে দাঁড়িয়ে সখেদে স্বগতোক্তি করেছিলেন। বলেছিলেন "এই বিবেক শালা হারামজাদা আছে। যাতে বেশি মুনাফা, চাকি ঘোরালেই মুনাফা তাই এই হারামজাদা করতে

মানা করে। কী বিপদ মোশোয় !"

এখনকার ব্যবসাদারেরা বিবেক ধুয়েমুছে ফেলেছে বলেই আর দংশনও করে না বিবেক। আমরা ধন্যি। বিবেকের বিষ-দাঁত কত সহজে উপড়ে ফেলেছি বলুন তো !

আপনার কাছ থেকে চিঠি চাই শুধুমাত্র আমাকেই লেখা। যাতে আমাকে সম্বোধন করে শুধু আমারই জন্যে অনেক কথা থাকবে। আপনার কলমের মুখে কথা স্বচ্ছতোয়া নদীরই মতো অবিরাম কুলকুলানি গান গেয়ে বয়ে যাবে। তা নয়, যতসব অ্যাবস্ট্রাক্ট নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা। ভালো লাগে না।

মিষ্টিকে রাখা গেলো না। পরশু রাতে আমার এবং প্রতিবেশীদের চোখের সামনে সে ধুম জ্বরের মধ্যে চলে গেলো। হয়তো পূর্ণাদিরই কাছে। আপনি হয়তো বলবেন যে সবই Pre-conditioned. যে যমদূত তাকে নিতে এসেছিলো সেও হয়তো নিতে চায়নি। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের ইচ্ছা তাই সে নিয়ে গেলো মিষ্টিকে।

ভাইরাস্-এর অ্যাটাক হয়েছিলো। কোন্ ভাইরাস্ তা ডাক্তারেরা বলতে পারলেন না। যে রোগ তাঁদের জ্ঞানবুদ্ধির পরিমণ্ডলের মধ্যে পড়ে না তাই ভাইরাস্। আধুনিক ডাক্তারদের মতো কপাল-মানা মানুষ আর নেই। এরই আরেক নাম বৈজ্ঞানিক অন্ধত্ব। এবং যতদিন এই অজানা এবং জ্ঞানের সীমার বাইরের ব্যাপার থাকবে ততদিন ঈশ্বরকে না মেনে উপায় নেই। আপনারই জয় হলো।

মনটা ভারী খারাপ হয়ে আছে। আমাকে একটি সুন্দর চিঠি দেবেন। যে চিঠি পড়ে আমার মন ভালো হয়ে যাবে।

ভালো থাকবেন।

ইতি ঋতি

পুনশ্চ : এতোদিনে আমি একবার চলে যেতাম। আপনার দেখাশোনা নিশ্চয়ই ঠিকমতো হচ্ছে না। কিন্তু লুঙ্গি পরে এবং পা উঁচিয়ে থাকার ভয় দেখালে যাই কি করে ? কোনো মহিলার পক্ষেই যাওয়া সম্ভব নয়। এই সব দুর্বিপাকের জন্যেই একজন স্ত্রীর দরকার সব পুরুষেরই।

* * *

ঋতি রায়
বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯

বেতলা, পালামৌ

ঋতি ভাইরাস্,

তোমার আক্রমণও ভাইরাস্-এর আক্রমণের চেয়ে কম বিপজ্জনক নয়। যে বা যারা আক্রান্ত হয়েছে সে বা তারাই তা জানে। এ অসুখে আক্রান্ত হলে কোনো ডাক্তারের বাবার সাধ্য নেই যে তা প্রতিহত করেন।

ঈশ্বর যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই। মিষ্টির উপর তোমাদের সকলের সব রকম স্নেহ ও বোধ ঘনীভূত হবার আগেই সে যে চলে গেলো এ এক মস্ত বাঁচোয়া ! এই মিষ্টিই যদি

তোমার কাছে পনেরো বছর থেকে বড় হয়ে, স্কুলের ছাত্রী হয়ে তারপর যেতো তাহলে তুমি সেই শোককে সহ্য করতে পারতে না। সে নিজেও যে চলে গিয়ে বেঁচে গেছে, শুধু তোমাদেরই বাঁচিয়ে যায়নি এই কথাও ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে বুঝতে পারবে।

মিষ্টির প্রতি তোমাদের যে সমবেদনা ছিলো তা এবার তোমার পূর্ণাদির মায়ের উপর স্থানান্তরিত করো। তাঁর তা প্রয়োজন। তাঁকে একটি সেলাই-এর পা-মেশিন কিনে দাও তোমরা চাঁদা করে। কোনো মানুষকেই সাহায্য বা ভিক্ষা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। যাঁরা তেমনভাবে বাঁচতেও চান, তা তাঁরা যত অসহায়ই হোন না কেন, তাঁদের আত্মসম্মান নেই-ই বলতে হবে। তা ছাড়া তেমনভাবে কারো পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে পরমুখাপেক্ষী হয়ে বাঁচার চেয়ে না-বাঁচাই ভালো। প্রত্যেক মানুষকে বাঁচতে যে হবেই এমন কথা তো নেই। ন্যূনতম আত্মসম্মানবোধ নিয়ে বাঁচতে না পারলে সত্যিই বাঁচা-মরা সমার্থক।

মেসিন কিনে দেওয়ার পর ওঁকে তোমরা সবাই মেয়েদের ও বাচ্চাদের জামা বানাবার অর্ডার দাও। বাজারের দর্জিকে যা দাও তাই দেবে। বেশি নয় কমও নয়। গোড়াতে তোমরা এই সাহায্যটুকু যদি করো তাহলেই দেখবে দু বছরের মাথায় ওঁর দু'একজন মেয়ের সাহায্যর দরকার হবে। বছরে পূজোর আগে কী পয়লা বৈশাখের আগে উনি যদি নিজের পছন্দমতো ডিজাইনের কিছু জামা, ব্লাউজ, সায়া ইত্যাদি বানিয়ে একটি প্রদর্শনী করেন তাহলেও খুব ভালো হয়। তবে প্রদর্শনীতে সফল হতে হলে তাঁকে নিজের মাথা থেকে ও সেলাই-এর দেশী-বিদেশী বই থেকে দেখে নতুন নতুন ডিজাইন বের করে বানাতে হবে। যদি তা পারেন এবং তোমরা বেশি দামে তা কেনো তখন তাঁর মুখের হাসিটি দেখে তোমাদের বুক ভরে যাবে।

এখানে এখন প্রকৃতির বড় রুদ্ররূপ। গ্রীষ্মেই প্রকৃতি তাঁর কঠিন জ্বালাধরা পৌরুষ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। 'দারুণ অগ্নিবাণে রে হৃদয় তৃষায় হানে রে/ রজনী নিদ্রাহীন, দীর্ঘ দগ্ধ দিন আরাম নাহি জানে রে/ শুষ্ক কানন পথে ক্লান্ত কপোত ডাকে করুণ কাতর গানে রে/ ভয় নাহি, ভয় নাহি/ গগনে রয়েছে চাহি/ জানি ঝঞ্ঝার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে একদা তাপিত প্রাণে রে।'

রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনা, মনে হয় শান্তিনিকেতনেরই গ্রীষ্মর বর্ণনা। আমাদের দুর্ভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ ভরতবর্ষের বিভিন্ন নগরে পদার্পণ করেছিলেন যদিও কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সুযোগ তাঁর বিশেষ হয়নি। সময়ও হয়নি। তাঁর দিশি-প্রকৃতি মুখ্যত কলকাতা, শিলাইদহ, পদ্মা এবং বোলপুরেই সীমিত। কিন্তু ঐ বিরাট কল্পনাশক্তির যিনি বাহক তাঁর পক্ষে অনেক কিছুই না দেখেও দেখা হয়তো সম্ভব ছিলো। ভাবলেও রোমাঞ্চ লাগে যে, রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর সময়ের পালাম্যুতে একবার অন্তত আসতেন তবে আমরা কত কীর্তি না পেতে পারতাম তাঁর কাছ থেকে। ছোটনাগপুর, পালাম্যু, উত্তরবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, এবং ভারতের আরও নানা জায়গাতে প্রকৃতি যে সৌন্দর্যর ডালি উজাড় করেছেন তেমন পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই বুঝি করেছেন।

পরনির্ভর আমি সারা দুপুর দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকি। বাইরে সকাল দশটা থেকে কালবৈশাখী ঝড়ের মতো প্রমত্ত উথাল-পাথাল 'লু' বয়ে যায়। তার শন্‌শনানি একবার বাড়ে আরেকবার কমে। পত্রশূন্য গাছেরা সার সার ঊর্ধ্ববাহু নাগা সন্নিসীদের মতো লাল ধুলো মেখে দাঁড়িয়ে থাকে। নিশ্চল। নবীন নিশ্চল নয়, প্রবীণ নিশ্চল। পাহাড়গুলো বে-আব্রু হয়ে যায়। তাদের শরীরের ঢেউ, জলা, নদী, নালা গহ্বর সব

প্রকট হয়ে ওঠে। প্রখর গ্রীষ্মর রাতের প্রকৃতির যে মৌন তাপস রূপ তার বুঝি তুলনা হয় না কোনো ঋতুর সঙ্গেই। হেয়ার-রিমুভার দিয়ে লোম ও অনুলোম উঠিয়ে দেওয়ার পর নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন দেখায় গ্রীষ্মর নদী নালাকেও ঠিক তেমনই দেখায়। সাদা বালির মধ্যে জলধারার কালো, ধূসর, পাটকিলে সব দাগ। রিক্ত হয়ে যাওয়া স্মৃতি।

নিঃস্ব হয় গ্রীষ্মে প্রকৃতি বর্ষায় আবার পরিপূর্ণ স্ফুরিত হবে বলে। "আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।"

এখনও তো বেরোতে পারি না। তবে খুব তাড়াতাড়ি নাকি সেরে উঠছি। ডাক্তারদের তো তাই মত। বিকেলে আমাকে দু'তিনজনে ধরাধরি করে বারান্দায় এনে বসায়। বারান্দার থামে পা তুলে দিয়ে বসে থাকি। চারদিক থেকে তখন কালি তিতির আর ময়ূর তিতির, বনমুরগী আর বটের ডাকতে থাকে ঘন ঘন। কোটরা হরিণ হঠাৎ ডাকে বুকে চমক তুলে। হনুমানের দলের হুপ্ হুপ্ হুপ্ হুপ্ হুপ্ আওয়াজ ভেসে আসে কাছের পাহাড় ও দূরের পাহাড় থেকে। কমলদহ আর পালাম্যু ফোর্টের দিকে ক্বচিৎ ট্যুরিস্টদের গাড়ি যায়। গরমে ট্যুরিস্টরা জঙ্গলে আসেন সবচেয়ে কম অথচ গরমেই জন্তু জানোয়ার সবচেয়ে সহজে ও বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। কষ্ট অবশ্য হয় একটু। সন্দেহ নেই। বিশেষ করে যেখানে জল থাকে সেখানে তো পাখি, সাপ, এবং সব রকম জন্তুরাই আসে। সে জল বানাওটিই হোক, আর কুদরতিই হোক।

আমার জ্বালাধরা চোখের সামনে রোজ সন্ধ্যে নেমে আসে। গ্রীষ্মর পত্রশূন্য গাছপালার কোটি-কোটি ডাল পশ্চিমাকাশের গোলাপি লাল কমলা বেগুনি এবং হরজাই রঙের পটভূমিতে যে আশ্চর্য সুন্দর সব কম্পোজিশন ও ফ্রেমিং গড়ে তোলে, যে অগণ্য অব্যক্ত সৌন্দর্যর নির্বাক ছবি, তা যদি দেখার চোখ সকলের থাকতো তবে সৌন্দর্য ও আর্টের সংজ্ঞা নিয়ে এমন তুমুল তর্কাতর্কির অবকাশ থাকতো না কোনো। ইম্প্রেশনিজম্, এক্সপ্রেশনিজম্, সুরিয়্যালিজম্-এর নানা তত্ত্বর চিড়বিড়ানি পৃথিবীর সব আর্টিস্ট এই সূর্যাস্তবেলায় হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন।

আমাদের স্বরগম্-এর মূল এই প্রকৃতিই, আমাদের চোখ কান ঘ্রাণ সবের মূল, তাদের জন্ম এবং প্রথম শিক্ষানবীশী, বাঘের শাবকেরই মতো ; এই প্রকৃতিতেই। প্রকৃতি জীবন-বিযুক্ত কোনো ব্যাপার নয়। এর চেয়ে বেশি জীবন-সম্পৃক্ত আর কোনো কিছু মানুষের জীবনে আছে বলে তো আমার জানা নেই।

পশ্চিমাকাশে আলো থাকে অনেকক্ষণ। শেষ আলোর রেশটুকু থাকতে থাকতেই পেঁচাদের ঝগড়া শুরু হয়। তারপর ভেসে আসে বাঘের ডাক। বাঘিনী খোঁজে বাঘ এখন। ওদের একটি মিলনকাল এই সময়টি। শুধু বাঘের বেলাতেই বা কেন, মানুষের বেলাতেও এই প্রখর গ্রীষ্ম আদর্শ মিলনকাল। এই রুদ্ধশ্বাস দগ্ধ দিনে মানুষ-মানুষীর কাম যে তীব্রতা পায় তা কোকিল-ডাকা বসন্তদিনেও পায় না। বসন্ত প্রেমের ঋতু। আর গ্রীষ্ম, কামের। অবদমিত কাম অপনোদনের ঋতু এ।

অন্ধকার আকাশে একে একে তারারা ফুটে ওঠে। শুক্লপক্ষ হলে চাঁদ। প্রখর গ্রীষ্মে চাঁদের আলো বনে পাহাড়ে ও নদীতে যেভাবে ফোটে তা অন্য কোনো সময়েই ফোটে না। বর্ষায় বনাঞ্চল ঘন বনে ঢাকা থাকে। শীতেও তাই। তার উপর শিশির আর কুয়াশায় দৃষ্টিতে এক কুহক আনে। গ্রীষ্ম রাতের বন তার সর্বস্ব দেখতে দেয়। কিছুমাত্র না ঢেকে। করৌঞ্জ ফুলের তীব্র গন্ধ ভাসে উষ্ণ হাওয়ায় হাওয়ায়। বাংলোর হাতায় হাসনুহানা, বেল, টগর, চাঁপার গন্ধ ভাসে। বনেও বুনো চাঁপা ফোটে। গ্রীষ্মর ফুলের তীব্র গন্ধে পাগল পাগল

করে মন । সাপেরাও এই গন্ধে পাগল হয়ে ওঠে । তুমি যদি আসতে কখনও আমি থাকতে থাকতে, তবে তোমাকে কোনো বিকেলে গারু থেকে মারুমারের পথে নিয়ে যেতাম মীরচাইয়া প্রপাতে । সেই প্রপাতে শীতকালেই লোকে যায় চড়ুইভাতি করতে । কিন্তু গ্রীষ্মে তার যে রূপ, যে নির্মোহ, নির্মোক-ছেঁড়া গম্ভীর ভয়াবহ জলশূন্য অস্তিত্ব ; তার তুলনাই হয় না । প্রকৃতিকে যে মানুষ সমস্ত ঋতুতেই না কাছ থেকে দেখেছে তার ঈশ্বরবোধ জাগরূক হবার কথা নয় । মঠে মন্দিরে মাথা ঠুকে আর খঞ্জনী বাজিয়ে বছরের পর বছর চব্বিশ প্রহর কীর্তন করলেও নয় ।

এখন তো নড়তে পারি না । কেঁড় বাংলোর চৌকিদার ছিলো রামলগন । ভারী ভালো লোক । আমাদের জঙ্গল পাহাড়ের সব লোকই শহরের শিক্ষিত মানুষদের থেকে ভালো ।

তাদের নষ্ট করলো রাজনৈতিক দল আর শহুরে শিক্ষিতরাই । ও এই রকমই এক গরমের দিনে যবের ছাতু দিয়ে শরবত বানিয়ে আমার পায়ের কাছে বসে কত কী গল্প করেছিলো । পায়ের কাছে বসেছিলো ভালোবেসে । ভয়ে নয় । স্ত্রী যেমন স্বামীর পায়ের কাছে বসেন । আজকালও কি বসেন ? জানি না । চোরা-শিকার আর চোরাই-কাঠ কাটা যেমন ক্ষতি করেছে প্রকৃতির, 'উইমেন্‌স লিব্‌' মুভমেন্টও তেমনই ক্ষতি করছে নারীত্বর । আজ হয়তো তুমি চটে যাবে এ কথাতে কিন্তু একদিন বুঝবে আমার এই কথা কতখানি সত্যি ।

পুরুষ আর প্রকৃতির নিজ নিজ সম্মানিত আসন বিধাতাই ঠিক করে দিয়েছিলেন একদিন । কেউ কারো চেয়ে ছোট এ কথা তাঁর বিধানে ছিলো না । পুরুষ তার নগ্ন স্বার্থপরতায় নারীর উপর দীর্ঘদিন অনেকই অত্যাচার করে এসেছে । সন্দেহ নেই । তাই হয়তো আজকে নারীর সমানাধিকারের জন্যে আন্দোলন করার সময় এসেছে । কিন্তু দেখো, আমার অভিজ্ঞতা বলে যে, যে নারী প্রকৃতই স্বাধীন, মুক্তি যার কাছে কথার কথা নয়, ধ্রুব সত্য ; সেই সবচেয়ে বেশি করে পুরুষের কাছে ছোট হতে চায়, সমান হতে নয় । জানি না, আমার দেখায় হয়তো ভুল আছে । তা ছাড়া, আমার অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু ! তুমি প্রকৃতার্থে স্বাধীন কোনো নারীকে আমার এই চিঠি পড়িয়ে তাঁর মত নিয়ে জানিও আমাকে । যে স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় এবং ভালোবাসায় পাওয়া, যে স্বাধীনতা অন্যকে নির্দ্বিধায় সঁপে দেবার মুক্তি দেয় নারীকে, সেই তো আসল স্বাধীনতা । তাই না ঋতি ?

রামলগনের কথা বলছিলাম । সেদিন কেঁড়-এ বিকেলে পৌঁছে আমার জীপ খারাপ হয়ে গেছিলো । সার্ভিসের বাসে খবর পাঠিয়েছিলাম বেতলাতে ফ্যান বেল্ট নিয়ে আসতে । ফ্যান বেল্ট ছিঁড়ে গেছিলো । পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারা জ্বলজ্বল করছিলো । আমরা দুজন অন্ধকার বারান্দায় বসেছিলাম । পেছনের বারান্দায় । তখনও নতুন বাংলোটা হয়নি । সার সার জ্যাকারাণ্ডা গাছের বেগুনি রঙা ফুল শেষ সূর্যের লাল ম্লানিমা আঙুল ছুঁইয়ে বিদায় নিয়েছিলো । পূবের আকাশে দুম্বি পাহাড়ের চুড়োর উপর একটি আলো দেখা যাচ্ছিলো । যেন মস্ত একটি তারা । এ অঞ্চলে প্রথম আসা মানুষ চমকে যাবে হঠাৎ দেখে ঐ আলোকে । রামলগন আমার কাছে বসে নিজের মনে কত কথাই বলে যাচ্ছিল । ওরা যে প্রকৃতির সন্তান । আমার সব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জড়ো করেও যে ওদের জ্ঞানের নাগাল মেলে না ।

ঐ পাহাড়ে পৌঁছতে হলে পাহাড়ে পাহাড়ে পায়ে হেঁটে কত জায়গাই না মাড়িয়ে যেতে হবে । ডুংরী, জেরুয়া-জ্‌গতু গ্রাম, বাঁকিপিপড়া, তুমার, কোপে, লাক্কা-কোপে, কত কী সব জায়গা । অন্ধকার গ্রীষ্ম রাতে তারা-ভরা আকাশে চেয়ে আমি ভুলে গেছিলাম আফ্রিকার

তানজানিয়াতে আছি না ভারতের এই অংশে। রামলগনের চেহারাটা, বিশেষ করে **TORSO** কিন্তু হুবহু আফ্রিকানদেরই মতো। এই প্রকৃতি, এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর ছেলেমেয়ে এই আমরা আসলে একই। আলাদা ভাষায় কথা বলি, আলাদা দেশে থাকি, সমুদ্র পেরিয়ে যাওয়া-আসা করতে হয় উঠোন পেরুনোর মতো ; এই যা।

ঋতি, একবার আসবে না গ্রীষ্মের পালাম্যুতে ? তবে এখন এসো না। আমি ভালো হয়ে উঠি তারপর।

ভালো থেকো।

ইতি—তোমার বিবেক

* * *

ঋতি রায়
বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯

হাটিয়া, রাঁচী

ঋতি,

বহুদিন হলো কোনো চিঠিপত্র পাই না।.আমি কলকাতা যাচ্ছি আগামী সপ্তাহে। তোর কাছে একটি উইক-এন্ড থাকবো। সম্ভবত সামনের উইক-এন্ড। কোনো কাজ রাখিস না।

আমি আর আমার স্পিৎজ কুকুর একই দিনে প্রেগন্যান্ট হয়েছি। অবশ্যই তোর কাকা তাকেও প্রেগন্যান্ট করেনি। তার বর এসেছিলো গাড়ি করে রাতু রোডের এক মিলিটারী অফিসারের বাংলো থেকে। অনেক খুঁজে তবে বনেদী ঘরের বর মিললো। কুকুরদের এবং হয়তো অনেক জন্তুদেরই এবং হয়তো কিছু মানুষদেরও ব্যাপার স্যাপারই আলাদা। তাদের স্বামীদের একমাত্র কাজ, পুরনো দিনের কুলীন জামাই-এরই মতো ; শুধুমাত্র স্ত্রীদের প্রেগন্যান্ট ক্‌রে দেওয়া। একটু ভালোবাসা নেই, রোম্যান্স নেই, আদর নেই, ভাবাবেগ নেই ; আত্মমগ্ন উচ্চম্মন্যতায়-ক্লিষ্ট "আধুনিক" গদ্যর মতোই যেন। একটিও বাড়তি শব্দ থাকবে না, ভুল-করা চুমু থাকবে না, শুধুই উষর গদ্যময় ক্ষুব্ধ টানটান "মেদহীন" বাংলার মতো উৎসুক উর্বর গর্ভে উৎসারিত ঔরসের অতি দীন দাদন। এর চেয়ে বোধহয় দাদের চুলকুনিও অনেক বেশি রোম্যান্টিক এবং আনপ্রেডিকটেবল। জানি না বাবা।

আনপ্রেডিকটেবিলিটি এবং আনরোম্যান্টিসিজম আমার ঘৃণার। জীবনের সব ক্ষেত্রেই আমি একটু মেদ বিলাসী।

এই মাসের ডেট মিস করেছি। অতএব কনফার্ম হলাম। ভালো লাগছে খুব। জানিস। আবার খারাপও লাগছে।

প্রেম একটা স্টেজ ; তারপব বিয়ে একেবারেই অন্য। অনেকে ভাবে প্রেম গড়িয়ে গিয়ে বিয়েতে পৌঁছোয়। একেবারেই নয়। প্রেম লাফাতে লাফাতে অতর্কিতে বিয়ের গর্তে গিয়ে পড়ে রাবারের বল-এর মতো। বিবাহিত মাত্রই জানেন এ কথা। দু'রকমের মানুষ থাকে এখানে। জীবিত। এবং বিবাহিত। অবশ্যই প্রেম ছাড়াও বিয়ে হতে পারে। তবু বিবাহিত জীবন একটা অন্যরকম জীবন। কিন্তু প্রেগন্যান্ট হয়েই বুঝতে পারছি যে আরও অন্যরকম এক জীবনের দিকে গুটি গুটি এগোচ্ছি। মা হয়ে যাবার পর আবারও অন্যতর জীবন।

সত্যি ! একই জীবনে কত যে স্তর থাকে ! কিছুটা উত্তেজিত বোধ করছি আবার কিছুটা ভীতও । মা কড়া করে চিঠি দিয়েছেন যেন জামশেদপুরে এখুনি চলে যাই এবং বাকি সময়টা ওঁর কাছেই থাকি । আমি বলেছি, তার আগে কলকাতায় মা হওয়ার আগের শেষ আড্ডা একবার মেরে তারপরই যাব । ছেলেদের স্ট্যাগ-পার্টির মতন । তুই কিন্তু কুঁড়ি, অরা, চিকন আর বৃষ্টিকে খবর দিয়ে রাখিস । ভুলে যাস না । আমরা স্কাইরুমে একদিন সকলে মিলে খাবো । আমিই খাওয়াবো । কত্বদিন দেখি না ওদের ! শুনেছি, বৃষ্টি এখন তিন বাচ্চার মা হয়ে ভরা ভাদ্রতে পৌঁছেছে । একদিক দিয়ে ভালো । বল ? যা হবার তাড়াতাড়ি পরপর হয়ে গেলে পরে ঝাড়া হাত-পা । ইটার্নালে হনিমুন । বাচ্চারাও কম্পানী পায়, লোনলি ফীল করে না । একসঙ্গে দু-তিনটেকে মানুষ করার ঝক্কি অনেকই আছে বটে তবে রয়ে রয়ে মুরলী বাজানোর চেয়ে তা অনেক ভালো । আমার অন্তত তাই মত । জানি না, তুই কি বলবি !

যাক । গেলে তো অনেক আড্ডা হবে । তাই চিঠি শেষ করি । তোর কাকা খুব নার্ভাস । পুরুষগুলো বেশ আছে । সুখটা ওদের আর ফোঁড়াটা আমাদের । বুড়ো বয়সে বাবা হচ্ছে তাতেও এতো নার্ভাস হবার কী আছে জানি না ! বেশি বেশি । কেবলই বলে, সব সুখ-শান্তি, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানো এবার লাটে উঠলো । স্কুলে ভর্তি করাবার সমস্যার কথা ভেবেই নাকি তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ।

আমি কিন্তু সেজারিয়ান করবো না । আমাদের পাশের বাংলোর মীরাদি বলেন যে, যে-মায়েরা বাচ্চা হওয়ার কষ্টটুকুও স্বীকার করতে রাজি নন তাদের বাচ্চারা মাকে ভালোবাসে না । অথচ দ্যাখ আমার কুকুর টিনার তো ন্যাচারাল ডেলিভারিই হবে কিন্তু তার অগুনতি বাচ্চার একটি বাচ্চাও থাকবে না শেষ পর্যন্ত তার কাছে । নিয়ম-কানুন হিসেব-নিকেশঃ সব কেমন যেন গোলমেলে । মাতৃত্বর নানারকম আছে । মানুষের মধ্যে, জীব-জন্তুর মধ্যে ।

আজ শেষ করি ।

তোর শ্রুতি

॥ ফিরে ॥ মোৎজার্টের জীবনী নিয়ে যে ছবিটা হয়েছে তার ক্যাসেট জোগাড় করে রাখিস । দেখব ভি সি আর-এ । আর জিম করবেট-এর উপরে বি বি সি একটি ফিল্ম করেছিলো, তার ক্যাসেট কি পাওয়া যাচ্ছে ? পেলে, যোগাড় করে রাখিস । তোর অরণ্যদেব-এর কি খবর ? অশেষ কেমন আছে ? তুই যেমন ঢিমে-তেতালাতে বাজাচ্ছিস তোর জীবন, তাতে মনে হচ্ছে জীবন যেন নিরবধিকালের । তোর ব্যাপার তুই-ই জানিস । ঐ অরণ্যদেবই মাঝে পড়ে অশেষকে তোর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে । আমার মনে হয় । যাকে সত্যিই ভালবাসবি, ভুলেও তাকে বিয়ে করিস না । সে অশেষই হোক কী অরণ্যদেব ! লাইফে বোরড হয়ে যাবি তা হলে আমার মতো—টু ইওর বোনস্ । জীবনটা মুচমুচে রাখতে স্বামী ছাড়াও অন্তত অন্য একজন পুরুষ থাকা উচিত সব মেয়েরই জীবনে । যে বেশ থিয়েটারী ডায়ালগ দেবে, নেকুপুষুমুনু সুণ্টুনি মুণ্টুনি সেন্টিমেন্টাল ভাব দেখাবে, চোখের পাতায় চুমু খাবে, তোকে নিয়ে দুর্বোধ্য আধুনিক কবিতা লিখবে, তোর জন্যে যে-কোনো সময় আত্মহত্যা করতে তৈরি বলে দু'বেলা প্যানপ্যান করবে (আসলে আদৌ করবে না) এই রকম একজন লোক । তুই বললে যে পাঁচ মাইল দূর থেকে কচি পাঁঠার মাংস, ইংল্যান্ড থেকে লেডি-স্পীড স্টিক বা ক্রীশ্চান-ডায়রের লিপস্টিক বা কার্টিয়ারের পারফ্যুম নিয়ে আসবে, ছাগল ছাগল ভাব করে গুঁতো মারবে তোব বুকে পেটে শিং দিয়ে

এমন বিষদন্তহীন এলেবেলে সাপ হবে যে, যাকে নিয়ে খেলে মজা কিন্তু ছোবলের ভয় থাকবে না আদৌ।

আমি সময় থাকতে ভাবিনি। এমন ঢোঁড়া সাপ খুঁজতে বেরুতে হবে আমাকেও। বেটার লেট দ্যান নেভার। তোর হাতে একস্ট্রা থাকলে এনডোর্স করে দে না আমাকে একজন? প্রিলিমিনারি ইন্টারভ্যুটা তা হলে নিয়ে রাখতে পারি। যখন কলকাতায় যাবো।

শ্রু।

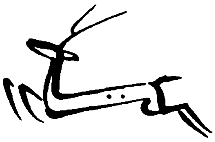

বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা

ওরে শ্রুতি পাগলি,

কনগ্রাচ্যুলেশানস! তোর খবর শুনে কী ভালো যে লাগছে কী বলব! উ্য আর গোয়িং টু বী সীনিয়র টু আস বাই ওয়ান জেনারেশান।

আয়। আয়! শিগগিরি আয়। তোর জন্যে যদুবাবুর বাজার থেকে আচার কিনে নিয়ে আসব। ভাবতেই মজা লাগছে যে সদ্য গর্ভিনী বান্ধবীর জন্যে যদুবাবুর বাজারের দাঁড়ি-গোঁফওয়ালা সর্দারজী আচারওয়ালার কাছ থেকে আচার কিনতে হবে। কী অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স!

চলে আয়। তারপর অনেক কথা হবে। নোপ্। অশেষও নয় অরণ্যদেবও নয়। আমি স্বাবলম্বী হয়ে একাই থাকবো বাকি জীবন। বড়লোক এবং বলশালী পুরুষমানুষ যেমন আদিম কাল থেকে মেয়েদের রক্ষিতা রেখেছে, ব্যবহার করেছে আর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে; আমিও তেমন "রক্ষিত রাখবো। (সরি! সুমন রক্ষিতকে আবার এ কথা বলিস না, তার পদবীর জন্যে কেস করে দিতে পারে আমার নামে।)

বাঙালি ছেলেদের যা অবস্থা হচ্ছে দিনকে দিন তাতে দেখবি আমার বাড়ির সামনে উইক-এন্ডে লাইন লাগাবে। পনেরোটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে একটাকে পছন্দ করে অন্যগুলোকে অপমান করে তাড়িয়ে দেব। তারপর সেই একটাকেও প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই টাকা মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলব, তোমার ব্লু জিনস-এর মধ্যে ঠ্যাং দুটো গলিয়ে নিয়ে, বুকের চুল-দেখানো জামাটি গায়ে দিয়ে এক্ষুনি কেটে পড়ো। সে (এমন কত শত হতভাগাকেই ভোগে লাগাবো দেখিস) দু'হাতের মুঠোর মধ্যে টাকাটা নিয়ে চোর-চোর মুখে বলবে, আমাকে একটু দেখবেন ম্যাডাম। পরের শনিবার কি আসব আবার? তারপর কান্না-কান্না গলায় বলবে, কেউ যেন না জানে যে আমি শরীর বেচে খাই। আফটার-ওল আমি শিক্ষিত। পাড়ায় আমাকে সকলেই রেসপেকটেবল বলে জানে।

হিঃ হিঃ। আমাকে কত্ত জন্ম-জন্মান্তরের বৈদেহী, অসহায় নারীদের মিছিল আশীর্বাদ করে যাবে বল তো দু'হাত তুলে? কত লক্ষ নারীর অপমানের অমর্যাদার প্রতিশোধ তুলবো আমি দেখিস। কত পুরুষের কৌমার্য নষ্ট করব তার লেখাজোখা নেই। মিছিলের মুখে শ্লোগান উঠবে যুগ যুগ জীও। যুগ যুগ জীও।

কী যে তুই ফস্স্ করে বিয়ে করে বসলি! তুই একটা রিয়্যাল ফস্। তাও আবার আমার কাকার মতো একজন হাঁদা মানুষকে। অবশ্য বিয়েই যদি করতে হয় তো দেখে-শুনে হাবা-গোবাই করা ভালো। বেশ করেছিস। বেশি এলেমদার স্বামী নিয়ে সংসার করার

অনেক বিপদ। চারপাশে যা দেখি তা দেখেই বলছি।

চলে আয়।

ইতি তোর ঋতি

রাজর্ষি বসু
বেতলা, পালামৌ

বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা

রাজর্ষি প্রীতিভাজনেষু,

চিঠি পেয়েছি গ্রীষ্মবনের মনের কামনা ভরা।

কেন যে অমন চিঠি লেখেন তা জানি না। জ্ঞান আমারও কিছু কম নেই। আপনার মতো অবলীলায় তা বিতরণ করতে পারি না এই যা। অবদমিতকাম সব যুবক-যুবতীই বয়ে বেড়ায় কিন্তু যেখানে-সেখানে তার অপনোদন বা পরিপ্লুতী (আপনি "অপনোদন" বলেছেন, আমি বলব "পরিপ্লুতী"।) তো সম্ভব নয়। এবং সেইটেই দুঃখের। অথবা আনন্দের। তবে মিথ্যে বলব না, আপনার চিঠিগুলি আমার জীবনের অন্যতম প্রাপ্তি। আপনার জীবনের উচ্চাশা যদি টাইগার-সেভিং না হয়ে লেডি-কিলিং হতো তবে শুধু চিঠির ছররা দিয়েই আপনি অনেক মেয়েকে সহজে বধ করতে পারতেন। এবং অনেক মেয়েই ছুরি, রিভলভারে বা ধর্ষণে মরার চেয়ে চিঠিতে মরতে ভালবাসে। মস্ত ভরসার কথা এই যে বিধাতা যাকে মারণ ক্ষমতা দেন, অমিত-শক্তিশালী করে এ ধরাধামে পাঠান, তাকে হননের মানসিকতা আদৌ দেন না। তাঁর হাত দিয়ে সৃষ্টি বিনাশ না করিয়ে স্থিতিই সুদৃঢ় করেন। উ্যা মাস্ট কাউন্ট ইওর ব্লেসিংস মিস্টার রাজর্ষি রায়।

শ্রুতি আসছে এখানে আগামী সপ্তাহে। আগামী সপ্তাহের শনি-রবি থাকবে আমার কাছে। চলে আসবেন নাকি? খুব ভালো পোলাউ খাওয়াব আপনাকে। আমার এক বন্ধুর কাছে 'তাহেরি' রাঁধতে শিখেছি। খেয়েছেন কখনও? যদি আসতে পারেন তা হলে দেড়দিনে আমার যাবতীয় গুণপনা সম্বন্ধে একটি কনডেনসড কোর্স করে যেতে পারতেন! আমাদের বাড়িতে দুটি একস্ট্রা এয়ারকন্ডিশনড বেডরুম আছে। কোনো সময়ে এলেই আপনার অসুবিধে হবে না।

পা কেমন?

তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠুন। এমন গরমের সময়ে এমন বিচ্ছিরী অসুস্থতার কথা ভাবলেও গা-ঘিনঘিন করে। মানুষের হাত-পা-ভাঙে ছেলেবেলায়! মন-ভাঙার বেলায় এসব কী! শুনতেও ভালো লাগে না।

আব্রাকাডাব্রা-গিলিগিলিগিলি-হোকাস্-পোকাস্। রাজর্ষি বসুর পা কুইকলি ফাস্কেলাস্।

—ইতি—প্রীতিধন্যা, ঋতি

ঋতি রায়
কলকাতা

হাটিয়া, রাঁচী

ঋতি,

আগামী সপ্তাহে যেতে পারছি না। তার পরের সপ্তাহে যাব। মা বলেছেন জামশেদপুরে সাতদিন থেকে তারপর যেতে। শৈশবের পর বিবাহিতা কন্যা যখন গর্ভবতী হয় তখন তাদের উপর মায়েদের হারানো এক্তিয়ার বোধহয় হঠাৎ ফিরে আসে। এবং এলেই তাঁরা প্রচণ্ড বিক্রমে সেই এলাকার জবরদখল নেন। এই "জোত"-এর মালিকানা নিয়ে শাশুড়ীরাও উচ্চবাচ্য করেন না কোনো। এইটা বেশ মজার লাগে।

তোর কাকা ক'দিন হলো নাইট ডিউটি করছে। বোধহয় দিনের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী তাপ থেকে বাঁচতে। ফলে যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণই কুম্ভকর্ণ (রামায়ণ সিরিয়ালের এফেক্ট) হয়ে থাকে। তাকে হয় ঘুমোতে দেখি, নয় খেতে, নয় পোশাক পরতে।

জানি না হঠাৎ নাইট ডিউটির ভক্ত হয়ে পড়লো কেন। অনেকে কারখানায় ফোন করে (পুলিশের ডি আই জি-রা যেমন টেলিফোনের মাধ্যমেই এস পি-দের কন্ট্রোলে রাখেন বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা যেমন এস ডি ও-দের) স্বামীদের 'রাহান্-সাহান' 'খাল-খরিয়াত' সম্বন্ধে তত্ত্ব-তালাশ করেন। এখানের প্রত্যেক মহিলার সঙ্গেই প্রত্যেকের যোগাযোগ আছে যাতে স্বামীদের বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত এফেক্টিভ স্পাই নেট-ওয়ার্ক অনুক্ষণ সজাগ থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা মীরজাফরের জাত বলেই কিছু স্পাই কাউন্টার-স্পাইং করেই বান্ধবীর স্বামীর সঙ্গে "Face-down, hips-up" খেলাতে মেতে Egg-jam-এ পড়েন। কী কেলো বল? আমরা যত দোষ দিই পুরুষদেরই! দুশ্চরিত্র, লম্পট, ঘর-ভাঙানো, বৌ-ভাগানো, নচ্ছার ইত্যাদি বলি কিন্তু এই সব দুষ্কর্মের অথবা সুকর্মের জন্যে তো আমরাই কেউ কেউ তাদের পার্টনারও হই। এক হাতে তো আর তালি বাজে না! ইন.দ্য রিসেন্ট পাস্ট, আমাদের কলোনীতেই একজন মহিলা, যিনি একজন বদনামী পুরুষের সবচেয়ে বেশি বদনাম চিরদিন করেছেন সব জায়গাতে, সর্বক্ষণ, ধরা পড়েছেন রেড-হ্যান্ডেড সেই পুরুষেরই সঙ্গে মহিলারই বাংলোতে এবং তাঁরই বিছানায়।

বুঝি না! তবে এ কথা অবশ্যই বলব যে মহিলা একটি ইডিয়ট। যা বলি, ভালো করে মনে করে রাখ ঋতি। কখনও যদি গোলমেলে কিছু করতে হয় জীবনে (সকলেই কম বেশি করেই, কারণ, জীবন এ রকমই, যারা বলে "করে না" তারা হয় মিথ্যেবাদী নয় সুযোগ পায়নি। সাহসেও কুলোয় না অনেকের)। "অপকর্ম" করতে হলে সব সময়ই পুরুষের ডেরাতেই যাবি। ধরা পড়লে বা ধরা পড়ার সম্ভাবনার উদ্রেক হলেই ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার শুরু করবি। কেঁদে বলবি, তোকে জোর করে…অসভ্য! বর্বর! কেঁদে বলবি, বাড়িতে কি মা বোন নেই? বড় বড় নিশ্বাস ফেলবি, চুল এলো করে মাথা দু পাশে নাড়াবি। এ পাশ ও

পাশ। পায়ের কাফ-মাসল অবধি শাড়ি তুলে আগন্তুকদের দেখাবি, তার বেশি নয় ; তারপর দেখবি সেই ইডিয়ট অথবা মন্দভাগ্য পুরুষের কী অবস্থাই না হয় অন্য পুরুষদের হাতে ! আসলে এ দেশের অধিকাংশ পুরুষই যে সেক্স-স্টার্ভড। বিবাহিত অথবা অবিবাহিত। বিবাহিতদের খিদে জাগিয়ে রাখার জন্যে অবশ্য আমরাই দায়ী। কারণ খিদে মারতে জানি না আমরা সম্পূর্ণভাবে। আর পেটে খিদে থাকলে পরের বাগানের আম জাম চুরি তো ছেলেরা করতেই পারে ! কেন যে পারি না তা নিয়ে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন আছে। ক্লোজড-ডোর সেমিনারেরও। আমরা স্বীকার করি আর নাই করি আমাদের নিশ্চয়ই কোনো ঘাটতি আছে এ ব্যাপারে,নইলে নব্বুই ভাগ বিবাহিত পুরুষেরই এই অভিযোগ কেন ? এতো "খাই খাই" কেন সব সময়ে ? এও অবশ্য হতে পারে যে যেহেতু পুরুষমাত্রই স্বভাবে পলিগ্যামাস তারা কোনোদিনও এক নারীতে সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু নয় বলেই তো আমাদের "রণং দেহি" মূর্তি ধরে দশভুজা হয়ে পাঁচজনের ভূমিকা একই দেহে মনে পালন করা উচিত। তা আমরা করি না, রুচিতে, অহং-এ এবং হয়তো সংস্কারে বাধে বলেই ভণ্ড এবং অনাচারী অভিনেতা স্বামীদের নিয়ে ঘর করতে হয়।

যা বলছিলাম, অধিকাংশ পুরুষই সেক্স-স্টার্ভড বলে যে হতভাগা মণ্ডা মিঠাই খেতে পাচ্ছে তাকে ধরে ক্ষুধার্ত ভিখিরিদেরই মানসিকতায় বেধড়ক পেটাই দেয় অন্য পুরুষেরা। একা ঘরে তাদের প্রত্যেককে সুযোগ দিলেই, উদ্ধার যাকে করলো তাকেই ধর্ষণ করতো সেই হীরোরা প্রত্যেকে বিনা বাক্যব্যয়ে। পুরুষগুলো অধিকাংশই জানোয়ার। তোর অরণ্যদেব-এর জুরিসডিকশনেই তাদের পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। পুলিশ অথচ ভদ্রলোক যেমন অতি কম দেখা যায়, পুরুষ অথচ ভদ্রলোকও ঠিক তাই। সুযোগ পেলেও এ ব্যাপারে বিবেকহীন হয়ে সেই সুযোগ নেয় না এমন যোগী পুরুষ বড় একটা দেখাই যায় না।

এ নিয়ে কেন যে এতো বক্তৃতা করলাম তা জানি না কারণ তিরিশ বছর বয়স হয়ে গেছে অথচ এই বুনো কুকুরদের সম্মুখীন কখনও না কখনও হতে হয়নি এমন কোনো মেয়ে সারা পৃথিবীতেও বোধহয় একজনও নেই। এদের গতি সর্বত্র, বেহুলা-লখীন্দরের বাসর ঘরেও এরা সূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ করতে পারে। সাপের চেয়েও ঘিনঘিনে, যাচ্ছেতাই এই জাত। এবং সে কারণেই অরণ্যদেবের মতো কারো সংস্পর্শে দৈবকৃপায় এলে মন এতো প্রসন্ন লাগে। যাই বলিস, আমার বিয়ে না হয়ে গিয়ে থাকলে এবং তোর কাকার সর্বনাশ না করতে হলে তোর সঙ্গে একহাত লড়ে যেতাম।

অশেষের কি হলো ? ভয়ে কি ওয়াক-ওভার দিয়ে দিলো ? নাকি অন্য কিছু ?

ভালো থাকিস। আগামী শনিবারের পরের শনিবার পৌঁছচ্ছি। মামাবাড়িতে ফোন করিস সকাল এগারোটা নাগাদ। গিয়েই চান করতে হবে তাই। পৌঁছে তো যাবো আগেই। এসি-কোচ থেকে নেমেই গরম লাগে সবচেয়ে বেশি। পাগল-পাগল লাগে। কিন্তু যাই বলিস, বেশ লাগে। ঠাণ্ডা কামরায় বসে রঙিন কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখা ধুলিমলিন, ক্লিষ্ট নারী-পুরুষের মৌন মিছিল। অন্যর যা নেই নিজের তা থাকার মধ্যে বেশ এক ধরনের শ্লাঘা আছে। আমি যে অন্যদের চেয়ে আলাদা, তোর কাকা যে আমাকে এক বিশেষ নিরাপত্তা, সম্পদশালী সুখের জীবন দিয়েছে এই কারণে এক ধরনের কৃতজ্ঞতা বোধ জন্মে গেছে তোর কাকার প্রতি। অনেক স্ত্রীরাই এই বোধকেই বিবেক বলে জানেন। কিন্তু বিবেক এ নয়। এ বড়লোকের বাড়ির মার্বেলের বারান্দায় সোনার দাঁড়ে ঝুলিয়ে রাখা ছোলা আর দানা আর জল দেওয়া টিয়া পাখির বশ্যতা। বশংবদ-বোধ। এ বিবেক নিশ্চয়ই নয়।

যাকগে। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি। এবার থামি।

মাঝে মাঝে সবাইকেই কথায় পায়। যেমন আরও অনেক কিছুতেই পায়, যার

অধিকাংশকে উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারা যায় না। তবে যাতেই পাক তা দমন করে রাখতে নেই। প্রকাশ করে, মোচন করে, স্খলন করে দেওয়াই ভালো। নইলে শরীর এবং মন দুইয়েরই সমূহ ক্ষতি।

ইতি—শ্রুতি

* * *

ঋতি রায়, কলকাতা

বেতলা, পালামৌ

পুলাউ-সোহাগী ঋতি,

'তাহেরী' পুলাউ খাইনি কখনও। তবে মায়ের কাছে শুনেছিলাম, বহরমপুরে থাকাকালীন বাবার পরিচিত এক ভদ্রলোক, অনুপম ভট্টাচার্যর স্ত্রী অতি উত্তম 'তাহেরী' রাঁধতেন। তবে 'তাহেরী' কি পুলাউ-এর প্রজাতির মধ্যে যথার্থই পড়ে? খোঁজ নিও। তোমার সঙ্গে আরেকটা ব্যাপারে মিল খুঁজে পাওয়া গেলো। উমদা পুলাউ-এর খুশবু আমাকে যতখানি খুশি করে ততখানিই খুশি করে এই গ্রীষ্মবনের করৌঞ্জ ফুলের গন্ধ। আবদুল হালিম শরর্ সাহেবের বইয়ে নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ সাহেবের সময়ের লক্ষ্ণৌ শহরে পুলাউ-এর বিচিত্র রকমের বর্ণনা আছে। তারও অনেক দিন আগের কথা, জাঁহাপনা আকবরের সময়ে যে কতরকম পুলাউ ইস্তেমাল হতো বাওয়ার্চিদের আর হারেমের বেগমদেরও দ্বারা তার ফিরিস্তি পড়লে জিভে জল গড়ায় আমার। আবুল ফজল—তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' বইতেও বিভিন্ন রকমের বর্ণনা ও রন্ধনপ্রণালী উল্লেখ করেছেন। আবুল ফজল-এর বই তো লেখা শেষ হয়েছিলো ষোলোশো দুই খ্রীস্টাব্দে। শেষ ঠিক হয়নি, সেই ঘৃণ্য রোগ ঈর্ষা কবলিত হয়ে আকবর-পুত্র সেলিম তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে বুন্দেলার রাজা বীরসিংহ বুন্দেলাকে দিয়ে গোয়ালিয়রের কাছে আবুল ফজলকে চক্রান্ত করে হত্যা করিয়েছিলেন। ষোলোশো দুই খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাসে। ঈর্ষাকারীকে মানুষ ভুলে গেছে সহজেই। কিন্তু প্রায় তিনশো বছর পরেও আবুল ফজল অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন আরও হাজার বছর। যে থাকার সে থাকেই। তার পেছনে লেগে, তাকে অপমান অসম্মান করে, নানাভাবে তাকে হেনস্থা করে এমন কি তাকে হত্যা করেও তার কীর্তিকে মোছা যায় না। কীর্তি মোছার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় কীর্তি দিয়েই তাকে মোছা। যাঁরা তা পারার যোগ্যতা রাখেন না তাঁরাই চোরাগোপ্তা খুন এবং চরিত্র হনন করে প্রতিযোগীকে মুছে দিতে নিষ্ফল চেষ্টা করেন।

"THE HISTORY OF HINDUSTHAN DURING THE REIGNS OF JAHANGIR, SHAHJEHAN AND AURANGJEBE" বইটি লিখেছিলেন ফ্রান্সিস গ্লাডউইন। সতেরোশো অষ্টাশীতে 'আইন-ই-আকবরীর' এই ইংরিজি অনুবাদ কলকাতা থেকেই প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর তৎকালীন বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস লন্ডন থেকে সেই বইটি প্রকাশের বন্দোবস্ত করেন।

গ্লাডউইনের অনুবাদ সকলের মনঃপূত ছিলো না, তবে একটি কাজের মতো কাজ তো করেছিলেন। ইংরেজনবিশ আমরা ইংরিজিতে লেখা না হলে তো পড়তেই পারতাম না। গ্লাডউইনের পর H. BLOCHMANN এবং H.S. JARRET অন্য অনুবাদ প্রকাশ করেন। সেগুলি অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। BLOCHMANN-এর বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় আঠারোশো তিয়াত্তরে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে আঠারোশো একানব্বুই এবং চুরানব্বুই খ্রীস্টাব্দে। অনুবাদক H.S. JARRET. প্রকাশক কে জানো?

তোমাদের কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি। সেই সোসাইটির কী হালই করেছো তোমরা, বর্তমান পশ্চিমবাংলার রাজধানীর সব ফাঁকা আঁতেল আর রাজনীতি-নির্ভর মানুষেরা মিলে। তোমাদের লজ্জা রাখার জায়গা নেই। পস্টারিটি, ইতিহাসের প্রতি, বিদ্যার প্রতি, শিক্ষার প্রতি, জ্ঞানের প্রতি এই অশিক্ষিত মনোবৃত্তি ও ব্যবহার কোনোদিনও ক্ষমা করবে না।

H.S. JARRET সাহেবের বইটি পরে স্যার যদুনাথ সরকারের ভূমিকা সম্বলিত হয়ে এবং "CORRECTED AND FURTHER ANNOTATED" হয়ে প্রকাশিত হয় উনিশশো আটচল্লিশ এবং উনপঞ্চাশ খ্রীস্টাব্দে। পারলে, এর একটি কপি কিনে রেখো। পেলে, আমার জন্যেও একটি জোগাড় করে রেখো, দাম আমি দিয়ে দেব। বই, ওষুধ আর টিউশান বিনি পয়সায় নিলে কাজে লাগে না কোনো।

কথা হচ্ছিলো পুলাউ-এর, সেখান থেকে এসে গেলো আকবর, আবুল ফজল, ব্লকম্যান, গ্লাডউইন, জ্যারেট, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং স্যার যদুনাথ সরকারের কথা। এ পুলাউ কেমন খেতে হবে জানি না। তবে বলছি শোনো।

কাবুলী পুলাউ—কী করে রাঁধতে হয়? সাত সের মাংস, তার আদ্ধেক পরিষ্কার মাংসের কাথ (জগ-সূপ যে ভাবে তৈরি করতে হয় সেই ভাবে তৈরি করতে হবে, এতে জলের ছোঁয়া পর্যন্ত লাগবে না) তাতে সাড়ে তিন সের ঘি, এক সের ছাড়ানো নাখোদ, দু সের পেঁয়াজ, আধ সের নুন, একপোয়া কাঁচা আদা, গোলমরিচ, দারচিনি ও ছোট এলাচ এক দাম (দাম বোধহয় ছটাক হবে, ঠিক জানি না) গোলমরিচও একদাম। এর সঙ্গে কিসমিস, বাদাম এবং অল্প পেস্তা আন্দাজমতো। এই পুলাউ সিদ্ধ করার সময় যদি টেনে যায় তবে জল না দিয়ে বেদানার রস দিতে হবে।

বাখ্‌রা পুলাউ—দশ সের মাংস, তিন সের ফুল-ময়দা (ফুল-ময়দা মানে কি জানি না, নিশ্চয়ই ফুলের মতো ময়দাই হবে), দেড় সের ঘি, এক সের নাখোদ, এক সের মিছরী, দেড় সের ভিনিগার, একপোয়া পেঁয়াজ, একপোয়া বিটপালং, একপোয়া শালগম, আদা একপোয়া, জাফরান, ছোট এলাচি, বড় এলাচি, দারচিনি এবং কচি মটর এক সের। আপাতত এই দুটি রেসিপি দিলাম। প্রোপোরশনেটলি মাপ কমিয়ে অল্প জনের জন্যে রান্না করে দেখতে পারো। তবে আমি না খেলে তো নাম্বার দিতে পারবো না। আরও অনেক রকম পুলাউ-এর বর্ণনা আছে। প্রয়োজন হলে লিখো, জানাবো। কিন্তু এ পুলাউ যাঁরা খাবেন তাঁদের উপর কী এফেক্ট হবে তা বলতে পারি না। নবাবদের তো হারেম ছিলো। এবং হারেমে বাসিন্দারাও যে সব সময়েই খোজা প্রহরী পরিবৃতা হয়ে থাকতেন এমনও নয়। ফলাফল অশুভ হলে আমার কোনো দায়-দায়িত্ব থাকবে না যে তা আগেই জানিয়ে দিচ্ছি।

উনিশশো খ্রীস্টাব্দে গ্লাডউইনের আইন-ই-আকবরীর ইংরিজি বইটির একটি বঙ্গানুবাদ বের করেন বসুমতী সাহিত্য মন্দির। অনুবাদক শ্রী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। সে বই নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না এখন। তবে খোঁজ করে দেখো অ্যান্টিকুয়ারিয়ান বুকশপে, পেলেও পেতে পরো। ঐ বই পুনঃ প্রকাশিত এতোদিনে হওয়ার কথা। না হয়ে থাকলে দুঃখের। বইপাড়াতে খোঁজ কোরো। পুলাউ যদি আদৌ রাঁধো, এবং রাঁধলে কাদের তা খাওয়ালে জানিও। তোমার 'তাহেরী' কোনোদিন নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াবে এমন আশাতেও রইলাম।

আমি আর সাতদিনের মধ্যে লাঠি হাতে চলাফেরা করতে পারবো। তার সাত দিনের মধ্যে নিজের পা নিজের হবে। তারপর এসো। আসবে? তখন বর্ষার আভাস জাগবে বনে পাহাড়ে। "ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, গগনে গগনে ডাকে দেয়া..."

ভালো থেকো। অশেষের খবর কি ? অনেকদিন তার কথা লেখোনি। শ্রুতির কি খবর ?

ইতি—রাজর্ষি

রাজর্ষি বসু
বেতলা, পালামৌ, বিহার

বালিগঞ্জ প্রেস, কলকাতা

দুখের বন্ধু সুখের বন্ধু

আপনার চিঠি পেলাম। কাহলিল্ জিব্রানের "প্রফেট" থেকে উদ্ধৃত লাইনটিও পড়লাম।

আপনার বড় চিঠিটি বারবারই পড়েছি। তাতে অর্থের হেরফের যে একেবারেই হয়নি এমন বলব না। তবে আমার প্রথমবার পড়ে মনে হয়েছিলো চিঠিতে একটি প্রচ্ছন্ন খোঁচা আছে। হয়তো আমি ভুল। যাই হোক অন্যায় করে থাকলে আমাকে মার্জনা করবেন।

একটা কথা আপনিতো আগেই প্রাঞ্জল করে জানিয়েছেন। আমি সেটারই পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র। আমার জন্যে আপনার সহমর্মিতা ছাড়া আর কিছুই নেই। আমারও তাইই।

আপনি হয়তো অশেষের কাছ থেকে আপনাকে জড়ানো চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আপনাকে লেখা আমার চিঠি পেয়ে ভেবেছিলেন যে, অশেষ আপনাকেও জড়িয়েছে বলে আমিও সেই চিঠির ওজর তুলে আপনাকে হয়তো জড়াতে চাইছি। তা যদি ভেবে থাকেন তাহলে খুবই ভুল করেছেন। আমি আপনাকে কেন, কাউকেই কোনোভাবেই জড়াতে চাই না আমার জীবনের সঙ্গে। আপনিও নিশ্চয়ই তা চান না। আমরা দুজনেই তা না চাওয়ার মতো যথেষ্টই প্র্যাকটিকাল। তা সত্ত্বেও যদি ভুল বুঝে থাকেন তা হলে আমার করণীয় কিছুই নেই।

আবারও বলছি যে, আমাকে ভুল বুঝবেন না। যদি অনবধানে কোনো অন্যায় করে থাকি, তাহলে ক্ষমা করবেন।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি যে, অশেষকে আমি লিখে দিয়েছি যে তার সঙ্গে আমার আর কোনোই সম্পর্ক নেই। আপনি লিখেছিলেন, যেখানে ভালোবাসা সেখানে ভুল বোঝাবুঝি বা ঝগড়া থাকেই। ভালোবাসা কখনও হয়ইনি আমার অশেষের সঙ্গে। ব্যাপারটা ভালোলাগার একটি advance stage-এই পৌঁছেছিলো শুধু। তা ভালোবাসাতে গড়িয়ে যাওয়াব সুযোগ আর পেলো না। অগ্নিপরীক্ষাতে ফেল করে গেলো।

একটা ভালো খবর আছে। যদিও মেয়েলি খবর। তবে এখবরটিকে মেয়েলি খবর কেন যে বলা হয় তা জানি না। ছেলেরা নইলে, যে খবর কোনওদিন খবরই হয়ে উঠতো না (এমন কী Artificial Insemination-এর বেলাতেও) সেই খবরটিকেই "মেয়েলি" পদবাচ্য করে রাখা হলো কেন যে তা নিয়ে গবেষণার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। শ্রুতি কনসিভ্ করেছে। এবং প্রায় সমসময়ে ওর জার্মান স্পিৎজ্ কুকুরীও। শ্রুতির Version-এই বলি "অবশ্যই একই উৎসের দ্বারা নয়।" সম্ভব হলে ওকে কন্‌গ্রাচ্যুলেট করে লিখবেন। ও এখানে আসছে এবং থাকবে কদিন।

ইতি—ঋতি

পুনশ্চ ভবিষ্যতে আপনাকে অশেষের বাবা-মা অথবা অশেষ সম্বন্ধে কিছুমাত্র লিখে আমাদের সুন্দর পত্র-মিতালিকে কণ্টকিত করব না। আপনিও মুছে ফেলুন এসব মন থেকে।

ঋতি রায়
বালিগঞ্জ প্রেস, কলকাতা

বেতলা পালামৌ, বিহার

রাগ কোরোনা রাগুনি,
"রাগ কোরো না রাগুনি রাঙা মাথায় চিরুনি
বর আসবে এখুনি নিয়ে যাবে তখুনি"

বাঁচা গেলো তোমার চিঠি পেয়ে ! কী রাগই যে করতে পারো বিনা কারণে ! কিছুদিন বাদে বাদে আমাকে মাস্টারমশাই স্থানে সমস্যার কথা বলবে আর সমাধানের কথা আমি বললেই বলবে মাস্তারমশাই মাস্তারমশাই ! কুমীল।

আমাদের এই চিঠির বন্ধুত্ব প্রায় একজন কাবুলি মেয়ের সঙ্গে দ্রাভিড়াকাজাঘাম পার্টির উপনেতার পত্র-মিতালি হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। খামের উপরের ঠিকানাটাই একমাত্র বোঝা যাচ্ছে। ভিতরের শব্দগুলি দুর্বোধ্য। তুমি কি এ গল্প জানো ?

তোমার বর্তমান মানসিক অবস্থায় মন হাল্কা করা দরকার। আমি এমন নির্দোষ আনন্দে খুব আনন্দ পাই।

গত সপ্তাহে কেশব এসেছিলো। ও গল্পটি বলে আমাদের খুবই হাসিয়ে গেলো। ও কার কাছে শিখেছিলো বা শুনেছিলো বলতে পারব না। কেশব খুব ভালো তবলা বাজায় এবং মুখ্যত রবীন্দ্রসঙ্গীত গাহিয়েদের সঙ্গেই বাজায়। নাম নিশ্চয়ই শুনেছো।

এবার গল্পটি শোনো

এক মাস্টারমশাইয়ের এক ছাত্র ছিলো। এটা কোনো গল্প নয়। অগণ্য মাস্টারমশায়দের অগণ্য ছাত্র থাকে। কিন্তু এই ছাত্রর বিশেষত্ব ছিলো এই যে এ কোনো সাবজেক্টেই পাঁচের বেশি নম্বর পায় না। মাস্টারমশায়ের লজ্জার সীমা পরিসীমা নেই। ব্যবসাদার বাবা। তিনিও ভাবেন, মাস্টারের পেছনে এতো টাকা খরচ হচ্ছে আর রেজাল্টের বেলা এই। অল ডেবিট, নো ক্রেডিট।

একদিন তো তিনি ডেকে পাঠালেন মাস্টারমশাইকে। ভেতর থেকে বড় ডিশে করে ভালোমন্দ খাওয়ার-দাওয়ারও এলো। ছেলের বাবা বললেন, ব্যাপারটা কি ? মাস্টারমশাই বললেন, ব্যাপার আর কিছুই নয়, কুমীর।

কুমীর ?

সে কী কথা !

হ্যাঁ স্যার। কুমীর। আপনি স্বকর্ণেই শুনুন। শেখাইতো আমি সবই কিন্তু আপনার ছেলের কুমীরের জন্যে সাধ্য কী যে স্কুলের মাস্টারেরা আপনার ছেলেকে নম্বর দেন।

তা কি করে হয় ? কুমীর না হয় এক বিষয়ের নম্বরই খেলো, সব বিষয়ের নম্বর কুমীর খায় কি করে তা তো আমার সাধারণ বুদ্ধির বাইরে।

শুধু আপনারই কেন স্যার, ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে তা সব মাস্টারমশাইদের অসাধারণ বুদ্ধিরও বাইরে।

শুনি, দেখি ছেলেকে কী পড়িয়েছেন ? আপনি প্রশ্ন করুন আর ও আমার সামনেই জবাব দিক। ওর কুমীর মেরে তার চামড়া দিয়ে আমি গিন্নীকে একটা ব্যাগ বানিয়ে দেবো।

বলো তো খোকন। আচ্ছা প্রথমে কঠিন প্রশ্ন নয়। প্রথমে গরুর উপরেই মুখে মুখে একটি নিবন্ধ রচনা করো।

বাচ্চা ছেলেটি বললো, গলু ? মাত্তারমশাই ?

হ্যাঁ বাবা গলু ।

ছাত্র গড়গড় করে বলতে শুরু করলো, গলু একটি উপকালি জন্তু । গলুর দুধ আমলা থকলে কাই । গলুর দুধ দিয়ে থানা হয়, থন্দেশ হয়, দই হয় । গলুর তাম্‌লা দিয়ে দুতো হয়, গলুর থিং দিয়ে কত্তো কিছু হয় । কিন্তু মাত্তামশাই ।

কি ? বলো বলো ।

মাস্টারমশাই বললেন ।

থামলে কেন ?

বাবা বললেন, বলো, খোকন, কী হলো ?

একদিন না গলুটা বিতেল বেলা বেলাতে বেলাতে একতা নদীল্ ধালে যেই না গিয়ে পৌঁছেছে আর··· মাত্তামশাই··· ।

চোখ ছানাবড়া করে বললো খোকন ।

আঃ বলোই না···

মাস্টারমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন ।

মাত্তামশাই, এত্‌টা কুমীল্ এতে না, গলুটার পা কাম্‌লে ধরে এক্কেলে দলের তলায়—ও মাত্তামশাই ! গলু থেথ্ ।

মাস্টারমশাই বললেন, দেখলেন তো স্যার । গরু আরম্ভ হতে না হতেই শেষ হয়ে গেলো । যাকে নিয়ে নিবন্ধ তাকেই যদি কুমীর দিয়ে খাইয়ে দেয় গোড়াতেই তো মাস্টারেরা কত নম্বর দিতে পারেন ? আপনিই বলুন ।

এটা কোনো কথা নয় । এ অবিশ্বাস্য ব্যাপার । সব বিষয়েই কুমীর আমার ছেলেকে খাচ্ছে··· । আসলে সি পি এম-এর আমলে স্কুলগুলো সব গোল্লায় গেছে মশায় । পড়াশোনাই হয় না । নইলে একী মাম্‌দোবাজী পেয়েছেন ? কুমীরের দোহাই পাড়ছেন সব সাবজেক্টে আমার ছেলে ফেল করার জন্যে ?

আহা আমি তো প্রাইভেট । স্কুলের তো নই । আমার উপরে রাগ করেন কেন ?

তাহলে করব কার উপরে ?

কী বলেন স্যার আপনি ? কুমীর আপনার ছেলেকে খাচ্ছে ? না না, আপনার ছেলেকে কুমীর খাবে কেন, কুমীর তো···

ঐ হলো ! নেট এফেক্ট্‌তো তাই । প্রত্যেক সাবজেক্টেই যদি তিন চার করে পায় তো কুমীরেই খেলো নাকি ছেলেকে ?

একটু থেমে মাস্টারমশাইকে বললেন, আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার ছেলে কিছু জানে ? বাঙালির ছেলেকে রবি ঠাকুর সম্বন্ধেও কিছু শেখাননি ?

আমার বিদ্যে-বুদ্ধি অনুযায়ী যতটুকু পারি শিখিয়েছি স্যার । বলেই বললেন, বলো তো বাবা, রবি ঠাকুর সম্বন্ধে । তুমি কী জানো ।

লবি ঠাকুল মাত্তামশাই ? ও লবি ঠাকুল কুব্ বালো কবি ছিলেন । টিনি গীতাঞ্জলি বলে এক্‌তা বই লিকে নোবেল প্রাইজ পেয়েথিলেন । উনি অনেক গানও লিখেথিলেন । থে গানের নাম লবীন্দথংগিত । কিন্তু মাত্তামশাই !

একদিন কি না তিনি বেলাতে বেলাতে থিলাইদহর পদ্মার পাথে গেতেন, আল মাত্তামশাই !

কি ?

আর কী ! এট্টা কুমীল না এথে তাঁর ঠ্যাং ধলে দলে টেনে নিয়ে তোলে

গেলো···মাস্তামশাই !

এ কী জ্বালারে বাবা !

ছেলের বাবা রীতিমত বিরক্ত হয়েই বললেন। সাহেব কবি-টবি সম্বন্ধে পড়িয়েছেন কিছু ? এই কুমীরকে যদি সাহেব দিয়ে জব্দ করা যায়।

হ্যাঁ ! আপনি নিজেই জিগগেস করুন না এবারে স্যার।

বলো তো খোকন, উইলিয়াম্ শেক্সপীয়র কে ছিলেন ?

খোকন সঙ্গে সঙ্গে বললো "থেকথ্পিয়ার ইংল্যান্দের মহাকবি থিলেন। তিনি ওনেক বই লিখেথিলেন। নাতোক, কবিতা আলো কত্ত কি ? তিনি জন্মেথিলেন ত্যাথফোর্ড অন্ অ্যাভন্এ। কিন্তু মাস্তারমশাই।

কি ?

একদিন না তিনি তাঁর বালি থেকে বেলিয়ে অ্যাভন্ নদীল পাশে বেলাতে বেলাতে যেই গেছেন, সে নদীতে অনেক হাঁথও ভাসছিলো কিন্তু মাস্তামশাই একতা কুমীল, কী কী পাজ্জী কুমীল, এত্তো বলো বলো ল্যাজ হাঁথগুলোকে না ধরে থেক্সপিয়ারের পা কাম্‌লে ধলে অ্যাভন নদীর মদ্দে এক্কেবালে মাস্তামশাই···ছেলের বাবা অত্যন্ত চিন্তান্বিত গলায় বললেন, আরে। সত্যিই তো মাস্টারমশাই। একে এ কী কুমীরের ব্যামোয় পেলো বলুন তো দেখি ! জ্যোতিবাবুর ভাষায় এযে দেখি "গভীর চক্রান্ত"।

কী আর বলব আমি ? শুধুই দেখি। মাস্টারমশাই অসহায় গলায় বললেন। আচ্ছা এবারে একটা ইতিহাসের প্রশ্ন করুন তো। দেখি কুমীর কি করে ঢোকে হিস্ট্রীতে। প্রেজেন্ট টেন্‌স্-এ ঠিক আছে। পাস্ট টেন্‌স্-এ তো ট্যা-ফোঁ হবে না।

মাস্টারমশাই এক টিপ্ নস্যি নিয়ে বললেন. ঢুকবে তাও ঢুকবে দেখবেন। অসীম ক্ষমতা আপনার ছেলের। আপনার ছেলের কুমীর লখীন্দর-বেহুলার বাসরঘরে ঢোকা সাপেরই মতো। বড় সূক্ষ্ম শরীর সে সর্বনাশার। তাকে আটকায় সে সাধ্য কারোই নেই।

বাবাই বললেন এবারে, আচ্ছা বলো তো খোকন তুমি শাজাহান সম্বন্ধে কিছু জানো ?

হ্যাঁ। জানি। বাবা।

কী জানো ? বলো।

"সাজাহান খুব বলো নবাব থিলেন। দিল্লির নবাব। তাঁর বউএর নাম থিলো মমতাজমহল। তিনি তাজমহল বানিয়েথিলেন।

একদিন···মাস্তামতায়··· ।

কী ? কী হলো ?

একদিন থাদাহান দমুনা নদীল পাথে দালিয়ে দালিয়ে দমুনার দলে তাঁর তলোয়াল পলিস্কার কত্তিলেন আর ওমনি···মাস্তামশাই ! ওমনি একতা কুমীল থাদাহানের পা ধলে দলের নিচে···মাস্তামশাই।

ছেলের বাবা Exasperated হয়ে এবারে মাথায় হাত দিয়ে মাস্টার মশাইকে বললেন, মাটির উপরে তুলে দেখেছেন কখনও ? মানে শূন্যে ? সেখানেও কি কুমীর ?

হ্যাঁ স্যার তাও দেখেছি। সব জায়গায় কুমীর।

সে কী। না না। এ আপনার বাড়াবাড়ি। দাঁড়ান। আমিই প্রশ্ন করি। আচ্ছা খোকন, অ্যারোপ্লেন সম্বন্ধে তুমি কি জানো বলো। অ্যারোপ্লেন দেখেছো তো ?

হ্যাঁ জানি।

বলবো ?

হ্যাঁ খোকন বলো তো।

এ্যালোপ্লেন আকাশের দাহাদ। আকাথে তলে। উলে উলে তলে। তার দুতো দানা আতে। অনেত মাল আর মানুথ্ তাল পেতের মধ্যে বথে থাতে। এ্যালোপ্লেন দিনে ও লাতেও উল্তে পারে।

বাবা বললেন, অ্যাই তো কেমন ফ্লুয়েন্টলি বলে যাচ্ছে, আপনারা না···

হ্যাঁ খোকন বলো, তারপর ?

একদিন এ্যালোপ্লেনটা এক্তা নদীল্ উপল দিয়ে যেতে যেতে কালাপ হয়ে গিয়ে···মাস্তামশাই···

নদীর নাম কি ?

কঙ্গো নদী মাস্তামতাই। কুমীলে ভলা !

মাস্টারমশাই আর এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, ঐ দেখুন ! অ্যারোপ্লেনও কি বাঁচবে ?

মাস্তারমশাই। এ্যালোপ্লেনতা দেই দলে এসে পললো একতা কুমীল দুতো কুমীল অনেক কুমীল এসে পাইলত্দের আগে তাপ্পর···মাস্তামশাই !···

ভালো থেকো। রাগ করে থেকো না।

ইতি—রাজর্ষি

রাজর্ষি বসু
বেতলা টাইগার প্রজেক্ট, পালামৌ, বিহার

বালিগঞ্জ প্রেস, কলকাতা-৭০০০১৯

মিস্টাল কুমীল্

আপনার চিঠি পড়ে শ্রুতি হেসে এমন গড়াগড়ি করছিলো আর বলছিলো যে পেটে ব্যথা ধরে গেছে যে আমার তো ভয়ে গাইনিকে ডাকার কথা মনে হলো। এখন তো আর ওর পেট শুধুমাত্র ডাল-ভাতের পেট নয়। যাকগে। আপনি পারেনও। আর স্টক-এ কিছু আছেও আপনার। নিজস্ব ও পরস্ব অভিজ্ঞতার।

শ্রুতির খুব ইচ্ছে যে ওর একটি মেয়ে হোক। কাকার ইচ্ছে ছেলের। এখনতো কী সব টেস্ট-ফেস্ট বেরিয়েছে। বলছে, সময়মতো তা করে নেবে। তবে আমার ভালো লাগে না এ সব কথা ভাবতেও। বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আমার সবচেয়ে বড় অনুযোগ এই যে বিজ্ঞান আধুনিক মানুষের জীবন থেকে অনিশ্চয়তা, বিস্ময় সবই কেড়ে নিচ্ছে। জীবনটা বড় বেশি চেনা জানা কমপুটারাইজ্ড হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎও ঠিক করে দিচ্ছে বিজ্ঞান। এর মধ্যে মানে ঐ সব কিছুই বিজ্ঞানের হাতে ছেড়ে দেবার মধ্যে যেমন এক সমর্পণ-তন্ময়তা আছে, আছে তেমনই এক সর্বনাশের ভয়ও। মানুষ এই প্রক্রিয়াতে চলতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই রোবোট্ হয়ে যাবে। মনুষ্যপদবাচ্য অনেককিছুই হারিয়ে যাবে সেদিন আমাদের জীবন থেকে এবং গেলে সে জীবন কি বাঁচার উপযুক্ত থাকবে ?

জানি না। কেউই বোধ হয় ভাবে না। মানুষ ভাবনার ইচ্ছা, সময় এবং হয়তো শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। ভবিষ্যতে কি হবে ভাবলেও ভয় করে আমার।

বার্টান্ড রাসেল তাঁর "কনকোয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস" বইয়ে লিখেছিলেন যে, ইংল্যান্ডে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশানের পর মানুষের হাতে সময় অনেক উদ্বৃত্ত থাকবে। যন্ত্র মানুষের অনেকখানি সময় বাঁচিয়ে দেবে এবং দিলে মানুষ যে কারণে মানুষ, তার মানসিকতায় চিন্তা ভাবনার (অর্থকরী চিন্তা নয়), অনর্থকারী চিন্তাও নয়, পরমার্থর চিন্তায়, ভালোত্বর চিন্তায় নিজের ও জাতির জীবনের দিক নির্ণয়ের চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত করবে, করতে পারবে

এবং তাই হবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশানের সবচেয়ে বড় লাভ।

কিন্তু যা হলো তা এর ঠিক উল্টো। এই বিশেষ ক্ষেত্রের অসীমনিঃস্বতার দাম মানুষকে একদিন চোখের জলে দিতে যে হবেই সে বিষয়ে আমার অন্তত বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। ভালো থাকবেন। আমার ও শ্রুতির শুভেচ্ছা।

ঋতি

ঋতি রায়
বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা

বেতলা, পালামৌ

ঋতি, জ্যোতিষি

শ্রুতিকে আমার অভিনন্দন জানিও। অভিনন্দন জানানোটা রীতি বলেই জানাচ্ছি। কিন্তু একজন পুরুষ এবং একজন নারীর জীবন সার্থক হতে হলে যে সন্তান তাঁদের হতেই হবে এ কথাতে আমার বিশ্বাস নেই।

বর্তমান জগতে সন্তান এলে দম্পতীর নিজেদের অনেকরকম সুখকেই বিসর্জন দিতে হয়। জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়ে নিজেদের বঞ্চিত করে সন্তানদের বড় হওয়া, ভালো হওয়ার চিন্তায় “নষ্ট” করতে হয়। আর প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে পৌঁছে এই নির্মম সত্য আবিষ্কার করে হতবাক্ হতে হয় যে যাদের জন্যে সবকিছু করলাম, নিজেরা বাঁচলাম না পর্যন্ত বাঁচার মতো, তারাই শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। তুমি শুধু অশেষের কথাই জানো। আমি জানি অগণ্য মানুষের কথা। সেই সব প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের দেখে আমার প্রচণ্ড রাগ হয়। রাগটা তাদের সন্তান সন্ততির উপরে না শিক্ষা-ব্যবস্থার উপরে না বিশ্বব্যাপী যে স্বার্থপরতার অবিশ্বাসী এক প্রলয়ংকরী বান এসেছে তার ওপর তা বুঝতে পারি না। তবু নিরূপায় এক ক্রোধে ছটফট করি।

এ ব্যাপারে মেয়েদের ভূমিকা খুবই বড়। শিশুকালে পুতুলখেলার বেলা থেকেই তাদের মনে ঘর এবং সংসার সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ এমন একটি প্রত্যয় মনে জন্মে যায়। “শোলে”তে (ডাকাইত) আমজাদ খান যেমন বলেছিলো (ঠাকুরসাহাব) সঞ্জীবকুমারকে ইয়ে দুশ্‌মনি বড়া ম্যঙ্গা পড়েগা ঠাকুর। তেমনই অনেক ক্ষেত্রেই আমার বলতে ইচ্ছে করে সরলমতি কুরঙ্গনয়নী অল্পবয়সী মায়েদের যে এই পুতুল খেলার জন্যে বড়ই দাম দিতে হবে গো তোমাদের। প্রার্থনা করি যেন না দিতে হয়।

পৃথিবীর অনেক দেশেই বিশেষ করে সম্পন্ন দেশে জন্মহার একেবারেই কমে এসেছে। বিপজ্জনক ভাবেই কমে এসেছে। সেসব দেশে জন্মহার শূন্যে পৌঁছেছে অসীম স্বার্থপরতাতে এবং নিশ্চেষ্ট তাতেই। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার কষ্ট তারা স্বীকার করতে চায় না। এটা আবার একটা এক্সট্রিম পয়েন্ট। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ছেলেমেয়ে হোক কিন্তু তাদের ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে নিজেদের জীবন মাটি করার মতো মূর্খামি আর হয় না।

মানুষ করা বা মানুষ হওয়ার সংজ্ঞাটা অচিরে বদলাতে না পারলে এদেশে অমানুষের সংখ্যা অভাবনীয় ভাবে বেড়ে যাবে। প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী, মাল্‌টি-ন্যাশনাল কোম্পানী বা এয়ার-কন্ডিশনড অফিস কমপ্লেক্সে টাইপরা চাকরি না করতে পারলে জীবন যে অবশ্যই “বৃথা” হয়ে গেলো এই সর্বৈব ভুল ধারণা থেকে তোমাদের নিজেদের ছিন্ন করতে হবে। জীবন এবং মানুষ হওয়া কথাটার তাৎপর্য তোমাদের নিজেদের আগে বুঝতে হবে, তবে না তোমরা সেই সংজ্ঞা আরোপ করতে পারবে তোমাদের সন্তানদের উপরে। এটা অত্যন্তই দুঃখের বিষয় বলে মনে করি আমি। অবশ্য এই সবুজ গর্তে বসে আমার ভাবাভাবির দাম

জাতীয় প্রেক্ষিতে কতটুকুই বা!

আমি আমার দেশকে খুবই ভালোবাসি বলেই মনে করি যে, শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষেই কোনো মূল ভাবনাচিন্তা হয়নি ; হচ্ছে না। ভারতীয়ত্বে সম্পৃক্ত শিক্ষাই যদি ভারতীয়রা আজও না পায় তাহলে আর কবে পাবে? ছেলেমেয়েদের কি দোষ? ওদের দিকে তাকালে চোখে জল আসে। শিশুর শৈশব নেই, কিশোরের কৈশোর নেই, খেলা নেই, মজা নেই, শুধু পড়া পড়া আর পড়া। স্কুলের টাস্কস্, স্কুলের প্রোজেক্ট, স্কুলের এই স্কুলের সেই। এতো কিছু বিষয় একটি মাত্র ছোট্ট জীবনে জেনে লাভই বা কি? এই জ্ঞানের কতটুকু কাজে আসবে পরে? জানার প্রয়োজনই বা কি? চরিত্র-গঠনের কোনো শিক্ষা নেই। শুধুই বাহ্য আড়ম্বর। যে শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের ভারবাহী গাধা আর তাদের অভিভাবকদের সদা-চিন্তিত, সদা-উদ্বিগ্ন, মানসিক অবসাদের রোগী করে তোলে সেই শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়া ধরে টান মারার সময় সত্যিই এসেছে।

কিন্তু টান মারবেটা কে? জেগে তো নেই বেশি মানুষ। যার যার পকেট, যার যার ক্ষমতা, যার যার যশ, যার যার প্রচার, যার যার বাড়ি, ফ্রিজ, টিভি, ভি সি আর, গাড়ি, তাস, জুয়ো, মদ, অর্থহীন আড্ডা দিনের পর দিন, এই নিয়েই যে আমরা আছি। চমৎকার।

এই চমৎকারিত্বর স্বরূপ শিগগিরই বুঝবে। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে ঘোর শূন্যতা, উদ্দেশ্যহীনতা বালসুলভ চাপল্য ও জাতীয়তা-বিরোধী প্রবৃত্তিসমূহকে অত্যন্ত প্রকট দেখি তাতে মনে হয় যে সি আই এ, কে জি বির যে সব গুজব হাওয়াতে আমাদের মতো সাধারণ লোকদের কানে ভেসে আসে তার কিছুটা অন্তত সত্যি। তা নইলে মনের ক্ষেত্রে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা যাঁদের ছিলো তাঁরা চারদিকের এই অবক্ষয়ী উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে বাস করেও ছায়াচ্ছন্ন, কর্দমাক্ত জলাশয়ে নিদ্রামগ্ন সুখী যূথবদ্ধ চতুষ্পদের মতো অন্ধ হতেন না। এই অন্ধত্ব, এই স্থবিরতা, এই নিশ্চেষ্টতার সবটাই যে অনিচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্য-অপ্রসূত তা বিশ্বাস করা আমার মতো জঙ্গলের মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই সচেতন নিশ্চেষ্টতার পেছনে গূঢ় কোনো উদ্দেশ্য আছে।

জানো ঋতি, এই দেশ রাজীব গান্ধীর বা জ্যোতিবাবুর বা ভি পি সিং-এর বা অটল বিহারী বাজপেয়ীর যতটুকু তোমার ও আমারও ঠিক ততটুকুই। আমরা যদি আমাদের জোর, আমাদের স্বর, লুকিয়ে রাখি তো সমস্ত দেশই একদিন পরহস্তগত হবে। ঘুমুবার সময় নেই আর। পথে ঘাটে বাড়িতে বিয়েবাড়িতে শ্মশানে সর্বত্র চোখ কান খোলা রেখো। অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করো। মনে করো না যে, তুমি একা। তোমার পেছনে নীরব অদৃশ্য মিছিল আছে। সময়মতো তারা মন্ত্রবলে তোমার পেছনে এসে দাঁড়াবেই।

এই সব নেতারা আমাদেরই সেবক আমরা ওঁদের সেবক নই কথাটা মনে রেখো। কিন্তু ওদের হাব-ভাব, বোল-চাল, ভি ভি আই পি ট্রিটমেণ্ট দেখে উল্টোটাই মনে হয়। এয়ারপোর্টে একজন সাহিত্যিক বা গায়ক বা চিত্রকর ফ্লাইট ডিলেড থাকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্য সকলের সঙ্গেই সময় কাটান কিন্তু রাজনীতি করেন অথবা রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক আছে অথবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোনো পদস্থ আমলা এঁরা সকলেই ভি আই পি অথবা ভি ভি আই পি। বড় ব্যবসায়ীরাও তাই। কোন সমাজে ও দেশে কাদের কী এবং কতখানি ইম্পর্ট্যান্টিস দেওয়া হয় তা থেকেই সেই দেশের শিক্ষার মান বা ঝোঁকের প্রবণতা কিছুটা আন্দাজ করা যায়। দেশ-এর কথা উঠলেই আমি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়ি। জানি না, আগেও কোনো চিঠিতে বা একাধিক চিঠিতেও এই সব প্রসঙ্গর অবতারণা করেছি কি না। করে থাকলে, আমার পৌনঃপুনিকতা ও অতিকথনের দোষ ক্ষমা কোরো।

এবার লঘু প্রসঙ্গে আসা যাক।

শ্রুতির শিশু ছেলে হবে না মেয়ে তা আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার নবতম এক্তিয়ারে শ্রুতি নিশ্চয়ই জানতে পারবে। কিন্তু আমাদের খনার বচনেও এ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আছে। তোমরা আধুনিকারা নিশ্চয়ই খনার নামই শোনোনি কেউ। কেউ নাম শুনে থাকলেও থাকতে পারো, তার বচন সম্বন্ধে নিশ্চয়ই খোঁজ রাখো না।

খনার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নাকি মতভেদ আছে। কেউ বলেন খনা ময়দানবের মেয়ে। কেউ বলেন তিনি মানুষের মেয়ে। তাঁর আসল বাবা যে কে, তা জানা সম্ভব ছিল না। এও শোনা যায় যে লঙ্কাদ্বীপবাসী এক রাক্ষস তার পরিবারের সকলকে মেরে খনার উপর মায়া পড়ায় তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে লালন-পালন করে। আরও অনেক কথাই ছিলো খনা সম্বন্ধে, কিন্তু খনা একদিন বেড়াতে বেড়াতে একটা নদীর পাশে এসে পড়েছিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে মাত্তামশাই একটা কুমীল এতে তাকে...

খনার বচনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনরকমভাবে সঠিক লিঙ্গ নির্ধারণের উপায়ের কথা বলা আছে। গর্ভস্থ ভ্রূণ ছেলে হবে না মেয়ে তা জানতে হলে খনার বচন পড়ে শুনিয়ে দাও শ্রুতিকে। For ready reference এখানে Quoteও করে দিচ্ছি।

যদি ঠিক হয় তো সন্দেশ খাইও। না হলে, ব্যাপারটা চেপে যেও। যদি আমার পাণ্ডিত্যে সন্দেহ প্রকাশ করো তাহলে জানিও। খনার বচনের প্রকাশকের ও সম্পাদকের নাম ঠিকানা জানিয়ে দেব।

॥ প্রথম প্রকার ॥

বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ
পেটের ছেলে গণে আন।
নামে মাসে করি এক।
আটে হরে সন্তান দেখ।
এক তিন থাকে বাণ।
তবে নারীর পুত্র জান।
দুই চারি থাকে ছয়।
অবশ্য নারীর কন্যা হয়।
থাকিলে তার শূন্য সাত
হবে নারীর গর্ভপাত ॥

বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ—তার অর্থ হল পাঁচের পিঠে পাঁচ। অর্থাৎ পঞ্চান্ন সংখ্যা আর যে গর্ভিণীর সন্তান গণনা করতে হবে তার নামের অক্ষর সংখ্যা ও যত মাস গর্ভ হয়েছে তার সংখ্যা নির্ভুলভাবে নিয়ে একত্রে যোগ করতে হবে। ঐ সমষ্টিকে আট দিয়ে ভাগ করবে। যদি ভাগশেষ এক, তিন, পাঁচ অবশিষ্ট থাকে তবে পুত্র এবং দুই, চার বা ছয় থাকে তবে কন্যা হবে। আর ভাগশেষ যদি শূন্য বা সাত থাকে তবে সেই গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়ে যাবে।

উদাহরণ প্রথমত নির্ধারিত সংখ্যা —পঞ্চান্ন
গর্ভিণীর নাম চারুলতা, অক্ষর— চার
মনে কর ছয় মাসের গর্ভ— ছয়

মোট পঁয়ষট্টি
অতঃপর ঐ সমষ্টির যোগফলকে ৮ দিয়ে ভাগ কর ৬৫÷৮=১।
অতএব দেখা গেল গর্ভিণীর পুত্রসন্তান হবে।
দ্বিতীয় প্রকার

যত মাসের গর্ভ নারীর নাম যত অক্ষর।

যত জন শুনে পক্ষ দিয়ে এক কর।
সাতে হরি চন্দ্র নেত্র বাণ যদি রয়।
ইথে পুত্র পরে কন্যা জানিবে নিশ্চয়।

উদাহরণ কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করল—ছবিরানী নয় মাস গর্ভবতী, তার পুত্র কিংবা কন্যা হবে বলুন। প্রশ্ন সময়ে সেখানে চার ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এখন গর্ভিণীর নামের সংখ্যা ৪, মাসের সংখ্যা ৯, সেখানে উপস্থিত লোকসংখ্যা ৪, পক্ষ সংখ্যা ২, গণনাকারীর সংখ্যা ধরতে হয় না।

যথাক্রমে উক্ত চার + নয় + চার + দুই=উনিশ।

উনিশকে সাত দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ অবশিষ্ট রইল। এখন বোঝা গেল ছবিরানীর পুত্র হবে। একে তিন নেত্র, পাঁচে পঞ্চবাণ।

তৃতীয় প্রকার

গ্রাম গর্ভিণী ফলে যতা
তিন দিয়ে হবো পুতা।
একে সুত দুয়ে সুতা।
শূন্য জলে গর্ভ মিথ্যা।
একথা যদি মিথ্যা হয়।
সে ছেলে তার বাপের নয়॥

উদাহরণ নবগ্রাম অক্ষর সংখ্যা —চার
কৃষ্ণকুমারী—অক্ষর সংখ্যা —পাঁচ
হলে নাম আর অক্ষর সংখ্যা —দুই
মোট এগারো

এগারো÷তিন=দুই অবশিষ্ট, অতএব কন্যা হবে।

নামে মাসে করি এক।
তার দ্বিগুণ করে দেখ।
সাতে পুরি আটে হরি।
সমে পুত্র বিষমে নারী॥

যথা:
শিবানী নাম—অক্ষর সংখ্যা —তিন
মাসের সংখ্যা —চার
মোট সাত
সাত×দুই=চোদ্দ×সাত=আটানব্বুই
আটানব্বুই÷আট=বারো, ভাগশেষ দুই (জোড়)
অতএব শিবানীর কন্যা হবে।
ভালো থেকো।

রাজর্ষি

ঋতি রায়
বালীগঞ্জ প্রেস, কলকাতা-৭০০০১৯

ঋতি, কল্যাণীয়াসু,

বর্ষা সত্যিই এসে গেল!

বনে পাহাড়ে বর্ষার যেমন সমারোহ তেমন আর কোনো ঋতুরই নয়। বর্ষার সঙ্গে নারী প্রকৃতির যেমন সার্বিক মিল তেমনও আর কোনো ঋতুর সঙ্গে নেই।

প্রথম যেদিন মাঝরাতে বৃষ্টি নামলো হঠাৎ ঘুম ভেঙে মনে হল আদ্যিকালের ঐরাবতদের কোনো অতিকায় দল বুঝি প্রকৃতি মন্থন করে গর্জনে, বৃংহণে, স্পন্দনে, ঘর্ষণে সমস্ত পাহাড় বনে এক তাণ্ডব উপস্থিত করেছে। কিন্তু বেশিক্ষণ কল্পনার জের রইল না। দিকদিগন্ত জুড়ে নেমে এল আকাশের উজ্জ্বল তাপদগ্ধ রুক্ষ চাঁদোয়া নিচে। তার পর গলে গেল বনের বুকে, পাহাড়ের চুড়োয় ; মাটির সঙ্গে এক হয়ে গেল। সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরোতে লাগল একটা, রুক্ষ তৃষিতা প্রকৃতিকে বর্ষা যখন প্রথম সিক্ত করল। এই গন্ধ ভরা বর্ষার বনের গায়ের ঘোরলাগা তৃণগুল্ম লতা-পাতা মহীরুহর গায়ের গন্ধ নয়। এ গন্ধর প্রকৃতিটি ঔরসের গন্ধর মতো। গর্ভাধানের গন্ধর মতো গন্ধ এ। ঝাঁঝালো। প্রকৃতি যে নারী এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর দুটি নেই। পুরুষের সবটা দাম প্রকৃতিরই প্রেক্ষিতে। নারীর দেওয়া সম্মানে সে সম্মানিত, অপমানে অপমানিত। নারীর ভালবাসায় তার সবটুকু শক্তি, তার অনুপ্রেরণা। যে পুরুষ নারীকে জানেনি তার সর্বস্বতায়, তার নিজকেও করা হয়নি আবিষ্কার। সে এখনও পূর্ণতাই পায়নি। হয়তো নারীর বেলায়ও এ কথা প্রযোজ্য। তোমরাই ভাল বুঝবে। আমি পুরুষ, শুধু পুরুষের কথাই জানি। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়েছিল। শেষ রাতে চাদরও দিতে হয়েছিল গায়ে। ঘুমুবার আগে সমস্ত বন-পাহাড় বর্ষাবরণের আনন্দের তীব্রতায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল বারে বারে যেন। হাতির দল কমলদহর দিক থেকে ঘন ঘন বৃংহন করে তোপধ্বনির মতো বর্ষাকে স্বাগত জানাচ্ছিল। স্বল্পবাক শম্বরের দল ঘাক ঘাক আওয়াজ করে বৃষ্টির অঝোর ধারায় দিগভ্রান্ত বুদ্ধিভ্রষ্ট যুবাদের মতো আনন্দে মত্ত হয়ে পাহাড় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। ময়ূর ডাকছিল কেঁয়া কেঁয়া করে। বর্ষা বরণের এই স্নিগ্ধ সিক্ত ক্ষণটি যে কী গভীর তীব্রতা ও আর্তিময় আনন্দ হয়ে বনের পশুপাখিদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে তা যেন নতুন করে প্রতিভাত হচ্ছিল ময়ূরদের ডাকে। দূরের ক্যাপের ঘন বনের মধ্যে থেকে হনুমানদের দল হুপ্ হুপ্ চিৎকার করে জানিয়ে দিচ্ছিল যে বর্ষার ভাগীদার তারাও।

সকালে উঠে বারান্দায় এসে দেখি আমার বাংলোর হাতায় যে কটি পেয়ারা ও জবা গাছ ছিল তাদের প্রত্যেকের রুক্ষ শুষ্ক ডালে ডালে গুঁড়ি গুঁড়ি কুঁড়ি কুঁড়ি কিশলয় এসেছে। এ এক আবিষ্কার।

দীর্ঘ দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করার পর হঠাৎ যেদিন ওঁয়াও বলে তোমাদের ছেলে বা মেয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তোমরা যেদিন প্রথম হৃদয়ে কম্পমান, তীব্র এক অননুভূত অনুভূতির সঙ্গে অনুভব কর সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যার সবটুকুই তোমরা বই পড়ে জেনে ফেলেছ বলেই ভেবেছিলে ; তেমনই এক অনুভূতি হয় বৃষ্টির ঔরসে গাছের গর্ভে তাৎক্ষণিক কিশলয় প্রসবিত হতে দেখে। অথচ যাকে "তাৎক্ষণিক" বলে মনে করা যায় তা আদৌ তাৎক্ষণিক নয়। কত দিন আগে এই মেঘপুঞ্জ আদিগন্ত বাষ্প, অগণ্য জলকণা এবং দীর্ঘ অপেক্ষা নিয়ে বাতাসে সঞ্চালিত হতে হতে এক সমুদ্রপার থেকে অন্য সমুদ্রপারের দিকে যাত্রাতে নিজেকে তিল তিল করে গড়ছিল। এখন সে তিলোত্তমা। এই যাওয়ার পথে কোথাও কোথাও ভালবেসে বেশিক্ষণ থেকেও যায় সে। থেকে যায় সেখানে, যেখানে প্রকৃতি সবুজ, যেখানে মানুষের অপরিণামদর্শিতা ও হঠকারিতা নিজের সর্বনাশ সূচিত করতে নিজের শত্রুতা করবার মতো স্বার্থপর ও "বুদ্ধিমান" করে তোলেনি।

তারপর মেঘপুঞ্জ আবার ভেসে যায় অন্যপানে।

রুক্ষ যে গাছ, তার রুক্ষতা বা শুষ্কতা বা তার পত্রহীন শ্রীহীনতাও একদিনে ঘটেনি। হতশ্রী হতেও, শ্রীময়ী হওয়ারই মতো ; সমানই সময় লাগে। গাছের এবং নারীর দুজনেরই

নতুন কিশলয়ের জন্ম দেবার ক্ষণটির আগে বহুদিনই অপেক্ষা করে থাকতে হয়। তাদের মিলনের চরমপুলক আর কিশলয়ের জন্ম বোধহয় একই সম-এ বাঁধা থাকে।

এই দৃশ্যর মতো মহৎ, প্রাণময়, সঞ্জীবনী দৃশ্য বড় বেশি দেখা যায় না বোধহয়। বিজ্ঞানের বইতে যে সব কথা লেখা থাকে না, অনুভূতির বাতায়ন যাদের রুদ্ধ ; সেই অন্ধদের চোখে যে সবকিছুই প্রতীয়মান হয় না, হতে পারে না, তাদের পক্ষে আলো অন্ধকারের তফাৎটুকুই হয়তো বোঝা হয়ে ওঠে মাত্র ; যে কথা এমন এমন মুহূর্তে নির্বাক হয়ে অনুভব করার ক্ষমতা থাকে না এমন ক্ষণে পরম নাস্তিকের মনেও তার বিশ্বাসের ও দম্ভর ভিত সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। কোনো জানাই যে শেষ জানা নয়, সমস্ত জ্ঞানই যে সতত পরিবর্তনশীল এই কথাটা তাঁদের মনেও জাগে। কুমাণ্ডির দিকে রওয়ানা হলাম। কুমাণ্ডি গ্রামে বাঘ পরশু রাতে একটি গরু মেরেছিল। সেখানে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে তারপর সদরে রিপোর্ট দিতে হবে। রিপোর্ট পেলে তখন যার গরু তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে প্রোজেক্ট টাইগারের সদর থেকে।

শুনতে পাই যে অনেকেই নাকি ক্ষতিপূরণ ঠিকমতো পান না। পেলেও পান তার একাংশ। এবং তাও অনেকই দেরী করে। প্রতিটি ধাপে দুর্নীতি এখন মানুষখেকো বাঘেরই মতো মানুষের দৈনন্দিন পথের দুপাশের ছায়ার আড়ালেই শুধু নয় প্রকাশ্যেও থাবা গেড়ে বসে আছে। এগোতে হলে, বাঁচতে হলে ; এই বাঘেদের মুখে নিজেদের গায়ের মাংস কেটে ছুঁড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যে না দেবে, তারই মৃত্যু অবধারিত।

আমি একা কিছুই করতে না পেরে নীরব সাক্ষী থাকি। তবে এই গ্রাম-পাহাড়ের সরল মানুষেরা, আমি যে অর্থগৃধ্নু এবং অসৎ নই সে কথা এতদিনে জেনেছে বলেই বিশেষ ভালবাসে আমাকে এবং সম্মান করে। এ এক মস্ত বড় পাওয়া। ওদের কাছ থেকে পাওয়া এই আন্তরিক নিষ্কলুষ ভালবাসার অনেক দাম ঋতি ! এমনিতেই পৃথিবীতে স্বার্থহীন ভালবাসা বড় কমে এসেছে। তাই এমন স্বার্থহীন ভালবাসার কথা তো ভাবাই যায় না। এখনও টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি হচ্ছে। পথের পাশের নালা ও উপনালাগুলি এতদিনে তপ্ত বালি আর গত বর্ষার স্রোতে ভেসে আসা কিছু ভাঙা ডালপালা ও বিভিন্নাকৃতির পাথর বুকে করে বর্ষার প্রতীক্ষাতে ছিল। তারা সবে ভিজেছে। জল-ধারণের মতো বৃষ্টি হতে এখনও দিন পনেরো বাকি। তবু যেখানে খানাখন্দ, গাড়হা ; সেখানে সেখানেই জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে এসে জমেছে। পথের দুপাশ পাখিদের কলকাকলীতে মুখর হয়ে উঠেছে। ভারী আনন্দ ওদের। বৃষ্টিতে চান করছে, ভেজা ডানার দ্রুত সঞ্চারণে জল ছড়াচ্ছে, চঞ্চু দিয়ে ডানার পালক পরিষ্কার করছে। কী করবে তা যেন ভেবেই পাচ্ছে না। আনন্দে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছে।

মুণ্ডু বাংলোর কাছাকাছি একদল বাইসন পথের বাঁদিক থেকে ডানদিকে গেল। এদিকটা তাদের প্রিয় বিচরণভূমি নয়। বৃষ্টিতে ওদেরও মন ছুটেছে।

কেঁড় বাংলোয় পৌঁছবার আগে একটা উৎরাই আছে পথে। সেই জায়গাটির ডানদিক দিয়ে একটি ফরেস্ট রোড চলে গেছে গভীরে। পিচ রাস্তা ছেড়ে। সেই লাল মাটির পথে ঝরা-পাতা ঝরা-ফুলের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড শিঙাল শম্বর দাঁড়িয়ে আছে পথের দিকে উদাস চোখে চেয়ে। হয়তো পিচ রাস্তা পার হয়ে উল্টোদিকে যেতে চাইছিল। দূরান্তে জীপের শব্দ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

আজ সকলেরই পথ ভুল হয়ে যাচ্ছে যেন। তবু আমাকে ঠিক ঠিক পথে জীপ চালিয়ে যেতেই হচ্ছে কুমাণ্ডির দিকে।

যে সব মানুষের মাঝে মাঝে পথভোলার স্বাধীনতা থাকে না তারা মনুষ্যেতর জীব।

আমারই মতো। পথ যারা না ভোলে তারা পথচলার মজা থেকেই যে বঞ্চিত তাতে কিছুমাত্র ভুল নেই।

জীপটা যখন গাড়ুর ব্রিজের কাছাকাছি এসেছে, দূর থেকে কোয়েলের উপরের ব্রিজটি দেখা যাচ্ছে ; হঠাৎ দেখি কোয়েলের ভেজা বুকে প্রায় সোয়াশো থেকে দেড়শো চিতল হরিণ বৃষ্টিতে ভিজছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর ভেজা বালির মধ্যে মাঝে মাঝে খুরে খুরে বালি ছিটিয়ে দৌড়োদৌড়ি করে খেলা করছে। ওদের এই বর্ষাবিরণ।

আমি ডানদিকে যাব না। কোয়েল না পেরিয়ে কুমাণ্ডির দিকে চললাম।

বড় ভালো লাগছে। ঠাণ্ডা হাওয়া মিশ্র গন্ধ বয়ে আনছে। মুখে-চোখে হাওয়ার ঝাপটা লাগছে। চারধারের প্রকৃতির, নদীর, বনের পাহাড়ের, পশুপাখির অনাবিল আনন্দর ছোঁয়া আমাতেও লেগেছে। মনে হচ্ছে, স্টিয়ারিং ধরে গলা ছেড়ে গান ধরি "আজকে মোরে বোলো না কাজ করতে/যাব আমি দেখাশোনার নেপথ্যে আজ সরতে/ক্ষণিক মরণ মরতে/অচিন কূলে পাড়ি দেব/আলোকলোকে জন্ম নেব/মরণরসে অলখঝোরায় প্রাণের কলস ভরতে/....ঋতি, আমাকে ক্ষমা কোরো।

অনেকেই বর্শায় এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়। আমিও বর্ষাতে হয়েছি।

ইতি তোমার চিরবন্ধু রাজর্ষি

◆

রাজর্ষি বসু
বেতলা, পালামৌ ন্যাশনাল পার্ক
বিহার

ঋষিরাজ,

অনেকই দিন "আপনি" করে ডাকা হল। আর আমি 'আপনির' ভার বইতে পারছি না। যে কাছের, যে সুখের এবং দুঃখের তাকে 'আপনি' করে দূরে সরিয়ে রাখা খুব বেশিদিন যায় না। এমনকি চিঠিতেও।

"তুমি যে তুমিই ওগো সেই তব ঋণ/আমি মোর প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন"।

তোমার বর্ষার চিঠি আমাকে দুঃখে বিধুর এবং আনন্দে মধুর করে তুলেছে। তোমার বর্ষাবির্ণনা পড়ে আমার বাংলাটাও কালিদাসি কালিদাসি হয়ে যাচ্ছে। থুড়ি, কালিদাসী। কালিদাসি বলে একজন অত্যন্ত ফর্সা এবং মোটা কাজের লোক আছে আমার। ঠিকে। তুমি যেমন আমার বিনি-মাইনের ঠিকে বন্ধু। অথচ চিরসখা। "তোমার তুলনা তুমি হে মহীমণ্ডলে"। হয়তো তোমার চিঠির ইমপ্যাক্টই এই হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গেও বৃষ্টি নেমেছে। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া হয়ে উঠেছে বিহারের মতো। কিন্তু বৃষ্টিটি এখনও রয়ে গেছে পুরনো দিনেরই মতো। যদিও সময় মানে না সে। তবে কতদিন এই রকম থাকবে তা জানা নেই। পুরনো স্মৃতি, অনুষঙ্গ সবই হারিয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত এই ইট-কাঠ-কংক্রিটের জঙ্গলে। গাছ নেই। ভালবাসা নেই। আনন্দ নেই। গরম। ভারী গরম। এমন কী সন্ধের পরের কলকাতার সেই বিখ্যাত মিষ্টি দখিনা হাওয়াও নেই। পুরনো আর কিছুমাত্রই বেঁচে নেই। কুলফিমালাইওয়ালা, রজনীগন্ধা আর বেল ফুলের মালার ফেরীওয়ালারা। তারা কেউ কেউ শুনি আছে। তবে অন্য পাড়ায়। কলকাতার কোন্ পাড়া যে ভাল এখন বোঝা দায়। কলকাতা, কলকাতা নেই। কলকাতা কলকাতার মানুষদের নেই।

তোমার পালামৌর বর্ষার চিঠিখানি পেয়ে মন কিন্তু সত্যিই উচাটন হয়েছে। এবারে আমি

সত্যি সত্যিই তোমার কাছে চলে যাব একদিন না বলে কয়ে। অশেষ যাইই ভাবুক আর তুমিও যাই ভাব। আমার যায় আসে না কিছুই ; এমন করে তিলে তিলে মরার চেয়ে অমন করে একেবারেই মরা ঢের ভাল।

আমাদের দুজনের এই আশ্চর্য ভালবাসা এক নতুন দিগন্ত খুলে দিক। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের কাছে। আমরা অতিমানব অতিমানবী হয়ে উঠে চলো তাদের দেখিয়ে দিই যে শরীর ছাড়াও ভালবাসা হয়। আজও হয়। এবং সে ভালবাসা থাকেও। বিয়ে না করেও বিবাহিত হওয়া যায়। বিয়ে করেও অবিবাহিত থাকা যায়। এবং এই সংসারে এমনি করেই থাকে অগণ্য নারী ও পুরুষ। সম্ভবত প্রতিটি দাম্পত্য সম্পর্কেরই যতটুকু বা বাইরে থেকে দেখা যায় তা হিমবাহরই মতো। সামান্যই বাইরে থেকে দেখা যাবে। বাকিটা জলের তলায়। স্বামী এবং স্ত্রীর মতো কঠিন দুই চরিত্রে অভিনয় করতে প্রত্যেক মানুষকেই হিমসিম খেতে হয়। দৌড়ে দুজনেই একসঙ্গেই লাস্ট হয়। সন্তানের "কনসোলেশান" প্রাইজ বুকে করে সন্তানোৎপাদনেই দাম্পত্যর সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্টতম সার্থকতা এবং সন্তানদের কারণেই তাঁদের বেঁচে থাকা এই মিথ্যে কথাতে নির্জেদের চোখ ঠেরে দেখতে দেখতে জীবন কাটিয়ে দেন তাঁরা। জীবনের শেষে পৌঁছে মনে হয় "কিছুই তো হল না কে সেইসব সেই সব, সেই অশ্রু হাহাকার রব/কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই/কিছুই না পাইলাম/যাহা কিছু চাই/...."

হঠাৎ করে মন খুললাম আজকে রাজর্ষি তোমার কাছে। তোমারই ভাষায় বলি প্রথম বৃষ্টির পরশ পাওয়া "গুঁড়ি গুঁড়ি কুঁড়ি কুঁড়ি কিশলয়ের" মতো। অবশ্য এ কথা নিশ্চয়ই সত্যি বৃষ্টিরও যেমন প্রস্তুতি ছিল বহুদিনের ; বৃক্ষরও ছিল। লতারও ছিল। ধৈর্য ছাড়া কি কিছু হয় ? তুমি ভাল থেকো। তোমার ভালই আমার ভাল। এ কথাটি বলে ফেলতে পেরে ভারী ভাল লাগছে আমার আজ। সত্যি।

ইতি—ঋতি

* * *

ঋতি রায়,
বালীগঞ্জ কলকাতা

ঋতি। স্থিতি ; স্বপ্নস্বরূপিণী।

হোয়াট আ প্রেজেন্ট সারপ্রাইজ। পালাম্যুর বর্ষার পাড়-ভাঙা ক্ষমতা দেখছি অসাধারণ। তবে তোমার 'আপনি' বিসর্জন অনেক আগেই হয়েছিল। মনে মনে। আজ খাতা-কলমে হল।

অনেকেই "তুমি" সম্পর্কটিকে এড়িয়ে যান। অনেক দম্পতি, যাঁদের মধ্যে আগে শিক্ষক-ছাত্রী বা অন্যরকম কোনো সম্পর্ক ছিল তাঁরা বিয়ের পরও পুরনো সম্বোধনের জের টেনে চলেন দেখেছি। তবে আমি প্রথমে তোমাকে "তুমি" বলতে চাইনি। কারণ "তুমি" সম্বোধনটির মধ্যেই মনে হয় কোনো এক ধরনের প্রেমের সম্পর্ক সুপ্ত থাকে। সে কখন যে লাউডগা সাপের মতো হঠাৎ করে ছোবল দিয়ে সম্পর্কটিকে প্রেমময় করে দেবে তা আগে থাকতে জানা সম্ভব নয়। অবশ্য এ কথা ভুলও হতে পারে। এর বিপদের কথা জেনেও তোমাকে তুমি করেছি বহুদিনই।

তুমি অবশ্যই চলে আসতে পার। ঘন বরষণের মধ্যেই এসো। তোমার বন্ধু অশেষের সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই ; তবে মিত্রতাও তো প্রতিষ্ঠিত হল না। তাছাড়া ভয়

পাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ভয় ব্যাপারটি আদৌ আমার চরিত্রানুগ নয়। ভয়, যেসব মানুষ আমাকে দেখিয়েছেন এবং আজও দেখাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানেন না তা। ভয় ব্যাপারটা আসে মূলত চারিত্রিক দৌর্বল্য থেকে, অন্যায়ের পরিতাপ থেকে, অতিলোভের জ্বালা থেকে, ক্রূর চক্রান্তে পেছন থেকে ছুরি মেরে অন্যর আসনে যাঁরা কৌশলে আসীন হন তাঁদের অপরাধবোধ থেকে। না, আমার কোনো ভয় নেই। তুমি চলে এসো। এসে দেখে যাও বর্ষার রূপ। সত্যিই দেখার মতো। তোমার সমস্ত অন্তর-বাহির স্নিগ্ধ। হয়ে যাবে। পাখির ডাক, ঘুমঘুম ঘোর, কাঁথা গায়ে দেওয়া ঠাণ্ডা, বুনো কদমের ও যুঁইয়ের গন্ধ, রাতের খিচুড়ি তোমাকে মুগ্ধ করবে। ভারতের সমস্ত বনেই বলতে গেলে তিরিশে জুন থেকে তিরিশে সেপ্টেম্বর বনের পথ অব্যবহার্য হয়ে পড়ে।

টাইগার প্রোজেক্টের ভেতরে ঢোকা মানা হয়ে যায়। যদিও পালামৌতে ঢোকা যায়। তবু বর্ষাকালে যানবাহন ও মানুষের ভীড় অপেক্ষাকৃত কম থাকে। তবে অসংখ্য, অগণ্য, বিভিন্নাকৃতির এবং বিভিন্ন রঙের পোকামাকড়ের উপদ্রবের জন্যে তৈরি থাকতে হবে রাতের বেলায়। আলো দেখে তারা উড়ে আসে দ্রুত। আরও একটা ভয় এই সময়ে, সাপের। এই বাড়তি ভয়ও বর্ষার বনের এক বাড়তি আকর্ষণ।

পরশু দিন রাতে ছিলাম রুদ্-এর বাংলোয়। নেতারহাটের কাছে। তবে সমতলে। নদীর পাশে। সারাদিন ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এ অঞ্চলে নতুন-আসা একটা বাঘের চিহ্নিত এলাকা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি হয় না তখন হাওয়া না থাকলে বনের মধ্যে এক অসহ্য গুমোটের সৃষ্টি হয়। সারাদিন মেঘছেঁড়া রোদে আর গুমোটে অতিষ্ঠ-প্রাণ হয়ে শেষ বিকেলে বাংলোতে পৌঁছে ভাল করে চান করব ভাবলাম। রুদ্-এ বিজলী আলো নেই। পরে হয়তো আসবে। তবে নেই বলেই ভাল লাগে। শুনেছি, আগে এই পুরো অঞ্চলেই ছিল না। যাই হোক জামাকাপড় খুলে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কাঠের পাটাতনের উপর টাব্-এ জমিয়ে রাখা জলে সবে মগটি ডুবিয়েছি জল মাথায় ঢালব বলে অমনি দেখি ফোঁস্স্ করে উঠল কি ? এবং আওয়াজটা এল ঘরের দিকের দরজা থেকে। মানে, দরজা খুলে যে আমি ঘরে চলে যাব সে উপায়ও নেই। সঙ্গে কোনো আলোও নেই।

কয়েক মিনিট পরেই হ্যারিকেন রেখে যেত চৌকিদার। কিন্তু আমি দিন আর রাতের ঠিক সংযোগস্থলের ফালিটুকু দিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়াতেই এই বিপত্তি।

ফোঁস্স্ শুনে তো বুঝলাম এর জাত সুবিধের নয়। কিন্তু করি কি ?

একেবারে স্থির হয়ে উদোম মহাদেব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি পাটাতনের উপরে আর বুঝতে পারছি সাপটা পাটাতনের চারপাশে প্রদক্ষিণ করছে। বেশ বড় সাপ। বড় যে তা বাথরুমের ভেজা মেঝেতে তার চলার শব্দ শুনেই বুঝতে পারছি। সাপটা গরমে উত্যক্ত ও ক্লান্ত হয়ে বাথরুমের ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিল আর সেই আধো অন্ধকারেই আমার না দেখেশুনে ঢোকা। সে-ও দরজা-বন্ধ বাথরুম থেকে বেরোতে চাইছে আর আমিও চাইছি।

কারো প্রতিই কারো বৈরিতা নেই তবে অনবধানেও একটুখানি ছোঁয়াচ লাগলেও সর্বনাশ ঘটতে পারে। অন্তত একপক্ষের। ঠিক এইরকম ঘর-বন্ধ দমবন্ধ সাংঘাতিক অবস্থাতে অনেক দম্পতীই সংসার করেন, সংসার করা কাকে যে বলে তা না জেনেই। এই কারণেই ঋতি, তুমি যখন বিয়ে করবে, যাকেই কর খুব ভেবেচিন্তে করবে।

কিছুক্ষণ পরই লক্ষ্য করলাম যে দুটি দরজার মধ্যে বাথরুমের পেছনের দরজাটা আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার অপেক্ষাকৃত কাছে। ঘরের লাগোয়া দরজাটি দূরে। এদিকে

সাপের গতিক দেখে মনে হচ্ছিল যে সে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছিল বলেই পেছনের দরজা দিয়েই বেরোতে চাইছে। মানুষের সঙ্গে সাপের এই তফাৎ। নিরানব্বুই ভাগ মানুষই পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে বুক ফুলিয়ে সামনের দরজা দিয়ে বেরোন। অথবা সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে কোনো অপকর্ম করার পর পেছনের দরজা দিয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে যান।

আমি দাঁড়িয়ে আছি। দিগম্বর। এদিকে সে ব্যাটা সাপ যে কোন্ লিঙ্গর তাও অজানা। আমার শরীরের কোন্ অংশে বা অঙ্গে বা প্রত্যঙ্গে সে কামড় দেবে তারও কোনো ঠিক নেই।

ক্রমশই আমার ভয় বাড়লো। "ভয়টা আমার চরিত্রানুগ নয়" এ কথা বলেছি আগে তোমাকে। কিন্তু সেটা সাপের বেলায় প্রযোজ্য নয়। যেমন লজ্জা নারীর ভূষণ হলেও গানের বেলা প্রযোজ্য নয়। ছেলেবেলা থেকেই আমি সাপকে বড় ভয় পাই।

এবারে সাপটা নিত্য-গতিতে ক্রমাগত ঘুরে যাচ্ছে পাটাতনটিকে। প্যাচ্প্যাচে আওয়াজ হচ্ছে ভিজে মেঝেতে। এদিকে আবছা অন্ধকার ক্রমশ নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠছে। আগে, সাপকে দেখতে না পেলেও তার গতিস্মানতা অনুভব করতে পারছিলাম। আবছাকালোর মধ্যে ঘোরতর কালো কিছুকে প্রত্যক্ষ করছিলাম। পেছনের দরজার পাশেই একটা ভারী খিল থাকে। শালকাঠের। সেটাকে তুলে নিয়ে ব্যাটার মাথায় কায়দামতো মারতে পারলে তার ভবলীলা শেষ হয়। এবং আমারটা চালু থাকে। কিন্তু অত সহজ কর্ম নয় ঘনান্ধকারে শালকাঠের খিল দিয়ে এই বিষাক্ত সাপের মুণ্ডপাত করা।

মাছের ছায়া দেখে তাকে তীরবিদ্ধ করার মতো আইডিয়াল কণ্ডিশনস্ তখন ছিলো না। আমার যোগ্যতাও নয়। তাছাড়া মারামারির প্রশ্নই ওঠে না। যে-আমি এক বেচারা ট্রাক-ড্রাইভারের ট্রাকের চাকার তলায় লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা-করা একটি ব্যর্থপ্রেমিক ফিচকে বনবেড়ালকে "খুন" করার জন্যে পাঁচশো টাকা জরিমানা নচেৎ ছ মাসের জেল-এর বন্দোবস্ত করেছিলাম দু মাস আগে সেই আমিই নিজে হাতে সাপ মারি কি করে ? সাপের হাতে মরলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ইতিহাসে এবং সম্ভবত দেরাদুনের অফিসারস মেস্-এর দেওয়ালে আমার ছবি ঝুললেও ঝুলতে পারে কিন্তু সাপকে মারলে আমার ফাঁসীও হতে পারে। সেই মুহূর্তে আমি ভাবছিলাম যে বন-সংরক্ষণ বা প্রাণী-যতন যখন মানুষ নিধনের প্রেক্ষিতে বিচার্য হয়ে ওঠে তখন কিং-কর্তব্যম্ ?

আর বেশি না ভেবে, যেই মনে হলো যে সাপটির মাথা ঘরের দিকের দরজার কাছে, অমনি ছড়াক্ করে পেছনের দরজাটি খুলে তো আমি বীর দর্পে লাফিয়ে পড়লাম প্রাঙ্গণে। এবং লাফিয়ে পড়েই ফ্রিজ করে গেলাম। দেখলাম, আলো হাতে করে চৌকিদারের বৌ আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমি তো জন্মদিনের পোশাকে ! সাপের হাত থেকে প্রাণ যদি বা বাঁচালাম তো চৌকিদারের বউ-এর কাছে লজ্জা হারালাম। কী খিটক্যাল ! কী খিটক্যাল ! চৌকিদারের বৌ অ্যাবাউট টার্ন করে দৌড়োবার আগে আমিই অ্যাবাউট টার্ন্ করলাম। করেই চৌকিদারের বৌ-এর হাতে ধরা হ্যারিকেনের আলোয় দেখি সে ব্যাটা সাপও খোলা দরজা দিয়ে হিস্হিস্ করে বেরোচ্ছে। প্রায় আটফিট একটি কালকেউটে।

তাকে ভালো করে দেখেই তো চৌকিদারের বৌ বাপ্পারে ! আম্মারে ! করে ছুট লাগালো। এবং সাপটা একবার তাকে তাড়া করার ভাব করে আমার দিগম্বর মূর্তি দেখে লজ্জা পেয়ে কী মনে করে হাতার বেড়া পেরিয়ে নদীর দিকে প্রায় উড়ে চলে গেলো।

আমিও এককালে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে প্রচুর সাবান সহযোগে চান করতে

লাগলাম। ক্লন্তি এবং পাপ ধুতে।

ভালো থেকো। কবে আসছো জানাও।

ইতি রাজর্ষি

* * *

ঋতি রায়
বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯

বেতলা
পালামৌ/বিহার

ঋতি,

তোমার খবর কি ? আমার আগের চিঠি কি পাওনি ? নাকি শ্রুতিকে নিয়ে সুব্যস্ত আছো ? কুব্যস্ত না থাকলেই হল ! মনে হচ্ছে আমার তোমার এই পত্রমিতালি ঈশারউডের বিখ্যাত উপন্যাসের প্রতিভূ হয়েই থেকে যাবে। এ জন্মে তোমার আমার কাছে অথবা আমার তোমার কাছে আসা হবে না। তোমাকে একটা 'কু' এবং 'সু' খবর দেবার আছে। ক'দিন আগে এখানে একটি সেমিনার হয়ে গেল। তাতে আসামের সি সি এফ সঞ্জয় দেব রায় প্রিসাইড করলেন। মধ্যপ্রদেশের কান্‌হা থেকে অমর সিং পারিহার এসেছিলেন। পারিহার সাহেব এখন কান্‌হা টাইগার প্রোজেক্টের ফিল্ড ডিরেক্টর, দেব রায় সাহেব যেমন কিছুদিন আগেও ছিলেন আসামের মানাস টাইগার প্রোজেক্টের ফিল্ড ডিরেক্টর। অবশ্য মানাসকে পৃথিবী বিখ্যাত করার পেছনে সঞ্জয়দার অবদান বড় কম নয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছিলেন বি কে বর্দ্ধন রায়। তিনিও স্বক্ষেত্রে অত্যন্ত কৃতী এবং আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন অনুজ হিসেবে। ফরেস্ট সার্ভিসের বড় বড় মানুষদের কাছ থেকে এতো স্নেহ পাওয়ার যোগ্যতা হয়তো আমার নেই। তাই কৃতজ্ঞ লাগে খুবই।

যাই হোক, আসল কথাটা হল যে এই সেমিনারে অল ইণ্ডিয়া-লেভেলে সিলেকশন হয়েছে। আমি এবং ওড়িশা ফরেস্ট সার্ভিসের পানিগ্রাহী সাহেব আফ্রিকার তানজানিয়ার বনে একমাসের জন্যে যাব। তোমাকে আগেই বলেছি যে একবার এর আগেও গেছিলাম আমি।

কলকাতা হয়ে গেলে তোমার সঙ্গে দেখা করে যেতাম। কিন্তু সরকারি ব্যাপার। এখন রাঁচী-পাটনা-দিল্লি হপিং-ফ্লাইট আছে। সেই ফ্লাইটে দিল্লি পৌঁছে বম্বে হয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার ফ্লাইটে ডার-এস-সালাম্-এ গিয়ে পৌঁছব। কিনিয়াতেও যেতে হবে তানজানিয়া থেকে ফেরার পথে। কিনিয়ার রাজধানী নাইরোবি। নাইরোবি থেকে ফেরার পথে ইচ্ছে আছে, নিজের খরচেই সেশেলস্ দ্বীপপুঞ্জ হয়ে আসব। দিন সাতেকের জন্যে। শুনেছি সেশেলস্ নাকি দেখার মতো জায়গা। অত সুন্দর বেলাভূমি নাকি পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই আছে।

পূর্ব-আফ্রিকাতে জুন-জুলাই-আগস্ট হচ্ছে শীতকাল। অতএব এই সময়ে যাওয়াই ভাল। বাংলায় যাকে বলে "প্রশস্ত", তাই। এই "প্রশস্ত" শব্দটি কেন যে এই অর্থে ব্যবহৃত হয় তা জানি না। তোমার বাংলাবিশারদ বন্ধুরাই বলতে পারবেন। আমার মতো

অর্ধশিক্ষিত হিন্দীবিশারদদের পক্ষে বৈয়াকরণ হওয়া সম্ভব নয়।

যেতে হবে আগামী বুধবারে। একেবারে "ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে"র মতো ব্যাপার। জানি না, যাওয়ার আগে তোমার আর কোনো চিঠি পাবো কি না! তুমি এখন থেকে পৌনে দুমাস আমাকে কোনো চিঠি লিখো না কারণ আমার ঠিকানা কখন যে কি হবে তা আমি নিজেই জানি না। আমিই তোমাকে লিখব। সব জায়গা থেকে লিখতে পারবো না এবং লিখলেও তুমি হয়তো সে চিঠি পাবে আমি দেশে ফিরে আসার পর। তাই। বছরের এই সময়ে আমার পক্ষে আমার পরিবারবর্গকে (বাঘ পরিবার) ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। বর্ষা এসে গেলে জঙ্গলে পাহাড়ে সব জায়গাতেই জল থাকে। তাই তৃণভোজী জানোয়ারেরা জঙ্গলময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। তাদের খাবারেরও অভাব হয় না কোথাওই। তাই এই সময়ে বাঘের পক্ষে তাদের স্বাভাবিক শিকার ধরাটা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে শীত বা গ্রীষ্মর তুলনাতে। এবং সেই জন্যেই "প্রোজেক্ট টাইগারের" এলাকার মধ্যের গ্রামের গৃহপালিত গবাদিপশু বর্ষাকালেই বাঘের হাতে বেশি মারা পড়ে। গরিব গ্রামবাসীদেরও অনেকই অসুবিধে হয়। তাদের ভালো-মন্দ দেখার ভারও তো আমাদেরই। যদিও আমি ঋতিকে যতখানি ভালোবাসি তার চেয়েও বাঘকে বেশি ভালোবাসি এবং তাদের প্রজাতির সংখ্যা যাতে নির্বিঘ্নে বাড়ে তা এদেশীয় রাজনৈতিক নেতাদের ভোটারের সংখ্যা বাড়ার জন্যে কাতর প্রার্থনার মতোই প্রার্থনা করি তবু মাঝে মাঝেই মনে হয় যে, যে দেশে মানুষ এখনও মনুষ্যেতর জানোয়ারেরই মতো কোনোক্রমে বেঁচে থাকে সেই দেশে মানুষের অশেষ অসুবিধা করে এমনকি মানুষের জীবনের মূল্যেও বাঘ বাড়াবার প্রচেষ্টা আদৌ মনুষ্যজনোচিত প্রচেষ্টা কী না! "ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ড" বাঘ এবং অন্যান্য বিলুপ্তপ্রায় পশুর সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টায় কোটি কোটি টাকা মঞ্জুর করেন। তাঁরা ভারতবর্ষের গ্রাম এবং বন জঙ্গলের সাধারণ মানুষদের দুরবস্থার কথা বোধহয় জানেন না। জানলে, বিলুপ্ত-প্রায় পশুদের নিত্য-মৃত মানুষদের চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে করতেন না।

ভারতবর্ষে যে সব জায়গাতে টাইগার প্রোজেক্ট হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ বনেই বনের ভিতরে অসংখ্য গ্রাম এখনও আছে। যেখানে গ্রাম নেই সেখানের বনেও গরিব মানুষদের দুমুঠো ভাতের সংস্থানের জন্যে নিত্য আনাগোনা করতে হয়। সুন্দরবনের জেলে, মৌলে এবং বাউলে। বাঘের হাতে এই সব হতভাগ্য মানুষদের জীবন, জীবিকা এবং অন্য জায়গার গ্রামের মানুষদের স্থাবর সম্পত্তি প্রতিবছর নষ্ট হয়। "প্রোজেক্ট টাইগারের" জন্যে যে টাকা বরাদ্দ সেই টাকার একটি বড় ভাগ এই মানুষদের বেঁচে থাকার জন্যে যদি দেওয়া যেত তাহলে আমি খুশি হতাম। আরো বেশি আনন্দের সঙ্গে যে কাজ করি, সেই কাজ করতে পারতাম।

অবশ্য অনেকেই বলেন যে, যে-দেশে মানুষ কুকুর-বেড়ালের চেয়েও অধম জীবন যাপন করে সেই দেশে মানুষদের কথা ভেবে লাভ কি? বুক ভেঙে গেলেও বলতে হয় যে, কথাটা হয়তো আংশিক সত্যিও। গত একচল্লিশ বছরে যাঁরা দেশের কর্তা ছিলেন তাঁরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে কিছুতো করেনইনি উল্টে তাঁদের অনুগামীদের সংখ্যা যাতে বানের জলের মতো নির্বিঘ্নে বাড়ে সেই চেষ্টাতেও সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা তাঁদের গদীকে ছাড়া এ দেশীয় কোনোকিছুকেই ভালোবাসেননি। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে যদি অন্যরা ক্ষমতাসীন হন তবে তাঁরাও ভাববেন কি না তাও আমি, তুমি জানি না। তবে এ কথা নির্মম হলেও অবশ্যই সত্যি যে তোমার বা শ্রুতির ছেলেমেয়েরা এ দেশে মানুষের মতো হয়তো বাঁচতে পারবে না।

দিনে দিনে, বছরে বছরে দেশের অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ অত্যন্ত ঘোরালো ও জটিল হয়ে উঠছে। এইভাবে, এই পথে দেশ যদি আর দশ বছরও চলে, যদি বাধ্যতামূলকভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এখনও না করা হয় তাহলে এই সুন্দর দেশ সর্বতোভাবে সম্পূর্ণই নষ্ট হয়ে যাবে। দেশের সাধারণ মানুষেরা যদি ন্যূনতম মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রাই না পায় তাহলে নেতারা কী বললেন আর বললেন না, কম্যুনিস্ট হলেন না ক্যাপিটালিস্ট তাতে কিছুই যাবে আসবে না। দেশের গরিবদের তো বটেই, বড়লোকদেরও। নেতাদের হাতেই এই দেশের সর্বনাশ হয়েছে এবং সর্বনাশের চরম ঘটবে তাঁদেরই হাতে। যদি না তাঁরা এখনও বিবেকসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। আমাদের সকলকেই এখান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু যাবটা কোথায় ? ইহুদিদের জাত তো আমরা নই যে মরুভূমিতে গিয়ে ইজরায়েলের মতো নতুন দেশের পত্তন করব ! ইঁদুরের মতো লাখে লাখে গিয়ে আমাদের বঙ্গোপসাগরেই ঝাঁপ দিতে হবে।

মানুষই তো দেশ গড়ে। যে দেশের মানুষ মেরুদণ্ডহীন, ক্লীব, স্বার্থপর, নিজের হাতের কাছের ভবিষ্যৎটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখে না, ভাবে না, নিজের পায়ের পাতাতে অন্যর জুতোর চাপ না পড়লে, নিজের বোন বা স্ত্রী অত্যাচারিত না হলে, নিজের পরিবার অভুক্ত না থাকলে যাদের বিন্দুমাত্রও আসে যায় না তাদের ভবিষ্যৎ তো এমনই হওয়ার কথা। জাতীয় জীবনে যে দেশ যতটুকুই পেয়েছে সেই দেশ সেইটুকু পাওয়ার জন্যে যথাযথ মূল্য দিয়েছে। সেই মূল্যে না কিনতে পারলে কোনো প্রাপ্তিই থাকে না ; থাকবে না। প্রাপ্তির মধ্যে স্বাধীনতাও পড়ে। অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয়ও। মাঝে মাঝে ভাবি যে নেতাদের দোষ দিয়েই বা কি হবে ? নেতারা তো আকাশ থেকে পড়েনি। আমরাই তাঁদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছি। আমরা যেরকম চরিত্রর মানুষ হব নেতারাও তো তেমন চরিত্ররই হবেন। আমরা যদি মূর্খ, মূঢ়, নিদ্রালস, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন হই তাহলে এর চেয়ে ভালো অবস্থা তো প্রত্যাশাও করতে পারি না।

জানি না কেন, দেশের কথা মনে এলেই আমি বড় উত্তেজিত বোধ করি। অথচ চোখের সামনে সংঘটিত হাজারো অন্যায়ের একটিরও প্রতিবিধান করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। তবে প্রতিবাদ নিশ্চয়ই করি, সরকারি চাকরি করে যেটুকু প্রতিবাদ করা সম্ভব। সকলেই যদি একটু করে প্রতিবাদ করতেন তবে সেই সব টুকরো টুকরো "প্রতিবাদই" একীভূত হয়ে SNOW-BALLING EFFECT-এ "প্রতিবিধান" হয়ে উঠত একদিন। দেশের দশের কথা যদি কেউই না ভাবেন তাহলে আমার মতো চুনোপুঁটি ক্ষমতাহীন একা মানুষ ভেবেই বা কি করব ? তবু যার যেমন স্বভাব সে তাই করে। দেশভরা প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ-বুদ্ধিজীবীদেরই যদি দেশ নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা না থাকে তবে আমার মতো আকাট, জংলী একা লোকের ভেবে ভেবে মাথাব্যথা ঘটিয়ে লাভ কি বলো !

এবারে অন্য কথাতে আসি। দেশ ছেড়ে নিজের কথাতে। এই কথাও কম ভারী নয়। আমি আফ্রিকাতে চলে যাবার আগে তোমাকে বনীর কথা অকপটে বলে যাওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। তুমি অনেকদিনই ধৈর্য ধরেছ। তাছাড়া তুমি তোমার একান্ত আপনজন ভেবে তোমার অনেক ব্যক্তিগত কথাই আমাকে জানিয়েছ। তাই আমারও সময় হয়েছে এখন আমার ব্যক্তিগত কথা বলবার।

বনীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয় সম্বন্ধ করেই। কলকাতায় আমার এক মামীমা থাকেন। তিনিই সম্বন্ধ আনেন এবং বিয়ের আগে আমি একবার কলকাতা গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করে আসি। ওর আমাকে কেমন লেগেছিল জানি না তবে আমার ওকে খুবই ভালো

লেগেছিল। সম্ভ্রান্ততা ছিল বনীর ব্যক্তিগত **Key-note**। পায়ের পাতা থেকে হাতের আঙুল, চোখের পাতা থেকে চিবুক, চুল থেকে হাতের নখের কোথাও কোনো খুঁত ছিল না ওর। ওর সুন্দর মুখে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বময় বুদ্ধির এমন এক প্রসাধন ছিল যা খুব কম মেয়ের মধ্যেই দেখেছি। তুমিও অসাধারণ সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না কিন্তু তোমার সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব অন্যরকমের। ভাগ্যিস। নইলে এক বনীকে দু'দুবার ভালোবাসা তো যেত না! প্রত্যেক মানুষই আলাদা। কী নারী, কী পুরুষ। তাদের ব্যক্তিত্ব ও সৌন্দর্যর রকমটা আলাদা না হলে এবং প্রত্যেকেরই রুচি ও মানসিকতা আলাদা না হলে একই নারীকে পাওয়ার জন্য পুরুষদের মধ্যে এবং একই পুরুষকে পাওয়ার জন্যে নারীদের মধ্যে দাঙ্গা বেধে যেত। ছোটখাটো দাঙ্গা যদিও তবু বাধে। তা হলেও এক জীবনে নিজের রুচি ও পছন্দমতো মানুষের ঘাটতি ঘটে না বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের মধ্যে। এইটাই মস্ত বাঁচোয়া।

ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ওকে নিয়ে গড়িয়াহাটের কোয়ালিটিতে ডিনার খেয়েছিলাম। তারপর ট্যাক্সি করে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলাম। বনী ওর মা-বাবাকে খুব ভালবাসতো। শ্রদ্ধাও করত। যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ওর মতো বুদ্ধিমতী মেয়েকেও বোকার মতো এক অতি সস্তা চালাকির আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। অনেক সময় আমাদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার প্রকাশটা আমরা যা বলতে চাই বা করতে চাই তার ঠিক বিপরীতটাই ঘটিয়ে বসে। পরে ভুল বুঝতে পেরে মাথা খুঁড়ে মরতে হয়। বনীর চেয়ে বয়সে সামান্যই বড় এক মামাতো দাদার সঙ্গে কৈশোর বয়স থেকে ওর প্রেম ছিল। এবং সেই প্রেম পরিণতি পায় শারীরিক সম্পর্কে। বনী কন্‌সিভ্ করে আমার সঙ্গে বিয়ের দু মাস আগে।

ও তার মামাতো দাদাকে বলেছিল তাকে বিয়ে করতে। নইলে তার সঙ্গে লিভ-টুগেদার করতে। কিন্তু সেই বীরপুঙ্গব রাজী হননি। তাঁর রোজগার বলতেও তখন কিছু ছিল না। ইনসিওরেন্সের এজেন্সিতে যৎসামান্য আয় করতেন। বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় বনী অ্যাবর্শানও করাতে চেয়েছিল। তাঁকে বলেছিল সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। তাতেও তিনি রাজি হননি। ইতিমধ্যে ওর বিয়ে ঠিক হয়ে যায় আমার সঙ্গে এবং বনী সেই "ভদ্রলোকের" প্ররোচনায় আমাকে বিয়ে করে তাদেরই সন্তানের পিতৃত্ব আমার ঘাড়ে চাপানর চক্রান্ত করে।

আমি হয়তো বুঝতেও পারতাম না। তবু আমার মনে কেবলই খট্‌কা লাগত। বনী যখন আমার সঙ্গে মিলিত হত তখন নীরবে কী যেন বলতে চাইতো আমাকে। আমি ওর শারীরিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। জীবনে নগ্না নারী তার আগে কখনও দেখিনি কিন্তু বনীকে দেখে মনে হত ও যেন পরিচ্ছন্নতার সংজ্ঞা। ওর মাথার সিঁথি থেকে শুরু করে ঊরুসন্ধির সিঁথি, ওর গ্রীবা থেকে পায়ের গোড়ালি এবং হাত-পায়ের নখের থেকেও এক ধরনের উজ্জ্বল দীপ্তি যেন ঠিকরে বেরুতো। আমার মনে হত আমি কোনো দেবকন্যার সঙ্গে মিলিত হচ্ছি। ভিন্‌দেশি পিংক-হেডেড পোচার্ড হাঁসের মতো গোলাপি রঙা ছিল ওর স্তনবৃন্তর রঙ। ঘরের বাইরের প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য যেন পরিস্রুত হয়ে বনীর নিভৃত নির্জন শরীরে প্রতিবিম্বিত হয়ে আমার অপেক্ষায় থাকত পরিপ্লুত হবে বলে।

দিনের বেলা বনী উদাস চোখে বাইরে চেয়ে বসে থাকত জানালার পাশে। আমাকে দেখলেই হাসত। কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম যে ওর হাসিটার ঠিক নিচের স্তরে কোনো গভীর কান্নার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। অথচ তার কারণ বুঝতাম না।

বনী মাঝে মাঝেই বমি করত। শুয়ে থাকত। অনভিজ্ঞ আমি ভাবতাম কুমারী মেয়ের

প্রথম মিলনের পর বোধহয় এই সব উপসর্গ দেখা দেয়। আমি কনট্রাসেপটিভ ইউজ করতাম কিন্তু ও প্রথম থেকেই তাতে আপত্তি করত। আমার মা এসে আমার সঙ্গে পনেরোদিন থাকবেন বলে জানালেন। মায়ের চিঠি পাবার পরই মায়ের কাছে ধরা পড়ে যাবে এই আশঙ্কাতে বনী একদিন কান্নায় ভেঙে পড়ে আমাকে সব বলল। বলল, কাল যখন জীপ নিয়ে গিয়ে চিপাদহের রেল লাইনের পাশে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম পথের নিচ দিয়ে ম্যাকলাস্কিগঞ্জ আর মহুয়ামিলনের দিকে ট্রেন যাওয়া দেখব বলে, তখনই ও ট্রেনের তলায় লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করত কিন্তু তার পেটের ভেতর যে আছে তার কথা ভেবে এবং আমার কথা ভেবে ও তা করতে পারেনি। ও বলেছিল আমাকে কলকাতার ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে ডালটনগঞ্জ স্টেশন বা চিপাদহের থেকে। ও একাই চলে যেতে পারবে।

বনী আমার দু হাঁটুর উপরে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। বলছিল, "আমি নীচ। আমি খারাপ। আমি তোমাকে জেনেশুনে ঠকিয়েছি।"

একবার বনী বলেছিল অ্যাবর্শান করাবারও কথা।

আমি তিনদিন অনেক ভাবলাম। ভেবে দেখলাম যে-অনাগত সন্তানের জনক আমি নই তাকে নষ্ট করার অধিকারও কোনো মতেই আমার নেই। নষ্ট করার ইচ্ছা বনীরও নেই। থাকলে, ও তো সেদিন আত্মহত্যা করতেও পারত। যদিও আত্মহত্যা করা মুখের কথা নয়। মানুষ নিজেকে যতখানি ভালোবাসে ততখানি আর কাউকেই বাসে না। নিজের সন্তানকেও হয়তো নয়। তবে অনাগত সন্তান এবং বিশেষ করে প্রথম সন্তানের বেলাতে সব মেয়েরই এক অসীম দুর্বলতা থাকে। সন্তান তো নিজেরই এক খণ্ড। মায়ের যতটা বাবার ততটা কখনওই নয়। তাছাড়া সেই খণ্ড পূর্ণর চেয়েও বড় কারণ তার মধ্যে আদিম স্রষ্টার সৃষ্টির যাদুর পরশ যতখানি থাকে মানুষের আর খুব কম সৃষ্টির মধ্যেই থাকে।

সেই মুহূর্তে বনীর দুঃখ ওর অসহায়তা আমাকে যেমনভাবে বিদ্ধ করেছিল তার কোনো তুলনাই জানা ছিল না আমার।

আমার সামনে-বসা আমার হাঁটুতে মুখ-রাখা বনীকে আমি পদাঘাত করতে পারতাম। আমার জীবন নষ্ট করার জন্যে তাকে কটু-কাটব্য করতে পারতাম। কিন্তু হঠাৎই দেখলাম সেই মুহূর্তে যে, আমি আমার খোলের মাপের বা আয়তনের চেয়ে অনেকই বড় হয়ে গেলাম। ফাইটার প্লেনের পাইলটের মতো, সেনাবাহিনীর সদ্য-কমিশান-পাওয়া অসীমসাহসী কোনও তরুণ সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্টের মতো। যাঁরাই সাহসের পরিচয় দেন তাঁরা সকলেই আমার তোমারই মতো সাধারণ মানুষ। কোনো বিশেষ মুহূর্তে তাঁরা আমার তোমার চেয়ে বড় হয়ে জ্বলে ওঠেন। সেই মুহূর্ত যে কখন আসবে তা তাঁরা নিজেরাও জানেন না—পূর্ব মুহূর্তেও। কেউ জ্বলে উঠেই খসে যান শুটিং-স্টারের মতো। কেউ বা থেকে যান পরে অতি সাধারণ এবং ভীরুর জীবনযাপন করবেন বলে। একবার অসমসাহসিক কাজ করলেই যে কেউ রীপিট-পারফরমেন্স্ করতে পারবেন এমন কথা বলা যায় না। আমার ক্ষেত্রে তো বলা যায়ই না।

বনীর মুখ থেকে সব শোনার পর ওকে চুমু খেয়ে বুকে তুলে নিয়ে বলেছিলাম "তোমার কী দোষ ? যে-পুরুষ এমন কাপুরুষ, দোষ তো সব তারই। কোনো ভয় নেই। যা করার আমি করব।"

ও বড় বড় চোখে চেয়ে অবিশ্বাসী গলায় বলেছিল "তুমি আমাকে এমনি ছেড়ে দেবে ? প্রতিশোধ নেবে না আমার উপর ?—তোমার আত্মীয়স্বজনেরা ? তোমার জীবন নষ্ট করে দিলাম বলে !"

আমি বলেছিলাম, যা নষ্ট হয়ে গেছে তাকে ভ্রষ্টতার হাত থেকে বাঁচাতে পারাটাও মস্ত কথা। তোমার কিছুই হারায়নি বনী। হয়তো আসলে নষ্ট কিছুই হয় না। রঙই বদলায় শুধু। আমি তোমাকে নিজে নিয়ে গিয়ে তোমার মা-বাবার হাতে সঁপে দেবো। ওঁদের বলব আমার যদি কোনো অনুযোগ না থাকে তবে আপনাদেরই বা থাকবে কেন ? ওর এবং ওর সন্তানের জীবন বাঁচাতে আমি যদি উদ্যোগী হতে পারি তবে আপনারা হবেন না কেন ? যা বলেছিলাম, তাই করেছিলাম। কী করে পেরেছিলাম জানি না। জানো ঋতি ! আমি বোধহয় গতজন্মে কোনো যাত্রাদলের নায়ক-টায়ক ছিলাম। নইলে এমন সব যাত্রা-সম্ভব কাজ অবলীলায় করে ফেলা আদৌ সম্ভব হত না। এ কথা অবশ্যই বলব যে, জীবনে যে সব ভালো কাজ করেছি তার মধ্যে এটি অন্যতম।

এখন বনী স্বাবলম্বী। এবং হয়তো শিগগিরই ওর মামাতো দাদার সঙ্গে ও স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকবে কারণ বনীর রোজগার ছাড়াও তাঁরও একটি ভালো চাকরি জুটেছে এতদিনে। তোমাকে লিখেছিলাম যে বনী আর তৃণা আমার কাছে এসেছিল। তোমাকে তখন যা লিখিনি, ন্যায্য কারণেই গোপন করেছিলাম, তা হচ্ছে বনীর সঙ্গে আমার যখনই দেখা হয় তখনই শারীরিক ভাবেও আমরা মিলিত হই। এবং হয়তো ভবিষ্যতেও হব। ও তো আমার বিবাহিত স্ত্রীই ছিল একদিন ! তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অন্য কোনোদিকে মোড় নেবার আগে আমার এ কথা তোমাকে স্পষ্ট করে জানানো দরকার। তোমাকেও আমি এক ধরনের ভালোবাসা বেসেছি। যেমন ভালোবাসা, বনী ছাড়া আর কাউকেই বাসিনি। কিন্তু বনীকে আমি ভালোবাসি। এবং ভালোবাসবও। কোনো নারী ও পুরুষের সঙ্গে একবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে তা পরবর্তী জীবনে থেকে যায়। আমার এই সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো পাপবোধও আমার নেই। বনীরও নেই। বনী তার দাদাকেও এ কথা জানিয়েছে। এই সম্পর্ক বিপত্তারণের "ট্যাকসো" নয়। একজন নারী-পুরুষের একে অন্যের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসার ফসল। সংসারে অনেককিছু ঘটে ঋতি যা গল্পের চেয়েও আশ্চর্য। কিন্তু আমি যা বলছি তা আমার অভিজ্ঞতালব্ধ কথা। জীবন-সঞ্জাত কথা। কবি-কল্পনা নয়। তোমার সঙ্গে আমি মিথ্যাচার করতে চাই না। তাই আমার যা বলার তোমাকে অকপটে তা বললাম।

এবার তোমার পালা আমাকে যা বলার তা বলার।

পত্রপাঠ যদি উত্তর দাও তবে বুধবারের আগেই সে চিঠি পাবো। ক্যুরিয়ার সার্ভিসে পাঠালে তো কথাই নেই। তাই পাঠিও। তাতে তুমি ভেবে দেখার সময় পাবে বেশি। যদি আরও সময় চাও তো তাও দেব। ওই সিদ্ধান্তর বোঝা তোমার সারাজীবন টানতে হবে। সে কথা ভুলো না।

ভালো থেকো।

ইতি তোমার ভ্রষ্ট, স্খলিত রাজর্ষি

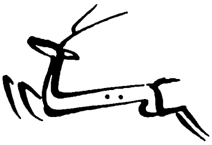

রাজর্ষি বসু
বেতলা, পালামু বিহার

বালীগঞ্জ প্লেস
কলকাতা

প্রিয়বরেষু,

তোমার চিঠি পেলাম। পাওয়ার পর থেকেই কলম কামড়াচ্ছি। জীবনে এই প্রথম কারো চিঠির উত্তরে কী লিখব তা ভেবে দিশেহারা হচ্ছি। তোমার মতো মহৎ ও উদার পুরুষমানুষ খুব কমই আছেন, হয়তো। বনীর প্রতি তোমার যে ব্যবহার তাই তোমাকে বনীর আজীবন ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা দিয়েছে। আমি যদি বনী হতাম তাহলে হয়তো আমিও ঠিক বনীর মতোই হতাম। কিন্তু আমি যে আমিই। ঋতি। তোমার প্রশ্ন এবং অকপট কথন আমার মনের ভিত ধরে নাড়া দিয়েছে। তুমি কী সহজ অবলীলায় প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিয়েছ আমার দিকে। আমি যদি তেমন সহজে উত্তরটি দিতে পারতাম!

তুমি এখন দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকবে। আমার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই দু মাসের মধ্যে। তাই তাড়াহুড়োতে উত্তর দিতে চাই না। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে চিঠিতে না দিয়ে হয়তো নিজে গিয়েই উত্তরটি দেব। কী উত্তর দেব তা আপাতত উহ্যই থাক। ভালোভাবে বেড়িয়ে এসো, থুড়ি, সেমিনার করে এসো। আমাকে সময় পেলেই চিঠি লিখো। তোমার চিঠির মাধ্যমে আমারও আফ্রিকা দেখা হয়ে যাবে। ভাবতেই ভালো লাগছে।

তোমার মতো সরল ও সৎ মানুষ আজকের পৃথিবীতে সত্যিই বিরল। তবে আমার মনে হয় তোমার যেটা গুণ সেটাই তোমার দোষ। তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিলো এক শরতরাতের শুভক্ষণে। সেই মুহূর্তটিকে প্রলম্বিত করে আমার জীবনে স্থায়ী করে রাখতে পারলে খুবই খুশি হতাম। আপাতত এইটুকু বলেই শেষ করি।

I wish you a safe landing at DAR-ES-SALAM. Take care!

ইতি—তোমার ঋতি

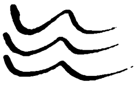

ঋতি রায়
বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা

আরুশা
তানজানিয়া, পূর্ব-আফ্রিকা

ঋতি, কল্যাণীয়াসু,

কাল দুপুরে এখানে এসেছি। ডার-এস্-সালাম থেকে। তানজানিয়ান এয়ার লাইনস-এর

প্লেনে এসেছিলাম। আরুশা এয়ারপোর্টে পৌঁছে ডাইনে গেলেই মাউন্ট কিলিমানজারো। তুমি নিশ্চয়ই আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'স্নোজ অফ কিলিমান্‌জারো' বইটি পড়েছো। ছবিও হয়েছিলো সে বইয়ের। গ্রেগরী পেক নায়ক এবং নায়িকা হয় আভা গার্ডনার নয়তো ডেবোরা কার্‌র। ঠিক মনে নেই। স্কুলে পড়ার সময় দেখেছিলাম।

এয়ারপোর্ট থেকে বাঁ দিকে এলাম আমরা। আরুশার হোটেল থেকে সামনে চাইলে মাউন্ট মেরু চোখে পড়ে। এই উঁচু পাহাড়ে এখনও পূর্ব-আফ্রিকার বিখ্যাত ও কুখ্যাত জাতি মাসাইরা বাস করে। তাদের "ইল্‌মোরান্‌দের" কথা নিশ্চয়ই পড়েছো তুমি। পৃথিবীতে এমন গর্বিত ও আশ্চর্য-করা উপজাতি খুব কমই আছে। না পড়ে থাকলে, এদের সম্বন্ধে বুদ্ধদেব গুহ'র লেখা একটি বই আছে "ইল্‌মোরান্‌দের দেশে"। সেটি পোড়ো। ভালো লাগবে।

ডার-এস্-সালাম শহরটি যে-কোনো আধুনিক শহরেরই মতো। তান্‌জানিয়া সোস্যালিস্ট দেশ। এখানে যে সব ট্যুরিস্ট আসেন তাঁদের মধ্যে বেশিই ইস্ট ইয়োরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলি থেকে। এখানের এক পরিচিত ভারতীয় ভদ্রলোক আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে হোটেল "মাউন্ট কিলিমানজারোর" ঘরগুলির প্রত্যেকটিই "বাগড্‌"। তান্‌জানীয়ান সরকার সম্বন্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য করা খুবই বিপজ্জনক। কম্যুনিজম্-এর ভালো দিক হয়তো নিশ্চয়ই কিছু আছে কিন্তু এই একটা ব্যাপার বড় খারাপ লাগে।

ইউনাইটেড স্টেটস্ অথবা ইংল্যাণ্ডে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে তুমি সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীকে অপছন্দ হলে অ্যামপ্লিফায়ারের সামনে সে কথা তাদের নিজস্ব ভাষায় চেঁচিয়ে বলতে পারো। কিন্তু রাশিয়া তো দূরস্থান! তান্‌জানিয়াতেও হোটেলের ঘরে বসেও রাষ্ট্রর কোনোরকম সমালোচনা অত্যন্ত বিপজ্জনক। শুধু বিদেশীদের পক্ষেই নয় এদেশীয়দের পক্ষেও। ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা ঘোষণার সময় যেমন হয়েছিলো তেমনই অবস্থা এখানে হরওয়াক্ত্। এমন এমন রাষ্ট্রে রাষ্ট্র যেন রাষ্ট্রপ্রধান এবং আমলাদেরই পৈতৃক সম্পত্তি! জনগণের স্বাধীন চিন্তা ও মতামত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতাই নেই, স্বদেশের পক্ষে কী ভালো আর কী খারাপ তা বলার বা প্রকাশ করার অধিকারও নেই। ফ্রীডম অফ স্পীচ, ফ্রীডম অফ প্রেস কিছুই নেই। যেই মন্দ বলবে সেই দেশদ্রোহী। এমন বাঁচা বাঁচতে কারই বা ইচ্ছে করে? "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়?" তান্‌জানিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। বাড়ির কাজের লোকদের মাইনে এবং ছুটি রাষ্ট্র ঠিক করে দিয়েছে। কিন্তু আইন করলেই তো হয় না, যে কোনো দেশেই যদি অগণ্য বেকার মানুষ থাকে এবং তাদের জন্যে যথেষ্ট কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত না করতে পারে রাষ্ট্র তবে এই সব আইন করে ভোট পাওয়া যায় কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের কোনো উপকারই হয় না। আইন এখানেও আমাদের দেশেরই মতো "কেতাবী" আইন। খেতে না পেলে আইন ভেঙেই কাজ করবে নারী পুরুষ শিশুরা। আর যারা ধনবান তারা তো তাদের এক্সপ্লয়েট করবেই। তাছাড়া পুরোপুরি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রেতো ভোটাধিকারও থাকে না। ছড়ি আর লালচোখ আর রাইফেল দেখিয়ে সেখানে রাজ্যচালনা ও প্রজাপালন হয়। তবু বলবো, কম্যুনিস্ট দেশ অন্ধ ধর্মর অনুশাসন মেনে চলা রাষ্ট্রগুলির চেয়ে অনেকই ভালো। কম্যুনিজম্, শিক্ষিত মানুষদের মস্তিষ্কপ্রসূত ব্যাপার কিন্তু এক-ধর্ম-রাষ্ট্র বর্বরদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। বিশেষ করে যে-সব ধর্ম লুণ্ঠন অত্যাচার ধর্ষণ, আর যাঁরা তাদের ধর্মে অবিশ্বাসী সেই মানুষদের সমস্ত কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সমূল বিনাশে বিশ্বাসী। এই অভিযোগ আমার কল্পনাপ্রসূত নয়। পৃথিবীর ইতিহাসই এই অভিযোগের নীরব কিন্তু বাঙময় সাক্ষী। কম্যুনিস্টরা ধর্মেই বিশ্বাস করেন না তাই কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র ঐসব বর্বর-রাজের চেয়ে অনেকই

ভালো।

এয়ারপোর্টের নামও কিলিমান্‌জারো। সেখান থেকে যখন গাড়িতে আরুশা আসছিলাম তখন পথের দুপাশে চেয়ে আমার দেশের কথাই মনে পড়ে গেলো। বার বার। পথের দুপাশে আমাদের দেশেরই মতো গরিব মানুষদের কুঁড়েঘর। টায়ার-সোলের চটি-পরা-দড়ি-বাঁধা-চশমা-নাকে দারিদ্র-ক্লিষ্ট মানুষ। রোদে-পোড়া আধপেটা খাওয়া গ্রামীণ মানুষ। অথচ ডার-এস্-সালাম শহরের পাঁচতারা হোটেলের ওদেশি অভ্যাগতদের দেখে আমাদের দিল্লির সারসার পাঁচতারা হোটেলগুলির কথাই মনে পড়ে যায়। এসব দেখে শুনে মনে হয় যে মিথ্যে গণতন্ত্র আর মিথ্যে অটোক্র্যাটিক কম্যুনিজম্-এর মধ্যে তফাৎ বিশেষ নেই। দুয়েতেই সাধারণ, আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন, বিবেকবান সৎ মানুষের সমান নিগ্রহ। দেশকে ভালোবাসা সমান অপরাধ। মোসাহেব আর চামচেদের জয়জয়কার এই দুই দেশেই। সেদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে আজকের পাইলট-চালিত ভারতবর্ষ এবং তানজানীয়ার মধ্যে তফাৎ বিশেষ নেই। নেই-ই বলতে গেলে। নেতার কথায় বিবেচনাও বিবেকহীন ভাবে নির্বুদ্ধি অথবা দুর্বুদ্ধির জন-প্রতিনিধিদের গড্ডালিকার সঙ্গে মুষ্টিমেয় স্বৈরাচারীদের জোর করে চাপানো ধ্যান-ধারণাতে চলা দেশের মধ্যে তফাৎ বিশেষ নেই। তবু আবারও বলবো যে এই দুই রাষ্ট্রই এক-ধর্মর ধ্বজা-ওড়ানো যে-কোনো রাষ্ট্রর চেয়েই বহুগুণ ভালো।

আরুশা থেকেই পৃথিবী-বিখ্যাত বিভিন্ন ন্যাশনাল পার্কের পথ বেরিয়ে গেছে। আমিও আজ ব্রেকফাস্টের পরই রওয়ানা হয়ে যাব গোরোংগারোর দিকে। তাই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। বেশ ঠাণ্ডা এখানে। সামারের লান্‌ডানের মতো। ব্রিটিশদের "সামার" হতে পারে, আমার বেশ ঠাণ্ডা লাগে সামারেও। অনেকখানি পথ। পৌঁছতে প্রায় সন্ধে হয়ে যাবে। লেক মানীয়ারাতে লাঞ্চ সেরে নেব দুপুরে। এখানে বড় ভালো কর্ন-স্যুপ খেয়েছিলাম গতবারে। আফ্রিকার এ অঞ্চলে খুব ভালো ভুট্টা হয়।

গোরোংগোরো পৃথিবীর বৃহত্তম মৃত আগ্নেয়গিরি। তার ঘুমিয়ে থাকা জ্বালামুখের গহ্বরের মধ্যে গড়ে উঠেছে আশ্চর্য এক ন্যাশানাল পার্ক। তাতে আফ্রিকান জানোয়ারের মেলা। বুনোমোষ, সিংহ, চিতা, লেপার্ড হায়না, ওয়াইল্ডবীস্ট নানারকম গ্যাজেলস্ (যেমন গ্রানটস্ ও থমসনস্ গ্যাজেল), জেব্রা এবং আরও অসংখ্য প্রজাতির পশু। পাখিও আছে অগণ্য প্রজাতির। এই মৃত জ্বালামুখের গহ্বরের পরিধির পুরোটি পরিক্রম করতে দ্রুতগামী জীপেও একাধিক দিন লেগে যাবে। এরই মধ্যে হ্রদ। তাতে হাজার হাজার ফ্লেমিংগো এবং আরো বিভিন্ন পাখি। এবং এরই মধ্যে নদীও। যেন সব পেয়েছির দেশ! ভিজে এলাকায় ইয়ালো-ফিভার অ্যাকাসিয়া গাছেদের জঙ্গল। আর গহ্বরের বলয়ের চারদিক ঘিরে আছে প্রকৃতির এক আশ্চর্য বিস্ময় বাওবাব গাছ। শতাধিক বছরের বয়স তাদের। **UPSIDE-DOWN-TREES**।

এই বাওবাব গাছই আফ্রিকার কোনো দেশ, সম্ভবত মিশর থেকে নিয়ে গিয়ে মালোঁয়ার নবাবেরা পুঁতেছিলেন আমাদের মধ্যপ্রদেশের মাণ্ডুতে। রূপমতীর মাণ্ডু, সেখানে কখনও না গিয়ে থাকলে একবার অবশ্যই যেও। মাণ্ডুর "রূপমতী"কে জানতে হলে সেখানে যেতেই হবে। মধ্যপ্রদেশ সরকার বছরের বিভিন্ন সময়ে কলকাতা থেকেই "কন্‌ডাকটেড্ ট্যুওরস" অ্যারেঞ্জ করেন।

লেক মানীয়ারাও দেখার মতো। এও এক আলাদা ন্যাশানাল পার্ক। ইয়ালো-ফিভার অ্যাকাসিয়া এবং অন্যান্য সবুজ গাছেদের ঘন ভীড় এখানে হ্রদের পাশে। বড় বড় কানের

আফ্রিকান হাতিদের রাজ্য। লেক মানীয়ারার "গেছো" সিংহ আর লেপার্ডরা পৃথিবী বিখ্যাত। আফ্রিকান হাতিরা ভারতীয় হাতিদের চেয়ে অনেক বড় হয় চেহারায় আর এরা কোনোদিনও পোষ মানে না। বন্দী করে রাখলে না খেয়ে মরে যায় তবুও দাসত্ব মেনে নেয় না। লেক মানীয়ারার মানীয়ারা হোটেলে লাঞ্চ খেয়ে রাতটা কাটাবো গোরাংগোরোর কটেজে। জ্বালামুখের গহ্বরের বলয়ের উপরে। এবারে আর গহ্বরে নামা হবে না। ছোট ছোট কটেজ আছে। ডাইনীং-রুম অবশ্য আলাদা। ভালো শীত এখানে। উঁচুও তো কম নয়। অনেক মাসাই আছে এই অঞ্চলে। কেউ যদি গাড়ি থেকেও ছবি তুলতে যায় তো আটফিট বর্শা ছুঁড়ে মারে বিনা বাক্যে।

কাল ভোরেই গোরোংগোরো ছেড়ে রওয়ানা হবো আমার গন্তব্যে।

রাতের ডিনারে ওয়াইল্ডবীস্টের স্টেক দেবে হয়তো। গতবারেও **দিয়েছিলো**। এদের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে বলে গোরোংগোরোর গেম-ওয়ার্ডেন নিজেই **মেরেছিলাম** অতিথিদের খাদ্যর জন্য।

ওয়াইল্ডবিস্ট বা "ন্যু" যেমন বিচ্ছিরী দেখতে তেমনই শক্ত তাদের মাংস। আমাদের দেশের শম্বর বারাশিঙা বা ব্লু-বুল্ এর মাংস এর তুলনায় মাখন।

"স্টেক" তো জেনারালী আণ্ডারডান্ করেই খায় সকলে। বীফ্ হলে তো খায়ই। "ভীল" হলে অবশ্য এমনিতেই উপাদেয়। কিন্তু ওয়াইল্ডবিস্টের স্টেক আমি স্টুয়ার্ডকে বলে তিনতিনবার "ওভার-ডান" করিয়ে এনেও ভালো করে চিবোতেই পারলাম না। ঘোড়ার মতো জানোয়ারের মাংস খাওয়া যার তার কর্ম নয়। তায় আবার সে ঘোড়া যদি জংলী ঘোড়া হয়। জংলী মুরগীর বা হাঁসের মাংসই নরম করে নিতে হয় কিছুক্ষণ পা উপরে করে মাথা নিচে করে ঝুলিয়ে রেখে তার সদ্য শিকার করা ওয়াইল্ডবিস্টের মাংস।

পৃথিবী বিখ্যাত সেরেঙ্গেটি প্লেইনস্ আর সেরেঙ্গেটি ন্যাশানাল পার্ক-এর আদিগন্ত ঘাসবনের মধ্যে সাদা সিঁথির মতো কাঁচামাটির পথ বেয়ে সন্ধের মুখে মুখে গিয়ে পৌঁছবো সেরেঙ্গেটির গভীরের "সেরোনারা" লজ্-এ। লজ-এর অদূরেই সেরোনারার ওয়াইল্ড-লাইফ রিসার্চ সেণ্টার। সেখানেই আমাদের সেমিনার হবে। পনেরো দিন সেরোনারাকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকের বনে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াবো। কখনও ছোট প্লেনে করে, কখনও ঢাকা ভোক্সওয়াগন কম্বিতে, কখনও ল্যাণ্ড রোভারে।

সেরেঙ্গেটির মধ্যে দিয়ে ভক্সওয়াগন কম্বি গাড়িতে করে যেতে যেতে জানালা দিয়ে যে কত সহস্র জানোয়ার আর পাখি দুপাশে দেখা যাবে তা কী বলব। শয়ে শয়ে "ওয়াইল্ডবিস্ট" বা "ন্যু"। হরেকরকমের গ্যাজেলস্। জেব্রা তাও হরেক রকমের। জিরাফ। উটপাটি। এলাণ্ড, হায়না, সিংহ, লেপার্ড, নানারকম ফেজেণ্টস, এবং হাতির দল। সেরোনারা লজ-এর কাছেই আছে হিপ্পো পুল। জলহস্তীদের আড্ডা।

সারাদিন গাড়ি চালিয়ে সেরোনারা লজ-এ পৌঁছতে পৌঁছতেই অ্যাকাসিয়া গাছেদের আড়ালে সূর্য হয়তো অস্ত যাবে পশ্চিমকাশে নানা রঙের আবীর ছড়িয়ে।

আফ্রিকার সূর্যাস্ত দেখার মতো। মন বড় বিষণ্ণ হয়ে যায়। যখন এখানে ন্যাশানাল পার্ক হয়নি তখন এরই মাঝে মাঝে নানারকম আদিবাসীদের গ্রাম ছিলো। মাসাইদের "ক্রাল"। সন্ধের সময় তাদের ড্রাম বেজে উঠতো দ্রুদুম্ দ্রুদুম্ করে বুকের মধ্যে কাঁপন তুলে। ন্যাশানাল পার্কগুলিতে পশুপাখিদের বিচরণ নির্বিঘ্ন করতে মানুষের বাস নির্মূল করা হয়েছিলো। কিন্তু আমার মনে হয়, পৃথিবীর কোনো বনেই মানুষ না থাকলে সেই বন এক অতিপ্রাকৃত চেহারা পায়। অস্বাভাবিক লাগে চোখে। জানোয়ারেরা এতোই নিঃশঙ্ক ভাবে

বিচরণ করে, যে তাদের পোষা বা চিড়িয়াখানার জানোয়ার বলেই মনে হয়।

মানুষও তো বিধাতারই সৃষ্টি। প্রকৃতি বড় ন্যাড়া এবং আনইন্টারেস্টিং হয়ে যায় দু পেয়ে জানোয়ারেরা সেখান থেকে একেবারেই নির্মূল হলে। এই পরকল্পিত, দিগন্তবিস্তৃত বন-বনানীতে ও ঘাস বনে যাঁরা জানোয়ার দেখেন তাঁদের বন্য জানোয়ার সম্বন্ধে ধারণাটাও সঠিক হয় না। আমাদের দেশে কাজিরাঙ্গার গণ্ডারেরা বা বান্ধবগড়ের বা রন্‌থাম্বোর বা কান্‌হার বাঘেরা বা করবেট পার্ক এবং রনথাম্বোরের কুমীরেরা যেমন ব্যবহার করে মানুষ দেখে, মানুষ বাস করা বনের জানোয়ারেরা এবং প্রাণীরা তা কখনওই করতো না। এ বাবদে, মনে হয় যে, বন ও বন্য জানোয়ার সম্বন্ধে এই সব স্যাংচুয়ারীতে বেড়াতে আসা মানুষদের ধারণা বোধহয় বড়ই সাদামাটা একঘেয়ে ও ম্যাড়ম্যাড়ে হয়। বুকের মধ্যে ভয় না থাকলে, বন্য জানোয়ার দেখতে কষ্ট না করতে হলে, তাদের সামনে পড়লে তাদের বিস্মিত, বিরক্ত ভীত বা ক্রুদ্ধ না দেখতে পেলে সেই জানোয়ার সম্বন্ধে ধারণাটা ভ্রান্ত হয়েই গড়ে ওঠে।

জানি যে এই মত অনেকেই পোষণ করেন না। কিন্তু যাঁরা দুরকম বনেই (মনুষ্য বসতি সম্পন্ন এবং মনুষ্য বসতিহীন) দীর্ঘদিন বিচরণ করেছেন তাঁরাই মানবেন যে আমার এই বক্তব্যের পেছনে সামান্য হলেও কিছু সারবস্তু আছে। তানজানিয়ার কোনো ন্যাশানাল পার্কেই রাতে তো নয়ই, দিনেও কাউকে পায়ে হেঁটে ঘুরতে দেওয়া হয় না। সন্ধের পর গাড়ি চলাচলও বারণ। রাতে গাড়ি থেকেও জানোয়ার দেখার কোনোরকম বন্দোবস্তই নেই যেমন আমাদের বিহারের বেতলা ও হাজারীবাগ (রাজাডেরোয়া) ন্যাশনাল পার্কে আছে। অবশ্য এইটেই ঠিক। রাতের বেলা গাড়িতে আলো লাগিয়ে জানোয়ার দেখলে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহতই করা হয়। কিন্তু টুওরিস্টরা যে আধঘণ্টায় "শিওর" জানোয়ার দেখে শালীদের কাছে গিয়ে "হীরো" বনতে চান। সেরোনারা লজ-এর (হোটেলের) কর্মীরাও সেরোনারা গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে যাওয়া আসা করেন না। ভকস্‌ওয়াগন—কম্বি (ঢাকা গাড়িই) তাঁদেরও নেওয়া-আনা করে।

পূর্ব-আফ্রিকার বনের ও ঘাসবনের দিগন্তবিস্তৃত আয়তন আফ্রিকার বিরাটত্ব ও আদিমতা সম্বন্ধে একরকমের ধারণা জন্মে দেয় প্রত্যেকেরই মনে।

কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের বনে পাহাড়ের আলো-ছায়ার খেলা এবং আমাদের বাঘেদের মতো ভালো পৃথিবীর কোনো বন ও কোনো জানোয়ারকেই আমার লাগে না। বাঘ, বাঘই। পৌরুষের সংজ্ঞা সে। একাধিক স্ত্রীর রোজগারে প্রায়শঃই বসে-খাওয়া সিংহ, বাঘের ব্যক্তিত্বময় একাকীত্ব এবং পৌরুষ কোথায় পাবে ? বাঘিনীরাও সিংহীদের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না। যে শিকারি জানোয়ারেরা দলে থাকে এবং দল বেঁধে শিকার করে যেমন সিংহ, হায়না, বুনোকুকুর তাদের আত্মবিশ্বাস এবং ব্যক্তিত্বের অভাব থাকতেই পারে। তাই আমার মনে হয় যে, বাঘের কোনো প্রতিযোগী পৃথিবীর কোনো বনেই নেই।

বলেছিলাম বটে যে তোমাকে যখনই পারবো তখনই চিঠি লিখবো কিন্তু তা হবে বলে মনে হচ্ছে না। সেমিনারতো ৩ দিনের। তারপর ফিল্ড-ওয়ার্ক করতে হবে। পালাম্যুর আসাম এবং উত্তরবঙ্গের হাতির স্বভাবের সঙ্গে পূর্ব-আফ্রিকার হাতির স্বভাবের মিল ও অমিল কোথায়, তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গতি ও অসঙ্গতি কোথায় সে সম্বন্ধে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি এখানের মিস্টার ট্রেভর সাইটোটির সঙ্গে ল্যাণ্ড-রোভারে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হবে আমার। দিন পনেরো পরে ফিরে যেতে হবে ডালা (NDALA) নদীর উপত্যকায় ডগলাস ও ওরিয়া হ্যামিলটন যে হাতির দল নিয়ে কাজ করেছিলেন তাঁদের

কাছে।

পূর্ব-আফ্রিকার সোয়াহিলি ভাষাটি মজার। গোরোংগোরো আসলে এনগোরোংগারো (NGORONGGORO), ডুটু সাফারি লজ হচ্ছে (NDUTU)। দায়সারা চিঠি লেখার চেয়ে না লেখাই ভালো। সূর্যাস্তর পরে ডেরাতে ফিরে ডাইরী এবং নোটস লিখতে হবে। ভারত সরকার তো আমাকে বেড়াবার জন্যে পয়সা খরচ করে এখানে পাঠাননি।

তোমাকে বরং আবার চিঠি লিখব সেসেলস দ্বীপপুঞ্জ থেকে। তখন কাজও শেষ হয়ে যাবে। সেখানে শুধুই ছুটি।

চেষ্টা করব এখানের সব কাজ মাসখানেকের মধ্যেই শেষ করবার। আমার সুবিধে আছে। কারণ আগেও এসেছি। প্রথমবার এলে অসুবিধে থাকে অনেকরকমেরই। আশা করব তুমি এ'কদিন ভালো থাকবে। দেশে ফেরার পর তুমি একবার আসবে আমার কাছে এমন আশা করাটাও নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না। কলকাতায় গেলে আমার দম-বন্ধ হয়ে আসে। নিঃশ্বাস ফেলতে পারি না। তার চেয়ে তোমারই আসা ভালো আমার কাছে। ফিরে যাবার সময়ে নতুন প্রাণ ভরে নিয়ে যাবে। মনে মনে গাইতে গাইতে সেই সুন্দর গানখানি।

"নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে ॥
বিষাদ সব করো দূর করো নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে ॥"

কেন জানি না, দেশ ছেড়ে এলেই আমার মাথার মধ্যে দেশের কথা, দেশের চেনা অচেনা মানুষদের কথা, আমার প্রিয় বনের ও মনের গন্ধ বারে বারে ফিরে ফিরে আসে। এই আদিম আফ্রিকার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের লাভামিশ্রিত লাল, ভারী নানারকম আকর-মেশা নাক-জ্বালা করা ধুলো এবং গ্রেট রিফ্‌ট ভ্যালির (যেখানে জার্মান প্রফেসর লিকি আদিম মানুষের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন) অবাক করা সৌন্দর্য, প্রাচীন অ্যাকাসিয়া এবং বাওবাব গাছেদের স্তব্ধ নীরব চিৎকারের মধ্যে আমার দেশের জঙ্গলের ও লালমাটির মিষ্টি ধুলোর গন্ধভরা বন-পথের কথা মনে পড়ে। আর মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে দেশ ছেড়ে এতোদূরে এসেছি বলে। মনে মনে নিরুচ্চারে গেয়ে উঠি "ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।"

এখানে ধুলোয় নাক সত্যিই জ্বালা করে। আফ্রিকার বিস্তৃতি এবং আয়তন এবং জনশূন্যতা বড় অন্যরকম। আমাদের দেশের কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের কোনো কোনো জায়গায় ছাড়া আর কোথাওই জনমানবশূন্য দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর বা ঘাসবন বা বালি বা পাহাড়ের পর পাহাড়কে অতিকায় জন্তুদের মতো শুয়ে বসে থাকতে দেখা যায় না। মেঘেরা, পাহাড়েরা বাওবাব আর নানারকম অ্যাকাসিয়া গাছেদের সারি পরিবেশের অনুষঙ্গ হিসেবে মিলে মিশে গেলেও প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। এমনটি আমাদের দেশে হয় না। সেখানে বৃষ্টি বা মেঘ এসে সবাইকেই একাকার করে দেয়।

ভালো থেকো। ফেরার সময় তোমার জন্যে হাতির ল্যাজের চুলের বালা ও হার নিয়ে যাবো। এগুলো এখানে স্মারক চিহ্ন তো বটেই মাঙ্গলিক হিসেবেও পরে মানুষে। বালা ও হার করে। হাতির লেজের চুল এতো মোলায়েম যে বলার নয়। যদিও হাতির জীবিত থাকাকালীন লেজের উপরে যখন খাড়া খাড়া হয়ে থাকে তখন মনে হয় হেড অফিসের বড়বাবু, অথবা "শ্যাম বাবুদের গয়লার" খোঁচা খোঁচা গোঁফই বুঝি।

সিজাম্বো, ইতি রাজর্ষি

ঋতি রায়
বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা

সেরোনারা লজ সেরেঙ্গেটি প্লেইনস
তানজানিয়া, পূর্ব-আফ্রিকা

ঋতি, কল্যাণী

আমার আগের চিঠি পেলে কি না বোঝার তো জো নেই। না পেলেও পেয়ে যাবে।

এখানে পৃথিবীর তাবৎ ভালো ভালো সব খাদ্যপানীয় ধূ ধূ প্রান্তর এবং জঙ্গল পাহাড় পেরিয়ে হাতি গণ্ডার সিংহদের মধ্যে দিয়ে সিঁথির মতো সরু পথ বেয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড Refrigerated Van-এ করে জঙ্গলের বিভিন্ন লজ-এ চলে আসে। মাশরুম থেকে ক্যাভিয়ার, স্কচ হুইস্কী থেকে জামাইকান্ বিকার্ডি রাম্, ফ্রেঞ্চ হোয়াইট ওয়াইন থেকে স্প্যানিশ রেড ওয়াইন, ফ্রেঞ্চ লিকুওর বেনিদিক্‌তিন্ থেকে ইংলিশ লিকুওর ড্রাম্বুই, যা চাইবে তাই পাবে। এই বাবদে ট্যুওরিজম্ ইণ্ডাস্ট্রীকে কী ভাবে গড়ে তুলতে হয়, কত কোটি বিদেশী মুদ্রা যে প্রতি বছর রোজগার করতে পারা যায় তা কিন্তু আমাদের স্বদেশি সরকারের শেখা দরকার তান্‌জানীয়ান্ সরকারে কাছ থেকে।

আমাদের দেশেও কম সৌন্দর্য নেই, কম বন্যপ্রাণী নেই। সরকারী তরফে গদীর রাজনীতি কমিয়ে যদি দেশের একটু ভালোর রাজনীতিতে আমাদেরই ভোট দিয়ে, গলায় মালা দিয়ে পাঠানো নিরেট নির্লজ্জ গড্ডালিকা প্রবাহদের সামান্যতম মনোযোগও থাকতো তবে এই ক্ষেত্রে অনেক কিছুই করা যেতো। ভাবলেও বড় দুঃখ হয়।

তান্‌জানিয়া স্বাধীনতা পেয়েছে আমাদের অনেক পরে। যে দেশে একটি টুথ-ব্রাশ পর্যন্ত তৈরি হয় না, ইন্ডাস্ট্রী বলতে কিছুই নেই; সেখানেও তারা ট্যুওরিজমকে এতো বড় ইন্ডাস্ট্রীতে দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছে আর আমরা এতো কিছু থেকেও এতোদিনেও তা করতে পারলাম না। আমাদের নেতাদের ফাঁকা-বুলি, চালাকি আর চুরি ছাড়া আর কিছুই শেখানো বা ছেড়ে-যাওয়ার নেই আমাদের এবং পরবর্তী প্রজন্মর জন্যে।

কাল দুপুরে হিপ্পো পুলের কাছে গাড়ি থেকে নেমেছিলাম। ড্রাইভার বারণ করেছিলো যদিও। নামামাত্র সেৎসী ফ্লাই হামলে পড়লো। উরি বাবা! সেকি কামড়। আমাদের দিশী ডাঁশ (Horse-fly) যার কামড়ে বাঘও পালায় জঙ্গল ছেড়ে, এও তেমনই ব্যাপার প্রায়। তবে সেৎসীর চেয়ে ডাঁশ অনেক বড় দেখতে হয়। তার কামড় সত্যিই সাংঘাতিক। আমি মাত্র একবার ডাঁশের কামড় খেয়েছিলাম আসামের যমদুয়ারের জঙ্গলে। একশ পাঁচ ডিগ্রী জ্বর এসে গেছিলো। ডাঁশের কামড় অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক যদিও কিন্তু প্রতিষেধক ছাড়া সেৎসী মাছির কামড় খেলে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে। তবে এমন মরণ তো মন্দ নয়। শুধু ঘুম পাবে আর চেহারা হয়ে যাবে ন্যাবাধরা রোগীর মতো, নরম আভার হলুদরঙা। এই কারণেই জলের কাছে যে সব অ্যাকাসিয়া গাছ গজায় তাদের বলে ইয়ালো-ফিভার অ্যাকাসিয়া। অ্যাকাসিয়ার মতো লম্বা গাছ আমাদের দেশে খুব বেশি নেই। তাদের নিচের ডালের কাঁটা

পাতা খেতেই প্রমাণ সাইজের জিরাফকেও (চিড়িয়াখানায় দেখা জিরাফ নয় তেতলা বাড়ির সমান উঁচু জিরাফ) গলাকে টেনে বাড়িয়ে তার নাগাল পেতে হয়।

বাঁচোয়া এই যে আফ্রিকার এই অঞ্চলে কাউকে আসতেই দেওয়া হয় না প্রতিষেধক ইনজেকশন না নিয়ে। আমাকেও নিয়ে আসতে হয়েছিলো।

কাজ শেষ করে ‘লজ’এ ফিরে চানটান করে বারান্দাতে বসেছিলাম। এখানে খোলা বারান্দা নেই। দোতলাতে আছি আমি। সিংহর দল শুয়ে বসে আছে কাছের “কোপাজেতে”। কয়েকটি ঘোরাফেরা করছে মাটিতে। যদিও এদিকে কোপ্‌জে কম।

দিনের বেলা সেরোনারা লজ্-এ ডাইনীং রুমে ব্রেকফাস্ট খাবার সময়ে জিরাফ অনেক সময় জানালা দিয়ে মুখ বাড়ায়। এক জোড়া উট পাখি পাউরুটির পোড়াপিঠের নেশা করে ফেলেছে বলে রোজ সকালে ডাইনীং রুমের সামনে নেচে নেচে ঘোরাঘুরি করে। বারান্দায় বসে বসে তোমার কথা ভাবছিলাম। তোমার থেকে কতদূরে আমি। তুমি ভারতের পূর্ব প্রান্তে। উত্তর পশ্চিমপ্রান্তর পরে আরবসাগর। কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ভারতমহাসাগর। পুরো ভারতের প্রস্থ পেরিয়ে, ভারতমহাসাগর পেরিয়ে মরিশাসকে অনেক বাঁদিকে রেখে সেসেলসকে কম বাঁদিকে রেখে এসে প্লেন নেমেছিলো ডার-এস সালামে। সেখান থেকে আরুশা। আরুশা থেকে এখন আরও গভীরে চলে এসেছি পূর্ব আফ্রিকায়। এ অঞ্চলে আগে জার্মানদের আধিপত্য ছিলো তাই নাম ছিলো জার্মান ইস্ট-আফ্রিকা। কেনীয়াতে ছিলো ব্রিটিশদের আধিপত্য। তাই ঐ অঞ্চল আগে পরিচিত ছিলো ব্রিটিশ ইস্ট-আফ্রিকা হিসেবে। সেসেলস্ দ্বীপপুঞ্জ ছিলো পর্তুগীজ নৌদস্যুদের ঘাঁটি কিন্তু ফরাসীদের প্রাধান্যই বেশি ছিলো। সেসেলস্-এর আপামর অধিবাসীদের ভাষার নাম ‘ক্রেওল্’। ফরাসীর প্রভাব সে ভাষায় প্রবল। শিক্ষিতদের ভাষা তো পুরোপুরিই ফরাসী যদিও ইংরিজিও সকলে বোঝে কাজ চালাবার জন্যে। সেসেলস্-এর কথা সেসেলস্-এ বসে লিখব।

তোমার কথা দিনে রাতে অগণ্যবার মনে পড়ে। তুমি হয়তো এখন অফিস থেকে ফিরে ভালো করে চান করে কোনো ফুল ফুল ছাপা শাড়ি পরেছো বা পাতলা তাঁতের শাড়ি। সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।

বুকটা কেমন খালি খালি লাগে। দুপুরের শীতের হাওয়ায় ভারী আকরিক ধুলো ওড়ে। তার সঙ্গে আমার নিঃশ্বাস। সিংহর হুঙ্কারে গম্‌গম্ করে ওঠে আদিগন্ত সমভূমি। আমি ভাবি। কিন্তু তুমি কি একবারও আমার কথা মনে করো ? সারাদিনে ? এই মনে-করা মনে-পড়ার আরেক নামই কি ভালোবাসা ? কে জানে ?

যতদিন দেশে না-ফিরি, ভালো থেকো। চান করতে করতে, চুল বাঁধতে বাঁধতে, গান গাইতে গাইতে আমাকে মনে কোরো। যেমন আমি তোমাকে দিনে রাতের অনেক প্রহরেই করি। মিথ্যে বলব না, গতরাতে তোমাকে স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নের মধ্যে নিরাবরণ তোমাকে দারুণ দারুণ আদর করে দিলাম। ফোর-টায়ার আইসক্রীমের মতো চেটেপুটে খেলাম মুণ্টুনি সুন্টুনি কল্পনার তোমাকে। তুমি বুঝতে পেরেছিলে ? রাত বারোটা পঁয়ত্রিশে কি তোমার শরীরে কোনো অস্বস্তি বোধ করেছিলে ? জল খেতে বা বাথরুমে যেতে উঠেছিলে কি ? তাহলে বোঝা যাবে টেলিপ্যাথী বলে কিছু আছে।

তুমি কি স্বপ্নে আমাকে কখনও দেখেছো ? জানতে ভারী ইচ্ছে করে। দেখলে কি দেখেছো ? কেমন করে দেখেছো ?

অশেষ কেমন আছে ? তুমি অশেষকে এখনও ভালোবাসো। আমি জানি। তাতে

কোনো অপরাধ তো নেই। একজন মানুষের বুকে অনেক এবং অনেকের প্রতিই ভালোবাসা অটুট থাকতে পারে। থাকা স্বাভাবিক।

—ইতি-বাওয়ানা, রাজর্ষি।

“বাওয়ানা” বা “বাওনা” হলো সোয়াহিলি ভাষাতে “সাহেব”।

মাসাইদের ভাষা সোয়াহিলি নয়। তাদের ভাষার নাম “মা-আ”। মাসাইরা সাহেবদের দেখতে তো পারেই না, উল্টে তাদের পোশাককেও দেখতে পারে না। যে সব মানুষদের পোষাক এমনই যাতে নির্বিঘ্নে ও নিরুপদ্রবে বায়ুনিঃসরণের অসুবিধে আছে তাদের ওরা একটা বিচ্ছিরী নামে ডাকে। নামটা মনে পড়ছে না এক্ষুনি। পড়লে জানাবো। মজার ব্যাপার। না ?

সোয়াহিলি ভাষাভাষীরা বড়ই সামাজিক জীব। ধরো, পথের মধ্যে মুখোমুখি দুটি বাসের দেখা হলো। বাস থেমে গেলো তক্ষুনি। এদিকের বাসের লোকেদের মধ্যে কারো চেনা লোক যদি ওদিকের বাসে থেকে থাকে তাহলে প্রশ্নবান শুরু হয়ে যাবে তক্ষুনি। হাবারি সানা ? অর্থাৎ মশায় কেমন আছেন ? উনি জবাব দেবেন ভালো আছি। তারপর আলাদা করে বারংবার প্রশ্ন করা হবে আপনার স্ত্রী কেমন আছেন ? বড় ছেলে ? মেজছেলে ? বড় মেয়ে ? মেজ মেয়ে ? সেজ মেয়ে, ছোট ছেলে ? কে কেমন আছে ? বাড়ির কুকুর ? বিড়াল ? বিড়ালের বন্ধু দাঁড়কাকটি কেমন আছে ? এবং এই সব প্রশ্ন চলবে একবার নয়। দফায় দফায়। প্রত্যেকের নাম করে করে। এবং প্রত্যেক প্রশ্নর আলাদা আলাদা উত্তর হবে।

পূব আফ্রিকার মানুষদের হাতে আজও বহু সময় আছে বেহিসেবী হবার মত। এবং তাই তারা সুখী। যার সময়ই নেই তার আর কী আছে না আছে তাতে কিছুই এসে যায় না। ধন, দৌলত, মান, সম্মান, যশ এসবের চেয়ে অনেকই বেশি দামী হচ্ছে সময়।

সময় থাকতে সেটা বুঝো।

ভালো থেকো — রাজর্ষি

* * *

ঋতি রায়
বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯

মাহে আইল্যাণ্ড
সেসেলস্ দ্বীপপুঞ্জ

শীতাতপনিয়ন্ত্রিতা
ঋতি,

এতোদিনে আমার চিঠিটি পেয়েছো আশা করি। যেটি, “সেরোনারা লজ” থেকে লিখেছিলাম।

সে চিঠি লেখার পর প্রায় একমাস সময় কেটে গেছে। ফেরার সময়ওতো হয়ে এলো। ছটি সপ্তাহ যে কী করে কেটে গেলো দেখতে দেখতে ভেবেও অবাক হচ্ছি ! যদিও আমি পালামৌতেও সারাদিনই রোদে জলে ঘুরি এবং প্রকৃতির সান্নিধ্যেই থাকি তবু, আদিম

মহাদেশ আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলের উদ্‌লা বন-পাহাড়ের রোদে রোদে ঘুরে বেড়ানো একটা সম্পূর্ণই অন্যরকম অভিজ্ঞতা । "সাভান্নাহ্‌" ঘাসের বনে যে ব্যাপ্তি, দিগন্তের যে প্রসার শরীর-মনের একজন মানুষের উপরে প্রকৃতির উদাত্ত সত্তার যে পূর্ণ, প্রচণ্ড প্রভাব এমনটি খুব কম জায়গাতেই আছে । এসব কথা মুখে বলার বা চিঠিতে লেখার নয় । সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যাপার ।

পশ্চিম-আফ্রিকার বন-জঙ্গলে তো বটেই এমনকি লেক মানীয়ারা বা এন্‌গোরোংগোরোর বনের রকমও সেরেঙ্গেটি প্লেইনস্‌-এর থেকে আলাদা । পশ্চিম-আফ্রিকার বর্তমান "জায়রে", যে-অঞ্চল কঙ্গো নদীর উপত্যকায়, যেখানে পৃথিবীর বৃহত্তম সব তামার খনি আছে, গরিলাও আছে, শিশুকাল থেকেই ইচ্ছে ছিলো যে সেখানে গিয়ে কঙ্গো অথবা নীল নদের উৎস থেকে নৌকোতে বেরিয়ে এই নদ-নদীদের সমুদ্রে বা হ্রদে লীন হওয়া পর্যন্ত যাবো । হলো আর কোথায় বলো ?

এই নদ ও নদীর ব্যাপারটি আমি অবশ্য ঠিক বুঝি না । মানুষের বা জানোয়ারের লিঙ্গভেদের অকাট্য কারণ এবং চিহ্নও বিদ্যমান কিন্তু নদ বা নদীর বেলা কোন্‌ লক্ষণসমূহ তাদের লিঙ্গ নির্ণয়ে সহায়ক এ বিষয়ে কি কোনো আলোকপাত করতে পারো ?

কোনো নারীতেই আমার পুরোপুরি লীন হওয়া হলো না এ পর্যন্ত, তা কোনো হ্রদে বা সমুদ্রে ! নদীর সঙ্গে নারীর তো বটেই, পুরুষেরও অনেক মিল । থুড়ি, মানে নদের সঙ্গে । জীবন-যাত্রার ।

চলতে চলতে দু পাশে কতকিছুই সুন্দর অসুন্দর দেখতে হয়, দূর থেকে যা দূরের মনে হয় দেখতে দেখতে তাই খুব কাছের হয়ে ওঠে, খুবই কাছের, তারপরই আবার দূরের হয়ে যায় আস্তে আস্তে । কাছে আসা যায়, মন দিয়ে চোখ দিয়ে ছোঁওয়া যায় ; কিন্তু কিছুকেই ধরে রাখা যায় না । নদীকে তার দু-তীরবর্তী সকলেরই প্রয়োজন হয় কমবেশি । কিন্তু নদীর প্রকৃত প্রয়োজনে কেউই আসে না । যা দূরের তা কাছে আসে কিন্তু কাছে না থেকে পরক্ষণেই আবার দূরেরই হয়ে যায় ।

তবে এ নিয়ে আক্ষেপেরও কিছুই দেখি না । কঙ্গো বা নীল নদের বুক বেয়ে যেমন বেড়াতে পারিনি তেমন জীবনের নদী বেয়েও তো বেড়াতে পারিনি । একটি মাত্র জীবনে কত নদীর বুকেই বা ভাসা যায় বলো ? কত হ্রদে বা সমুদ্রে ভাসা যায় ? তীরবর্তী কত জিনিসের স্মৃতি মনে করে রাখা যায় ? এই ভুলে, ফেলে ; অবহেলে ভেসে যাওয়ারই আরেক নামতো জীবন ! এক জীবনে বেশি মানুষের ভালোবাসা চাইতেও নেই, বেশি জায়গায় বেড়াতেও যেতে নেই । বেশি ছুটোছুটি করতে নেই কারণ স্মৃতি এবং কল্পনা একজন মানুষকে যা দিতে পারে তার দুটি চোখ এবং দুটি পা কখনওই তা দিতে পারে না । এ কথাটা খুব কম মানুষই বোঝেন । তাইই অবিরত দৌড়ে বেড়ান যতদিন ক্ষমতা থাকে । এবং যখনই থেমে যান, চলচ্ছক্তিহীন (সর্ব-অর্থে) হয়ে তখন বড়ই আপশোস হয় এই কথা ভেবে যে জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়টুকুই মিছিমিছিই দৌড়ে-ঘুরে-বেরিয়ে শেষ করা হলো । তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এই দৌড় বা ফেরা আক্ষরিক অর্থের নয় । চাষ-বাসের বেলায় যেমন দুরকম চাষের কথা আমরা জানি Intensive এবং Extensive cultivation, জীবনের বেলাতেও ঐ জানাটাকে বোঝা এবং গ্রাহ্য করা উচিত । মেকানাইজড্‌-ফার্মিং করলে তবু একস্‌টেনসিভ-ফার্মিং করা যায় কিন্তু ম্যানুয়াল-ফার্মিং-এ কখনওই ইনটেন্‌সিভ ফার্মিং ছাড়া কিছু করা উচিত নয় । কমপ্যুটার যেদিন আমাদের অন্দরমহলেরও দখল নেবে সেদিনও কিন্তু মানুষের জীবন নিভৃত, গভীর,

এবং ম্যানুয়ালই (আক্ষরিক এবং ভিন্ন অর্থে) থাকবে। অন্তত থাকা উচিত। এবং তাই যদি থাকে তবে প্রত্যেক মানুষের জীবনেই (যদি না তিনি, যেন-তেন-প্রকারেণ ভোট-প্রত্যাশী নগর-মানুষ বা অমানুষ হন) অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ঘটাতে না চেয়ে গভীরতার খোঁজই তার মুখ্য চাওয়া হয়ে ওঠা উচিত।

যাকগে অনেকই অন্যতর প্রসঙ্গে চলে এলাম। এই সব বোধহয় বয়স হওয়ারই লক্ষণ। বয়স তো আর বয়সে হয় না।

যদি জিগগেস করো যে, বয়স কিসে হয় ? তাহলে সেই বিখ্যাত ইংরিজি গল্পটা শোনাতে হয় "দ্যা বয় কামস্ হোম"।

জানো কি ?

সেই গল্প ইংল্যান্ডের একটি অত্যন্ত বিত্তবান সাবালক পরিবারের নাবালক ছেলেকে নিয়ে। নাবালক হলে কি হয় তাকেও যুদ্ধে যেতে হয়েছিলো এবং বিদেশের মাটিতে দেশের জন্যে যুদ্ধ করতেও হয়েছিলো। তার বাবা মারা যাওয়ার সময়ে অগাধ ধনসম্পত্তি রেখে যান। ছেলেই একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু সেই উত্তরাধিকারের অধিকার তার আসবে সাবালকত্বেই। ওখানকার সাবালকত্বে। একুশ বছরে বাবা ছেলেটির কাকাকে করে গেছিলেন ট্রাস্টী। ছেলে যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে ফিরে এলো। তখনও তার একুশ বছর হয়নি। সে রোজই কাকাকে বলে, কাকা! আমি বড় হয়ে গেছি। বড় হয়ে গেছি।

জবাবে কাকা কিছুই বলেন না। চুপচাপ থাকেন। এমন করে অনেকদিন কাটলো। আইনানুসারে সাবালকত্ব না এলে সে যে কিছুই পাবে না সে সম্বন্ধেও ছেলেটিও তখন নিঃসন্দেহ হলো।

একরাতে ডিনারের পর, ফায়ার-প্লেসের আগুনের ওম্-এ কাকা ডাইনীং টেবিলে বসেই সিগারের সঙ্গে ড্রাম্বুই খাচ্ছেন আর ভাইপো বসে আছে উল্টোদিকের চেয়ারে। ভাইপো কাকাকে একটি একটি করে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা শোনাতে লাগলো। বললো, শুনছো কাকা, সমানে মেসিনগান চলছে আমাদের উপরে, হাওয়াইৎজার ছুঁড়ছে জার্মানরা। আলোয় আলো হয়ে যাচ্ছে যুদ্ধ ক্ষেত্র, ট্রেঞ্চের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে আমরাও শত্রুদের দিকে গুলি করে চলেছি সমানে। এমন সময় আমার ঠিক ডান পাশেই যে বন্ধু ছিলো তার বুকে গুলি লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাঁধে নিয়ে এই বৃষ্টির মতো গুলির মধ্যে এক ট্রেঞ্চ থেকে অন্য ট্রেঞ্চ করতে করতে কাঁটা তারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে যে-মুহূর্তে মেডিকেল কোর-এর তাঁবুতে তাকে বয়ে নিয়ে পৌঁছোলাম সেই মুহূর্তে আমার বয়স বেড়ে গেলো দেড়টি বছর।

এমনি করে এক একটি ঘটনার পর সেই ঘটনার ঘনঘটার চমৎকারিত্বে তার বয়স লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগলো। এবং ছেলেটি যখন তার অভিজ্ঞতার কথা থামালো তখন তার বয়স একশো সাত না কী একশো সতেরোতে গিয়ে ঠেকলো।

কথা শেষ করে গুলিভরা সার্ভিস-রিভলবারটি কোমর থেকে খুলে টেবলের উপরে রেখে বললো, এবারে বলো. কাকা, আমার একুশ বছর হয়েছে কি না ?

এ গল্পটি কিন্তু বানানো নয়। গল্পটির নামও আমার স্পষ্টই মনে আছে 'দ্যা বয় কামস্ হোম'। কিন্তু লেখকের নাম কি অথবা কোথায় পড়েছিলাম তা আর মনে নেই। ছেলেবেলাতে পড়েছিলাম।

কথাটা কিন্তু মিথ্যেও নয়। আমাদের কলকাতা শহরের বুকে চৌরঙ্গীর ফুটপাথে ছেঁড়া জামা পরে যে আট-বছরের ছেলেটি বুকের কাছে পথচারীর জুতো তুলে নিয়ে জুতো পালিশ

করে প্রতিদিন, তার মনের বয়স যে বংশপরম্পরায় প্রচণ্ড ধনী কোনো সলিসিটরের চল্লিশ-বছর-বয়সী লালটু মাকাল-ফল পুত্রের মনের বয়সের চেয়ে অনেকই বেশি সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই। সত্যিই আমাদের বয়স বয়সে হয় না অভিজ্ঞতাতেই হয়।

আজকে আমাকে কথাতে পেয়েছে।

এতোদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাইরে এবং তারওপর ঘরেও যে পরিশ্রম গেছে তা বলার নয়। শুনেছি যে, বড় বড় মানুষদের জীবনেও এমন ঘটে। প্রচণ্ড জটিল কোনো মামলা, বহুদিনের ও রাতের প্রস্তুতির পর যখন কোনো উকিল সওয়াল করে জেতেন তখন তিনিও নাকি বাচাল হয়ে ওঠেন, যেমন বাচাল হয়ে ওঠেন গম্ভীর, রাশভারী সাহিত্যিক, কঠোর পরিশ্রমের পরে অর্জিত ছুটিতে গিয়ে। অথবা, কোনো বড় লেখা রাতের পর রাত জেগে শেষ করার পর। এই আপাত-লঘুতার সঙ্গে গুরু পরিশ্রমের আবহর আসলে কোনোই বিরোধ নেই। একটির পর অন্যটি স্বাভাবিক নিয়মেই আসে। যারা বোঝার তাঁরা বোঝেন। আর যাঁরা বুঝবেন না বলে ঠিক করেই রেখেছেন তাঁরা ইচ্ছে করেই এই অসঙ্গতির ভুল ব্যাখ্যা দেন।

সেরেঙ্গেটি প্লেইনস্ ছেড়ে যেদিন চলে এলাম সেদিন মনটা ভারী লাগছিলো। সেরোনারার ইনস্টিট্যুটে বেশ কজন বন্ধু-বান্ধবীও হয়ে গেছিলো। একটি ফ্রেঞ্চ মেয়ে, মারী, পূর্ব-জার্মনীর ছেলে মার্ক, তানজানীয়ারই ওয়ান্ডারাবো ট্রাইবের একজন পূর্বতন 'চোরা-শিকারি' এবং বর্তমান গেম-গাইড খোখোহেহে। ছোট, এইট-সীটার প্লেনের পাইলট জিম্।

আফ্রিকাতে বহুরকমের স্টার্লিং আছে। প্যাউন্ড স্টার্লিং নয় পাখি! শুধু সেরেঙ্গেটিতেই যে কতরকমের স্টার্লিং পাখি আছে তার কী বলব! ফেজেন্টস্ও আছে নানারকম। আমাদের দেশের সমতলভূমির জঙ্গলে (পালাম্যুকেও আমি সমতল ভূমিই বলছি) এমন বড় প্রজাতির ফেজেন্টস্ দেখা যায় না। হিমালয়ান খালিজ-ফেজেন্টস্-এর মতো। এবং তার চেয়েও বড়ও আছে।

এন্‌ডুটু সাফারি লজ এ যাবার সময় একদল ইম্পালা অ্যান্টেলোপের সঙ্গে হঠাৎই দেখা হয়ে গেলো। আমার ল্যান্ড-রোভার দেখে তারা যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যে দৌড়ে গেলো। দৌড়ে গেলো না বলে, উড়ে গেলো বললেই ভালো হয়। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের "গ্রীনহিলস্ অফ আফ্রিকার" কথা মনে পড়ে গেলো।

পড়েছো বইখানি?

সেরেঙ্গেটির ন্যাশনাল পার্ক-এর প্রধান সড়কে যখন গাড়ি দাঁড় করিয়ে সই-সাবুদ করে এনগোরোংগোরোর দিকে ফিরে চললাম তখন বোধহয় পাঁচশো স্টারলিং ঐ টিলাটির চুড়োর ঝোপঝাড় আর গাছ-গাছালির মধ্যে নড়ে চড়ে বসে কিচিরমিচির করে ডেকে বিদায় জানালো আমাকে।

এন্-ডুটু সাফারি লজ্-এ (সেরেঙ্গেটির মধ্যেই তা) হল্যান্ড থেকে আসা স্কুলের একদল শিক্ষক শিক্ষিকার (ভুগোলের) সঙ্গে দেখা হলো। তাঁরা নাকি "এডুকেশানাল ট্যুওরে" এসেছেন। দেখে খুব ভালো লাগলো। আমাদের দেশের শিক্ষকরাও যদি এমন করে আসতে পারতেন! আমাদের দেশে অনেক কিছুই করণীয় আছে। যেমন বড় বড় শহরের ট্র্যাফিক পুলিশদের পথের মোড়ে গাড়ি নিয়ন্ত্রণের জন্যে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার আগে তাদের প্রত্যেককে গাড়ি-চালানোর লাইসেন্স নিতে বাধ্য করা এবং শিক্ষক বা অধ্যাপক হিসেবে কাউকে নিয়োগ করার আগে শুধু তাঁর ডিগ্রীর পাকানো কাগজ দেখাই নয় তাঁর শিক্ষার রকম

BanglaBoi.org

সম্বন্ধে গভীরে গিয়ে তা জেনে নেওয়া। এক-একজন শিক্ষকের সঙ্গে মেসিন-গানের ট্রিগারের তুলনা করা যায়। তাঁদের হাতেই জাতির ভবিষ্যৎ। এই হতভাগ্য দেশকে তাঁরা “মারবেন” অথবা “রাখবেন” তা তাঁদের শিক্ষার “রকম”-এর উপরই পুরোপুরি নির্ভর করে। তবে আমার কথা আর কে শুনছে বলো!

এবারে তোমাকে এই আশ্চর্য সুন্দর সেসেলস্ দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে বলি। তানজানীয়ার কাজ শেষ করে নাইরোবি গেছিলাম। সেখানে কাজ ছিলো না। ছিলো মাত্র একদিনের। তাকে কাজ বলা চলে না। তাছাড়া আমাদের সরকার এখন রাশিয়া-ঘেঁষা বলে তানজানীয়ার সঙ্গে ভারতের যত হৃদ্যতা কেনিয়ার সঙ্গে তেমন আদৌ নয়।

নাইরোবি শহরটি বেশ। আরুশা যেমন পাহাড়ী শহর নাইরোবিও তাইই। তবে আরুশা থেকে অনেক বড় এবং সাজানো গুছোনো। একটি দেশের রাজধানী বলে কথা! নাইরোবি শহরের পত্তন কিন্তু করেছিলো মাসাইরা। এবং হয়তো আগেও বলেছি যে ‘নাইরোবি’ শব্দটির মানে হচ্ছে, মাসাই ভাষায়—খুব ঠাণ্ডা। ব্রিটিশরা মাসাইদের ভাগিয়ে দিয়ে নিজেরা তার দখল নিয়ে কেনীয়ার রাজধানী করে নেয়। এই মাসাইদের সম্বন্ধে যদি জানতে চাও এবং পুব আফ্রিকার সম্বন্ধেও তাহলে কলকাতার ‘দেজ পাবিলিশিং’ থেকে প্রকাশিত বুদ্ধদেব গুহর লেখা “ইলমোরাণদের দেশে” এবং “পঞ্চম প্রবাস” বইটি পড়তে পারো! এবং আনন্দ পাবলিশার্স-এর প্রকাশিত “গুগুনোগুম্বারের দেশে” এবং “রুআহা”। এই বইগুলি আমার দু চোখের বিষ কারণ তোমাদের কারো কারো প্রিয় লেখক বুদ্ধদেব গুহর লেখা। তবে উনি নিজে আফ্রিকাতে এসেছিলেন এবং বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মতো পেশাদারী জ্ঞান না থাকলেও কিছুকিছু জানেন বলেই বইগুলি পড়লে জানতে পারবে কিছু। আমরা তো জানি অনেক। কিন্তু কোনো বিষয় সম্বন্ধে জানা আর সেই বিষয়কে পাঠক-পাঠিকার বুদ্ধিগ্রাহ্য ও মনোগ্রাহী করে তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এক নয়। এই কারণেই অনেক “ভোঁদা” মানুষও জনপ্রিয় লেখক হতে পারেন আবার অনেক বুদ্ধিমান তাঁদের সব বুদ্ধি নিয়েও পাঠকের দরবারে শিরোপা পান না।

ভারত মহাসাগরের মধ্যে ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকার মধ্যে, আফ্রিকা থেকেই কাছে, এই দ্বীপপুঞ্জ। এরই এক পাশে জাঞ্জিবার এবং অন্য পাশে মরিশাস্। যদিও বেশ দূরে। জাঞ্জিবার তো এখন সেশেলস্ দ্বীপপুঞ্জরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তবে মূল সেশেলস দ্বীপপুঞ্জে মাত্র পাঁচটি দ্বীপ আছে। সবচেয়ে যে দ্বীপটি বড় তার নাম “মাহে”। মস্তই বড়। পাঁচ মাইল লম্বাতে এবং দু মাইল চওড়াতে। মাত্র কয়েক বছর আগে এখানে ছোট ছোট প্লেন নামার মতো রানওয়ে হয়েছে। এয়ারবাস বা বড় বোয়িং নামতে পারে না। ছোট প্লেন নামলেও রানওয়েটি এতোই ছোট যে প্লেন আসার আগে মনে হয় এই বুঝি পড়ে গেল সমুদ্রে। একেবারে টায়-টায় জায়গা।

দিনের বেলার প্লেনটা যখন উচ্চতা কমাতে কমাতে এই দ্বীপপুঞ্জের দিকে নামতে থাকে তখন দেখে মনে হয় কোনো বা পরীদের দেশেই এসে পৌঁছলাম বোধ হয়। দ্বীপ ক’টি মিলে যেন রঙ-বেরঙের একটি গোল পাথরের মালা বলেই মনে হয়। কত রকম রঙের যে কোরাল রীফস্। কোথাও গাঢ় নীল, কোথাও সবুজ, কোথাও গোলাপি, কোথাও গাঢ় লাল, সবুজ নারকোল বন আর পাহাড় আর নারকোলবীথিতে ভরা সৌন্দর্যর প্রতীক দ্বীপগুলি সব। এই পরীদের দেশে প্লেন ক্রমশ নিচু হতে হতে “মাহেতে” নেমে পড়ে।

তান্জানীয়ান এয়ারলাইন্সও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এরই মতো। কথার বড় ঠিক থাকে না। আমাকে বলা হয়েছিল যে মাহেতে একরাত আমাকে এমনিতেই এয়ারলাইন্সের খরচে

থাকতে দেওয়া হবে। কিন্তু রাতের বেলা প্রায় জনশূন্য ছোট্ট এয়ারপোর্টে যখন প্লেন থেকে নামলাম তখন তানজানীয়ান এয়ারলাইন্স-এর স্টাফ বললেন আমরা তো সে সব জানি না। তখন তাদেরই বললাম আমাকে একটা সস্তার জায়গা ঠিক করে দাও। তা ওরাই বললো, এয়ারপোর্টের কাছেই একজন বৃদ্ধা তিনটি ঘরের ছোট্ট গেস্ট-হাউস চালান। সেখানেই গিয়ে উঠলাম। সে গেস্ট-হাউসটি প্রায় এয়ারপোর্ট-এর রানওয়ে যেখানে শেষ হয়েছে তার লাগোয়া। প্লেনের আসা-যাওয়ার সময় দেখা যায়।

সকালে উঠে তো বুড়ির সঙ্গে ভালো করে আলাপ করলাম। তাঁর স্বামী ছিলেন কিনীয়াতে। পেশাদার হোয়াইট-হান্টার। বাইরে থেকে আসা পয়সাওয়ালা শিকারীদের সঙ্গে থেকে তাদের হাতি, সিংহ, বুনো মোষ, হিপ্পো ইত্যাদির ভালো ভালো ট্রফি পাইয়ে দিতে সাহায্য করতেন। অনেক সময়ে নিজেরাও মেরে দিতেন খদ্দেররা দেশে ফিরে যাতে সহজে বৌ-শালাজ এবং শালীর কাছে "গুল" মারতে পারেন। তাঁর স্বামীর খদ্দেরদের মধ্যে বেশির ভাগ শিকারীই নাকি গুল-মারাতে যেমন দড় গুলি-ছোঁড়াতে তেমন ছিলেন না।

আমি বললাম, সে তো সব দেশেই।

বুড়ি বললো, তবে যাই বলো, একটি সুন্দর নিটোল নিশ্ছিদ্র "গুল" মারা দশটি "গুল-বাঘ" মারার চেয়েও অনেক কঠিন।

আমি বললাম, হক্ কথা। গুলের ইমারত কত কষ্টে, কত কল্পনায়, কত যত্নে আস্তে আস্তে তৈরি করতে হয় আর গুল-বাঘ তো ইংল্যান্ড আমেরিকা বা জার্মানীর তৈরি রাইফেলের ট্রিগারে এক আঙুলের টানেই টান মারা যেতে পারে।

মাহে দ্বীপের মধ্যে চমৎকার সব পথ আছে। সমুদ্রের পাশে পাশে 'কজওয়ে' আছে কংক্রীটের। সমুদ্রের জল জোয়ারে এবং বর্ষাতে অনেকখানি ভিতরে ঢুকে আসে। পাহাড় এবং উপত্যকা এবং গাছ-গাছালিতে সবুজ এই দ্বীপ। অন্য দ্বীপগুলিও। হু হু করে সমুদ্র থেকে হাওয়া বয়। মসমস্ খস্স্ খস্স্ করে রাতের আধো অন্ধকারে গাছ পাতা। তখন ভেবেও আতঙ্ক মিশ্রিত রোমাঞ্চ জাগে যে একসময় এই দ্বীপপুঞ্জ জলদস্যুদের এক বিরাট ঘাঁটি ছিলো। নানা জাতের জলদস্যুরাই এই দ্বীপের ভক্ত ছিলো। অবশ্য রুক্ষ মানুষদের ভক্তি জাগাবার মতো অনেক কিছুই এ দ্বীপের আছে। চোখ-জুড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্য, রঙ-বেরঙের কোরাল রীফ্স, ছবির মতো স্বপ্নের মতো সব বেলাভূমি এবং উজ্জ্বল চোখের, ফট্রি-এইট-আর-পি-এফ গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো ঝকঝকে কালো, ক্ষীণ-কটি গাঢ়-নিতম্বর ঝাঁকড়া চুলের তরুণীরা। এইখানে পৃথিবীর এক বিস্ময় এখনও আছে। তার নাম "কোকো-ড্যে-মেয়ার"। মানে সামুদ্রিক নারকোল। হয়তো একসময় এই নারকোল সমুদ্রের তলাতে হত। এর আকার এত বড় এবং এমনই দেখতে যে ঠিক মনে হয় কোনো পৃথুলা নারীর নিতম্ব। হুবহু। প্রকৃতির যে কত বিস্ময়ই আছে! তার ক'টির খোঁজই বা আমরা রাখি। নিতম্ব এমন দেখিনি তাই কোকো-ড্যে-মেয়্যার দেখে পুলকিত এবং কিঞ্চিৎ ভীতও হলাম।

"মাহেতে" ট্যুওরিস্টদের জন্যে ছোট ছোট মিনি-মক গাড়ি-ভাড়া পাওয়া যায়। জীপেরই মতো, খোলা, লাল, নীল, সব ঝকঝকে রঙ করা, কিন্তু জীপের চারভাগের একভাগ। ভারী মজার গাড়িগুলি। ভাড়া নিয়ে ট্যুওরিস্টরা নিজেরাই চালিয়ে বেড়ান।

এখনও এই সব দ্বীপে গুপ্তধন পাওয়া যায়। জলদস্যুদের পুঁতে রাখা। মাহেরই একটি অঞ্চলের নাম বেলোমাঁ। সেখানে কয়েকজন উৎসাহী মিলে একটি কোম্পানী ফর্ম করে মস্ত কুয়ো করে খনন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে গুপ্তধন প্রাপ্তির আশায়। ট্যাক্সি-ড্রাইভার আমাকে

সেখানে নিয়ে গেলো দেখাতে। তবে সেশেলস্ কম্যুনিস্ট দেশ। তোমরা অনেকেই আমেরিকার ডিয়েগো-গার্সিয়ার কথা জানো কিন্তু রাশিয়ার এই সেশেলস্-এর কথা জানো না। ভারত মহাসাগরের সেশেলস হচ্ছে রাশিয়ানদের জবরদস্ত নৌ-ঘাঁটি। ডুবো-জাহাজেরও। সেশেলস-এর পোর্টটিও সুন্দর। মনে হয় যেন আমেরিকার লস-অ্যাঞ্জেলেসের কাছের ডিজ্‌নীল্যান্ড-এ কোনো সুন্দর বন্দরের প্রতিমূর্তি দেখছি। সবই তো ক্ষুদে ক্ষুদে ডিজনীল্যান্ডে। যদি কখনও স্টেটস-এ যাও তো ডিজনীল্যান্ড দেখতে ভুলো না। এখন অবশ্য লস্-অ্যাঞ্জেলেস ছাড়াও ফ্লোরিডাতেও আর একটি হয়েছে। ওয়াল্ট ডিজনীকে আমরা মিকি-মাউসমুভির প্রবর্তক হিসেবেই জানি শুধু। কিন্তু একজন ব্যক্তির কল্পনার ডানা আর মনের জেদ একত্রিত হলে কী যে করা যায় আর কী যায় না সে সম্বন্ধে পুরো ধারণা করতে হলে ডিজনীল্যান্ড দেখতে হবে।

এখানে সব শুদ্ধ থাকবো সাতদিন। তিনদিন হয়ে গেছে।

এখন রাত। তোমাকে বারান্দায় বসে বসে চিঠি লিখছি। হু-হু করছে সামুদ্রিক হাওয়া। সারা দিন আজ বড় দুর্যোগ গেছে। কী ঝড় আর কী হাওয়া আর কী বৃষ্টি। তারই মধ্যে "ফোর্টিন-সিটার" "আইল্যান্ডার" প্লেনে চড়ে গেছিলাম অন্য একটি দ্বীপে বেড়াতে। তার নাম প্রাঁলে। প্লেন গিয়ে নেমে পড়লো নারকোল বীথি ঘেরা মাঠের মধ্যে। খড়ে-ছাওয়া একটি ঘর হচ্ছে "এয়ারপোর্টের" লাউঞ্জ। প্রাঁলেতে গিয়ে পৌঁছলাম দুর্যোগের মধ্যে এবং সন্ধের আগে ফিরেও গেলাম তারই মধ্যে। সারাটা দিন একেবারে সমুদ্রের উপরের একটি রেস্তোরাঁর বারান্দাতে বসে কাটলো। সেই রেস্তোরাঁর তরুণী মালকিনের সঙ্গে গল্প করে আর ব্রান্ডি খেয়ে। প্রবাসে এবং এমন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতে নিজের একঘেয়ে জীবনের পুরোপুরী পরিপন্থী এই রকম জীবন অথবা দিন (দিনই বলা ভালো) কাটাতে মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে।

ফরাসীদের আধিপত্য ছিলো এখানে। পর্তুগীজ জলদস্যুদের দাপটও কম ছিলো না। তবে ভাষাতে ফরাসীদের দাপটটা রয়ে গেছে এখনও। দ্বীপপুঞ্জের নামের উচ্চারণ সেশেলস্ কিন্তু বানান Seychelles। যে ছোট্ট দ্বীপে গেলাম আজ, তার নাম প্রাঁলে। কিন্তু বানান Praslin। মাঝে মাঝে ফরাসী না-জানা লোকেদের বড়ই বে-ইজ্জতি হয়ে যায়।

দারুণ লাগছে কিন্তু। আমার ল্যান্ড লেডি তাঁর ফরাসী ল্যান্ডলেডির মেয়ে এবং পুত্রবধূর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। তাদের একজনের বয়স বাইশ অন্যজনের উনিশ। পুত্রবধূর স্বামী দেশান্তরে গেছে। এবং মেয়েটি এসেছে প্যারিস থেকে, কলেজের ছুটি কাটাতে। সকালে ব্রেকফাস্ট করে প্যাক-লাঞ্চ এবং ওয়াইন নিয়ে একটি লাল-মিনিমোক গাড়িতে (ওদের নিজস্ব) ওরা আমাকে নিয়ে যেতো এই এতটুকু দ্বীপের বুকের মধ্যেরও গোপন গহন বেলাভূমি এবং কন্দরে। সাঁতারকাটা, গল্প করা, বালি নিয়ে খেলা, বালুবেলায়, তারপর রাক্ষস-রাক্ষুসীর খাওয়া। ওদের সঙ্গে পেয়ে নিজের বয়সটাও যেন কমে গেছে। ওরা দুজনেই সুন্দর ইংরিজী বলে। একজনের নাম পেত্রা অন্যজনের নাম (বৌদির) জুলি। দেখতেও অনেকটা জুলি অ্যান্ড্রুজের মতো। তবে অত লম্বা নয়। ওরা বলেছে এখান থেকে যেদিন আমি চলে যাব তার আগের রাতে মাহের নির্জনতম কন্দরের মধ্যে বসে ওরা আমাকে কাঁকড়ার বারবীকিউ করে খাওয়াবে। আর রাতভর সাঁতার।

প্রত্যেক পুরুষের শরীরের মধ্যে যে অনেক কাঁকড়া থাকে (হয়তো মেয়েদের শরীরেও থাকে ; তোমরাই বলতে পারবে !) সেই কাঁকড়াগুলো যখন হাঁটাচলা নড়াচড়া শুরু করে তখন যদি তাদের বার-বী-কিউ করে খাওয়া যেতো। বড় কষ্ট। পুরুষমাত্রই তা জানে। সে

যত বড় রিফাইন্ড, সংস্কৃতিসম্পন্ন পুরুষই হোক না কেন ! যে বলে জানে না, সে মিথ্যে কথা বলে। নয়তো তার পৌরুষ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা উচিত।

এ চিঠি তুমি তাড়াতাড়িই পাবে কারণ কালই ল্যান্ডলেডির এক জানা ভদ্রলোক বম্বে যাচ্ছেন মরিশাস হয়ে। উনি বম্বে এয়ারপোর্টেই তোমাকে লেখা চিঠিটা ফেলে দেবেন। এ চিঠি পাবার তিনচার দিনের মধ্যেই আমি হয়তো বেতলা পৌঁছে যাবো ! তোমার উত্তর আশা করব এবারে। চিঠিতেই দেবে ? না চলে আসবে ? জানিও। তাড়া নেই কোনো। যতটুকু সময় লাগে, নিও।

অশেষের কি খবর ? শ্রুতির ? তোমার বাবা কেমন আছেন ? বাতের কথা আর তো লেখোনি ? নিবাত শিখার মতো স্থির বাত কি মহুয়ার হাতে হত হলো ? বাতও, সময় খায়। সময় সকলেই, সব কিছুই খায়। সময় অক্সিজেনের মতো। সময় না খেলে বাঁচাই যায় না। তাই আমি সব সময় বলি, এটা আমার খুব ফেভারিট ফ্রেজ যে, সময়কে সময় দিলে সময়ই সব উত্তর ছুঁড়ে দেয় অথবা ভাসিয়ে আনে, সাগর কূলের এই বালুবেলার গভীর নানারঙা কোরালের ছায়ায় রাঙা ঢেউয়ের বুক থেকে যেমন "কোকো-ড্যা-ম্যেয়ার।" সেশেলস্-এর গন্ধ পাঠালাম এই চিঠিতে ভরে, এই রাতের হাওয়া আর আধো-অন্ধকার।

ভালো থেকো।

ইতি প্রবাসী রাজর্ষি

পুনশ্চ তুমি কেমন আছো ?

অনেক অনেকদিন তোমার চিঠি না পাওয়াতে তোমাকে খুবই মিস্ করেছি। আজও করছি। চিঠিতো মানুষের মনের জানালা। আমার মনের দক্ষিণমুখী জানালা। দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ আছে। বেতলা পৌঁছেই যেন দেখতে পাই তোমার অনেক অনেক চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

রাজর্ষি বসু

বেতলা, জেলা পালামৌ, বিহার

কলকাতা
বালিগঞ্জ প্লেস

রাজর্ষি, প্রীতিভাজনেষু,

তুমি যখন দেশে ফিরবে তখন এ চিঠি হয়তো তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে। বনী-সংক্রান্ত তোমার চিঠিখানি পাওয়ামাত্রই লিখতে বসলাম। জানি না, তুমি রওয়ানা হবার আগে পৌঁছবে না বলেই মনে হয়। অবশ্য তাড়াও ছিলো না।

তুমিতো সময় আমাকে দিয়েই ছিলে অঢেল। তাড়া করলাম আমিই। কথায় বলে না যে, চিঠি লিখে ড্রয়ারে ফেলে রাখতে হয়। সদ্য-পাড়া-ডিম অথবা সদ্য-মারা-বুনো-মুরগী যেমন তক্ষুনি তক্ষুনি খেতে নেই (পচা কথা অবশ্য !) তেমন সদ্য-লেখা-চিঠিও ডাকে

দিতে নেই। এইটেই নিয়ম। হয়তো সকলেই জানে। কিন্তু আমার এই চিঠির মতন কিছু চিঠি হয়তো থাকে যা লেখার সঙ্গে সঙ্গেই ডাকে না দিতে পারলে আর হয়তো কখনওই দেওয়া হয়ে ওঠে না। অথবা যদি পরে ডাকে দিতাম তাহলে তাৎক্ষণিক তা হয়তো বদলে যেতো। এমনকি উল্টেও যেতে পারতো। তাই এ ধরনের চিঠিকে গরম-গরম লুচির মতো প্রাপকের পাতে দেওয়াটাই রীতি। অন্তত ঋতির রীতি।

তুমি কিন্তু বেশ অসভ্য আছো। অথবা সম্প্রতি হয়েছো। তোমাকে অসভ্য বলবো ? না বলবো, তোমার ভাষা অশ্লীল। অবশ্য অশ্লীল ভাষা যিনি লেখেন তাকে সভ্য বলিই বা কি করে ? তবে তারই সঙ্গে এ কথাও বলব যে কোনো জন্মে সাহিত্যিক না হয়ে এবং তোমার তা হওয়ার কোনো সুদূর সম্ভাবনা না থাকলেও তোমার ভাষা যেখানে বল্গা-ছেঁড়া ঘোড়ার মতো দৌড়েছে সেখানেও হয়তো সাহিত্যরসোত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিচার করবে তোমাকে এবং আমাকেও যাঁরা চেনেন না তাঁরাই। কিন্তু যাকে চিঠির প্রথম প্রাপক হিসেবে চিঠিকে খাম-মুক্ত করতে হয় তার আনন্দ যেমন অসীম তেমন কখনও কখনও ধাক্কাটাও বড় কম নয়। ধাক্কা না বলে কি ধকল বলব ?

বনীর পরিচ্ছন্ন শরীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তুমি মাথার সিঁথির সঙ্গে উরুসন্ধির সিঁথির কথাও লিখেছো। আমি চিঠিটি পড়া অবধি ভেবে মরছি এমন লাইন তুমি লিখলেই বা কি করে আর ভাবলেই বা কী করে! পৃথিবীর কোনো সাহিত্যেই কোনো সাহিত্যিক নারী-শরীরের বর্ণনা দিতে এমন কিছু বলেছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই। এই সাহিত্যিকদের মধ্যে এমিল জোলা থেকে হেনরী মিলার এবং হেনরী মিলার থেকে সমরেশ বসু, সমরেশ বসু থেকে ফ্রেডরিক ফরসাইথ্ পর্যন্ত দিশি বিদেশি অনেক সাহিত্যিকের সাহিত্য বিবেচনা করেই বলছি। ধন্য তুমি ! ঋষি-ই বটে। ঋষি তুমি হতে পারো কিন্তু চোখ তোমার আদৌ ঋষির নয় ! এমন ঋষিতুল্য চোখ দেশে বেশি মানুষের থাকলে খুবই বিপদের কথা হতো।

তুমি এলে তোমাকে আবারও লিখব। আরো ভালো করে বুঝিয়ে ও গুছিয়ে লিখব। আপাতত জানিয়ে রাখি যে তুমি আমার বন্ধু হয়েই থাকো আজীবন, আমার তাই ইচ্ছা। আমাদের সম্পর্কর অন্য কোনো পরিণতি সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এ কারণে যে আমি নিছকই একজন মানবী। দেবী নই। এবং পেত্নীও নই। এতোদিন ধরে তোমার চিঠি পড়ে এবং চিঠির মধ্যে দিয়ে তোমাকে খুবই অন্তরঙ্গ করে জেনে আমার মনে হয়েছে যে তুমি মেয়েদের (শুধু আমাকে নয়, সাধারণভাবেই সব মেয়েদের) ভালো বোঝো। তাদের মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলি তোমার অনুভূতির অদৃশ্য পরশ এড়িয়ে যায় না। এমন করে আমাদের খুব বেশি পুরুষ যে বোঝে তা আমার মনে হয় না।

কিন্তু একটি জিনিস তুমি বোধহয় জানো না। অথচ তোমার তা জানাটা উচিত ছিলো। কথাটি হলো যে, এ পৃথিবীর কোনো মানবীই তার স্বামীকে অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাগ করে নিতে রাজী নয়।

যা বলছিলাম তা আবারও বলি ! কোনো মেয়েই তার স্বামীকে অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে জেনেশুনে ভাগ করে নিতে রাজী হতে পারে না। আমি জানি যে এ কথা ভালো করে জেনেও অনেক স্ত্রী তাঁদের স্বামীদের ঠকিয়ে পরকীয়া করেন এবং অনেক স্বামীই তাঁদের স্ত্রীদের অগোচরে অন্য নারীতে যান। কিন্তু এসব গোপনে নয় ; অন্ধকারে। আমার মনে হয় সংসারে সুখশান্তি বজায় রাখতে হলে ন্যূনতম মিথ্যাচারের প্রয়োজন থাকেই। একটি ছোট্ট মিথ্যা যদি একটি মস্ত সত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে তবে খামোখা যুধিষ্ঠির হবার

প্রয়োজনই বা কি ?

কিন্তু তুমি তো পুরুষ জাতের কুলাঙ্গারের মতো ধরা-পড়ার অনেক আগেই ঢাক-ঢোল বাজিয়ে জানিয়ে দিলে যে "ঠাকুরঘরেই" শুধু নেই, কলাও খাও। এবং খাবেও।

তুমি কিন্তু খুবই বোকা। বনীর সঙ্গে তার প্রেমিকের বিয়ে হচ্ছে একথা তুমিই লিখেছো। এবং আমার সঙ্গেও যদি তোমার বিয়ে হতো তবে এই দুই ঘটনার পর বনীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক অন্যরকম হয়ে যাবে কি না তাও এখনই জোর করে বলা যায় না। আমার তো মনে হয় অন্যরকম হবে। বনী এই দুই ঘটনার পর তোমার সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হতে নাও চাইতে পারতো। মেয়েরা নিরুদ্দেশে নৌকো ভাসানোতে বিশ্বাসী নয়। ঘাট পেলে নৌকো বেঁধে রাখতেই চায় এবং রাখে। ঘাটে বাঁধা থেকেও তাদের খেয়াল-খুশিমতো ভাসেও তারা। একজন গড়পড়তা মেয়ে একজন গড়পড়তা পুরুষের চেয়ে অনেকগুণ বেশি বুদ্ধি রাখে। এ কথাটা মনে রাখলে ভালো করবে।

যাকগে। এসব তো এখন নিছকই অ্যাকাডেমিক ডিস্‌কাসান। জল্পনার অবকাশ তো তুমি রাখোনি কোনো ! আমি দুঃখিত। সত্যিই দুঃখিত। তোমার জন্যে আরো বেশি দুঃখিত এই চিঠি পেয়ে তুমি হয়তো আমার জন্যেও দুঃখিত হবে। একটু। তোমার যাত্রা শুভ হোক।

Take Care.

ইতি—রীতিবদ্ধ ঋতি

পুনশ্চ এ চিঠি ইচ্ছে করেই দেরীতে পোস্ট করলাম। যাতে আফ্রিকাতে যাওয়ার আগে তোমার হাতে না পড়ে। কেন করলাম তা জানি না !—ঋ

* * *

বালীগঞ্জ প্লেস, কলকাতা

প্রিয় রাজর্ষি

আমি জানি যে তুমি এখন অনেক দূরে। চিঠি লিখতে তুমি বারণও করেছিলে। তবুও আগের চিঠিটি তুমি ফিরেই পাবে এবং পেয়ে হয়তো দুঃখ পাবে তাই আবারও লিখতে বসলাম। কেন যে নিজেকে নিজেই এমন করে ভুল প্রতিপন্ন করি নিজের সঙ্গে এমন কাটাকুটি খেলি তা জানি না।

আমারও বম্বে যাওয়ার সময় হয়ে এলো। তুমি হয়তো সে কথা ভুলেই গেছিলে। তুমি যখন ফিরবে তখন আমি বম্বেতেই থাকবো। চিঠি তোমার পেতে এবং আমারও তোমার চিঠি পেতে অনেকই দেরী হবে। বম্বের ঠিকানা পরে জানাবো।

তোমাকে চিঠি না লিখেই বা কি করি ? গত কয়েকমাস ধরে তোমার চিঠি পাওয়া এবং তোমাকে চিঠি দেওয়া যে আমার অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গেছে। কোনো বিশ্রী মাদকের মতো। এই অভ্যাস 'সু' অথবা 'কু' তা জানি না। তবে অভ্যেস যে, এটুকুই জানি। তুমি কি আমার উপরে রাগ করেছো ? দুঃখ পেয়েছো আমার চিঠি পড়ে ? পেও না। পেলে আমার দুঃখ রাখার জায়গা থাকবে না।

আমার মনে হয় তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া খুবই দরকার। হয়তো সেই প্রথম

দেখাই হবে শেষ দেখা। অনেকদিন আগের রাতের 'ঝাঁকিদর্শনকে' দেখা বলি না। ভুল করে অশেষকে ভালোবেসে আমি কম দুঃখ পাইনি। ভুল করে তোমাকে ভালোবেসেও দুঃখই পেলাম। ভালোবাসায় সুখের কপাল হয়তো সকলের থাকে না। কি করা যাবে! এ জন্যেই ভাগ্যকে মেনে নিতে হয়। ভাগ্যলিপি যেমন পুরুষ, শত পুরুষকারেও বদলাতে পারে না তেমন নারীও পারে না তার নিরন্তর বহতা চোখের জলেও। ভাগ্যকে স্বীকার যারা না করে তারা হয় ভ্রষ্ট, নয় ভণ্ড অথবা মূর্খ। মাঝে মাঝেই আমার খুব বনী হতে সাধ যায়। ঋতি কেন বনী হলো না, আর বনী ঋতি? মনে হয় বারবার। পাগল পাগল লাগে। আমার কপালেই যে কেন বারবার ভুল করে ভুল মানুষকে ভালোবাসার কথা লেখা ছিল তাই বা কে জানে!

ভালো থেকো। রাগ কোরো না। দুঃখ পেওনা আমার কারণে বেশি করে। এমনিতেও তো তুমি কম দুখী নও। উদার পুরুষমানুষের কপালে অনেক দুঃখ লেখা থাকে। সরল ও সৎ পুরুষেরও। সারল্য ও সততার মূল্য যারা দেয়, তারা হয়তো তোমার মতো করেই দেয়। আবারও বলছি, ভালো থেকো। বনীকে ছাড়াই যখন এতোদিন ভালো থাকতে পেরেছো তখন ঋতিকে ছাড়াও সহজে পারবে।

অসাধারণ পুরুষের দুঃখের রকমটাও অসাধারণই হয়। অসাধারণত্বর মূল্য এমনি করেই দিতে হয় বোধহয় প্রত্যেক পুরুষ এবং নারীকেও।

—ইতি তোমার অনুরক্তা ঋতি

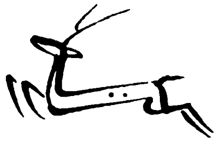

ঋতি রায়
মালাবার হিল, বম্বে

বেতলা
পালামৌ, বিহার

কল্যাণীয়াসু,

"যাবো যাবো" করে শেষে চলেই গেলে বম্বেতে। একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে। মনে হচ্ছে আমার সূর্যই ঢললো পশ্চিমে। ভাবতেই খারাপ লাগছে।

রাঁচী এয়ারপোর্টে টাইগার প্রোজেক্টের জীপ দাঁড়িয়ে ছিলো আমার জন্যে।

এ বছরে বৃষ্টি খুব তাড়াতাড়ি আসাতে এবং সর্বত্রই বৃষ্টি বেশ বেশি হওয়াতে প্লেন থেকেই আকাশের রঙ দেখে মন ভারী ভালো লাগছিলো। প্লেন থেকে নেমেতো দিল খুশ হয়ে গেলো। যদিও সেপ্টেম্বরের প্রথম তবু মনে হলো যেন পুজো এসে গেছে। এমন রোদ দেখলেই আমার কানে পুজোর ঢাকের বাজনা আর আরতির ঘণ্টা বেজে ওঠে। মনে হয় যেন কণিকা ব্যানার্জির গাওয়া গান শুনতে পাচ্ছি "শরত আলোর কমলবনে/বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল মোর মনে মনে/তারি সোনার কাঁকন বাজে আজি প্রভাতকিরণ-মাঝে/হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি—ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে!"

বিজুপাড়ার মোড়ে এসে সুরজের দোকানে চা এবং সিঙ্গাড়া খেলাম। দু মাস পরে দেশে ফিরে দেশের সব কিছুই ভালো লাগছে। আমার দেশের মতো সুন্দর দেশ এমন সুন্দর

মনের এবং শরীরেরও মানুষ সাদা বা কালো কোনো দেশেই নেই। শুধু যদি নেতাগুলো কুকুর-বেড়াল-শেয়াল-খচ্চর না হয়ে একটু মানুষের মতো হতো!

যাকগে আবার সেই কথা! যাক। ডালটনগঞ্জ শহরে যাওয়ার পথে গিয়ে যখন বাঁদিকে ঢুকে ঔরঙ্গার ব্রিজে উঠলো জীপ তখন দেখলাম কোয়েল আর ঔরঙ্গার সঙ্গমস্থলে কেচ্‌কীর কাছে ঔরঙ্গা আর কোয়েলের জল কানায় কানায় ভরে গেছে। পশ্চিমাকাশে নানারঙের আবীর খেলে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মনটা ভারী দ্রব হয়ে এলো। ভালোলাগাও কখনও কখনও শ্বাস রুদ্ধ করে দেয়। অস্তগামী সূর্যর দিকে চেয়ে মনটাও আমার পশ্চিমে ছুটলো যেন।

কুটমূর মোড়ে এসে বাঁয়ে মোড় নিলাম। সোজা রাস্তাটি চলে গেছে বারোয়াডি, হুটার, কুজরুম্ হয়ে কুট্‌কুতে।

বেতলায় আমার বাংলোতে পৌঁছেই সবচেয়ে আগে এককাপ চা খেয়ে চানে ঢুকলাম। তারপর চান করে পায়জামা পাঞ্জাবী পরে বারান্দার ইজীচেয়ারে বসে তোমার চিঠি দুটি খুলে পড়লাম।

দুঃখ হলো কি না জানতে চাইবে নিশ্চয়ই তুমি। জানতে চেয়েছো বলে একবার ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও তড়িঘড়ি উত্তর দিলাম না। বরং অনেকদিনই পর ডিম ভাজা আর কড়-কড় করে আলুভাজা দিয়ে খিচুড়ি খেয়ে তোমাকে চিঠি লিখব ভাবলাম। তারপরই ভাবলাম যে না! আজ ঘুমিয়েই পড়ি।

সেসেলস্ এর "মাহে" থেকে মরিশাস্ হয়ে বম্বেতে এসে পৌঁছেছিলাম এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে। তারপর ফ্লাইট ধরে দিল্লি। দিল্লি থেকে হপিং ফ্লাইট তখন পাওয়ার কথা নয়। টিকিটও ছিলো না আমার। রাতটা সেণ্টুর হোটেলে কাটিয়ে সকালের হপিং-ফ্লাইট ধরে রাঁচী। ধকলও কম যায়নি। তারপর জেট-ল্যাগও ছিলো। যে সব ব্যস্ত এক্‌জিক্যুটিভস্‌রা ইন্টারন্যাশনাল প্লেনেই থাকেন বছরের তিনমাস তাদের মতো তো নই আমরা! দু বছরে চারবছরে একবার বাইরে যাওয়ার সুযোগ ঘটে। তাই ধকলই মনে হয়! তা ছাড়াও ভাবলাম, সারা রাত ঘুমের ঘোরে তোমার চিঠির উত্তরের মক্সো করবো। সকালে উঠে ফ্রেশ হয়ে চান করে নাস্তা করে আগে তোমাকে চিঠি লিখবো তারপরই অন্য সব কাজ। যদিও অনেক কাজই জমে গেছে এ কদিনে।

তাই লিখছি।

দুঃখ কেন পাব ঋতি? যা তোমার চিঠি দুটি আমার জন্যে বয়ে এনেছিলো তা দুঃখ-সুখে মেশা এক মিশ্র অনুভূতি। সারল্য ও সততার মূল্য তো আমি একাই দিচ্ছি না। কড়ি গোনাতে তুমিওতো আছো আমার সঙ্গে। কি? পুরোপুরিই তো আছো।

তাছাড়া, তোমার সব বক্তব্যই শেষ হয়ে গেছে বলে আমি মনে করি না। জীবনে, কোনো মানুষের জীবনেই কোনো সত্যই যেমন কোনো বিশেষ অবস্থানে স্থির নয়, আকাশের তারাদেরই মতো পৃথিবীর চোখ দিয়ে দেখলে, ধ্রুব নয় তা মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে যেমন প্রতিনিয়তই সরে সরে যায় সতত সঞ্চরমান আমাদের সিদ্ধান্তগুলিও তো তাই! আজকের ঘটনার পটভূমিতে, আমাদের জানার প্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্ত আমরা নিই তা আজকের দিনের জন্যে নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু ছ মাস কী একবছর পর যখন ঘটনার পটভূমি ও জানার প্রেক্ষিত অনেকই বদলে যাবে তখনও এই সিদ্ধান্ত ঠিক যে থাকবেই তা কিন্তু বলা একেবারেই যায় না।

বনীর আর আমার বিয়ে বিয়ে খেলাতো ভেঙে গেছে বেশ কিছুদিনই হলো। এতোদিন তো আর তোমার সঙ্গে আলাপ হয়নি। মিতালিও হয়নি চিঠিতে চিঠিতে। এতোদিনেও তো

কোনো সম্পর্ক গড়ার জন্যে তেমন তাড়া অনুভব করিনি ! তারপরে হঠাৎই এলে তুমি তোমার চিঠির মধ্যে দিয়ে। তুমি এলে। কোনো অদৃশ্য সুখকারী দেবতার দানেরই মতো, চৈত্রবনের ঝড়ের ফুল অথবা ভুলেরই মতো।

আমার তখনও কোনো তাড়া ছিলো না। কিন্তু বনীর সব কথা অকপটে তোমাকে প্রথমবার জানানোর পর থেকেই মনে হচ্ছিল যে আমার না থাকলেও তোমার হয়তো তাড়া আছে। মেয়েরা আর পাখিরা ঘর-বাঁধা আর জীবনকে পুরোপুরি সমার্থক বলে মনে করে। নীড় বাঁধতে না পারলে পাখিদের জীবন যেমন বৃথাই যায় হয়তো মেয়েদেরও তাই। পাখিরা প্রকৃতির বিধানেই "জোড়ে" থাকে। কিন্তু শিকারির গুলি যদি তাদের বিযুক্ত করে তখন থাকা-পাখির অসহায় একাকিত্বর কান্না সহ্য করা যায় না। পাখিদের মধ্যে দাম্পত্য প্রেম অতি গভীর। একে অন্যর উপর বড় নির্ভরশীল ওরা।

তোমার পৌনঃপুনিক উৎসাহে স্থির করলাম যে, তোমাকে ছটফটানি থেকে বাঁচাই। গ্রীষ্মবনের দুপুরের পিপাসার্ত পাখিদের আমি অতি কাছ থেকে দেখেছি। আমি জানি, তাদের কষ্টর স্বরূপের কথা। তোমাকে আমার তেমনই মনে হয়েছিলো যদিও তোমার শিক্ষিতমনের শালীন ভব্যতাতে তুমি কখনওই প্রকাশ করোনি নিজেকে তেমন করে। শিক্ষিত মানুষদের অনেকই অসুবিধে। সব ব্যাপারেই। যন্ত্রণায় কাতর হলেও, সে আত্মীয়-মৃত্যুর শোকই হোক, কী প্রিয়জনের বিরহ চিৎকার করে কাঁদতে পারে না সে। আবার আনন্দে প্রথম বরষার পাহাড়ী নদীর মতো উচ্ছল হলেও সে উচ্ছলতা বুকের বাইরে আনতে পারে না। আধুনিক শিক্ষিত মানুষেরা, 'বুদ্ধিজীবীরা অদ্ভুত একধরনের জীব। গুহামানব আর স্পেসক্র্যাফ্‌ট বা সমুদ্রের অতলে বসবাসকারী মানুষের মধ্যবর্তী সময়ের ভূ-পৃষ্ঠের বড় শহরে বসবাসকারী এই আধুনিক, ইনটেলেকচুয়াল শিক্ষিত মানুষেরা এক আশ্চর্য জীবন যাপন করে। তাদের মানবিক স্বাভাবিকতা প্রায় মরেই এসেছে অথচ যান্ত্রিক অস্বাভাবিকতা এখনও পুরো দখল নেয়নি। এই "ত্রিশঙ্কুর" মানসিকতার, অল্পবুদ্ধি-ভয়ঙ্কর মানুষদের নিয়ে বড়ই মুশকিল। আমরা দুর্ভাগ্যবশত ঐ দলেই পড়ি। পড়ে গেছি। নিজেদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাতেই। এই "স্যুডো ইণ্টেলেকচুয়ালদের" দলে ; যারা সবজান্তা।

চিঠিটা বড়ই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। হয়তো জেট-ল্যাগ কাটেনি বলেই। নতুবা নিজেই এলোমেলো হয়ে গেছি বলে। আমার চিঠিতে একটা শব্দ সম্বন্ধে তুমি অস্বস্তিতে পড়েছো জানিয়েছো। তুমি লিখেছো আমি মানুষ হিসেবে অসভ্য। লেখাও আমার অশ্লীল।

আমার কিন্তু তা মনে হয় না ঋতি। ভাষার উদ্দেশ্যই হলো মনের ভাবকে যথার্থভাবে, একটুও বাকি না রেখে প্রকাশ করা। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলতেন "তুমি চোখ দিয়ে যা দেখো, নাক দিয়ে যে গন্ধ পাও আঙুল দিয়ে যা পরশ করো এবং তোমার সবকটি ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছুকেই ছোঁও সেই সমস্ত কিছুকেই পাঠক-পাঠিকাদের এমনভাবেই দিয়ে দিও যেন সবটুকুই দেওয়া হয়। কিছুমাত্রই বাকি না থাকে।"

অবশ্য এটা তাঁর লেখকদের প্রতি উপদেশ। আমি তো আর লেখক নই ! কিন্তু যে চিঠি লেখে সেও তো একধরনের লেখক। যেই মনের ভাব কথায় প্রকাশ করে বলতে চায় সেই লেখক। হেমিংওয়ের "ফর হুম দ্যা বেল টোলস্' উপন্যাসে তাঁবুর নিচে স্লীপিং-ব্যাগের মধ্যে যে চরম আদরের বর্ণনা আছে তাকে কি অশ্লীল বলবে তুমি ? যা কিছু জীবন-সম্পৃক্ত, জীবন-সম্পর্কীয় তাই কি অশ্লীল ? অথবা অশ্লীল নয় ? "অশ্লীল সাহিত্য" বলে কোনো সাহিত্য নেই। অসকার ওয়াইল্ডের 'পিকচার অফ ডরিয়ান গ্রে'র মুখবন্ধে তিনি যে উক্তি করে গেছিলেন তা এখনও Good Law. "Books are goodly written or badly written, that is all." PROFANITY'র কোনো ভূমিকা সাহিত্যে নেই।

লরেন্সের লেডি চ্যাটার্লিজ লাভারকেও কি তুমি অশ্লীল বলবে ? আমি বলব না। বরং প্রকৃতির সঙ্গে, সমাজের উঁচুতলার শারীরিক ভাবে অসুখী এক নারীর সঙ্গে, সমাজের নিচুতলার একজন শরীরীকার্যে সমর্থ পুরুষের পৌনঃপুনিক মিলনের মধ্যে দিয়ে লরেন্স প্রকৃতি, পুরুষ এবং নারীর ভূমিকা একাকার করে দিয়েছেন। যাঁরা করে দেখিয়েছেন যে জীবনের যা কিছু আনন্দর তীব্র সুখবাহী এবং যা কিছুই শাশ্বত (মানুষের যৌন-জীবনকে বাদ দিয়ে তো মানুষ হয় না) তার সবকিছুরই প্রকাশ সাহিত্যে শুধু হতেই যে পারে তাই নয়, হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

ব্যাপারটা পুরোপুরিই উপস্থাপনার। "ব্লু-ফিল্মের" সঙ্গে "সফ্‌ট-পর্নো"র যা তফাৎ সেইটুকুই তফাৎ অশ্লীলতায় আর সাহিত্যে। হেনরি মিলারের "ট্রপিক অফ ক্যানসার" বা বটতলার "রমা এবং সন্নিসী" ইত্যাদি বই অবশ্যই অশ্লীল। কিন্তু হেমিংওয়ে বা ফরসাইথ্‌ বা নবোকভের লেখাকে আমি কখনওই অশ্লীল বলতে পারি না। সমরেশ বসু প্রজাপতি এবং বিবরে সামগ্রিকভাবে না হলেও কোনো কোনো জায়গাতেই নিশ্চয়ই অশ্লীল, যেমন অশ্লীল বুদ্ধদেব বসু 'রাতভরে বৃষ্টি'তে।

প্রসঙ্গর অনুপযুক্ত, ভাষার শ্রী বাড়াতে যা অপ্রয়োজনীয়, বক্তব্যকে জোরালো করতে যার সাহায্যর প্রয়োজন নেই সে জিনিস জোর করে টেনে আনার নামই অশ্লীলতা। বিছানার দৃশ্য বা নারী-পুরুষের রমণের বর্ণনা মাত্রই কখনওই অশ্লীল হতে পারে না। চরিত্রগুলির পরিণতি, মানসিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাদের সামাজিক অবস্থান, এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর উচ্চতা বা নীচতার উপরই সব কিছু নির্ভর করে। লেখক যদি রুচিসম্পন্ন হন তো রমণের বর্ণনাও পরম রমণীয় ভাবেই দিতে পারেন এবং তা অবশ্যই সাহিত্য হয়ে ওঠে। রমণ বাদ দিয়ে তো জীবন নয়, যেমন মরণ বাদ দিয়েও নয়।

ঐ "মাথার সিঁথি" এবং "উরুসন্ধির সিঁথি"র ব্যাপারটি এমন হঠাৎ কলম দিয়ে বেরিয়ে এলো যে নিজেই 'থ' হয়ে গেলাম। কিন্তু পরমুহূর্তেই এই বাক্যটির IMAGERY-তে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। একজন চিত্রকর ঐ লাইনটির মধ্যে হয়তো নান্দনিক কিছু খুঁজে পেতে পারেন। যদিও তুমি পাওনি।

বাক্যটি লিখে ফেলে কাটবার আগে আমারও মনে হয়েছিলো যে আমার জানা কোনো দিশি-বিদিশি সাহিত্যিক ও কবি অথবা চিত্রকরও মেয়েদের এই মাথার সিঁথির সঙ্গে উরুসন্ধির সিঁথির মধ্যে শুধু অতীন্দ্রিয় এক সৌন্দর্যই নয় একধরনের জ্যামিতিক ব্যাপারও যে পরিস্ফুট তা হয়তো আবিষ্কার করেননি। অমন লাইন যখন কলম থেকে বেরিয়েই গেলো তখন আর কাটলাম না।

রাগ কোরো না ঋতি। আমি একজন রীতিবহির্ভূত জংলী মানুষ, যে মানুষের শরীরের ভাগীদারেরও নাম বনী। আমি যে তোমাদের শহুরে শিক্ষিত ওয়েল-ম্যানারড হ্যাণ্ডসাম এক্‌জিক্যুটিভসদের মতো "টাঙ্গ-টাইয়েড" "ভদ্রলোক" হবো এমন আশা করাটাই তো অন্যায় ! এতো কিছু বলার পরও যদি অপরাধী মনে করো তাহলে ক্ষমা কোরো না। শাস্তি দিও।

আমি যদি মেয়ে হতাম এবং শিল্পী হতাম ঋতি তাহলে আমি MALE NUDESএর উপরে specialise করতাম। আমার দেশে পুরুষ ও মেয়ে চিত্রকরের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। অথবা নারীশরীরেরই সমস্ত দিক চিত্রজগতে প্রাধান্য পেয়েছে। কত মহিলা শিল্পীও শুধুমাত্র নগ্ন নারী শরীর নিয়েই কাজ করেছেন কিন্তু তেমন একজনও কি মহিলা শিল্পী নেই

যিনি পুরুষদের সৌন্দর্যর নগ্ন দিকটা (অবশ্য কৌতুক/হতাশা এবং লজ্জার দিকও আছে) তুলে ধরতে পারেন ?

আসলে এখনও তোমাদের “কিন্তু” যায়নি। মেয়েদের প্রকৃত Liberation এর এখনও ঢের দেরী আছে এই দেশে। তোমরা নিজেরা নিজেদের মুক্ত না করলে অন্যে কি করতে পারে ?

এতো সব কথাও বোধহয় জেট-ল্যাগের জন্যেই বলা হলো বকবক করে। আজই চিঠিটা লেখা উচিত হলো না। কিন্তু লিখে ফেলেছি বলেই ডাকে দেবার জন্যে বিষম তাড়া বোধ করছি। তোমারই মতো আর কী ! এটি ডাকে ফেলে তো দিই ! পরে না হয় সংশোধনী পাঠানো যাবে।

তোমার জন্যে হাতির লেজের চুলের হাতের বালা এবং মালা, (যে মালার লকেট হচ্ছে সিংহের থাবার একটি নখ) নিয়ে এসেছি। আরও এনেছি আরুশার বিখ্যাত মীরশ্যাম কোম্পানীর একটি ফুলদানী। দিনের দৈর্ঘর সঙ্গে সঙ্গে এর রঙ বদলাবে। আরও এনেছি ওখানের বিখ্যাত কাঠের কাজ, ওয়াল-হ্যাঙ্গিঙ্গস ; মূর্তি নানারকম। তোমার জন্যে একটি আলাদা প্যাকেট আছে। কবে কখন কী ভাবে দেখা হতে পারে জানালে হাতে করেই দেব। নইলে, মানে দেখা যদি নাইই হয়, তো ক্যুরিয়ার সার্ভিসে বা অন্যভাবে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। জানিও।

ভালো থেকো। আমাদের “বনদেওতা” তোমার মঙ্গল করুন। এখান থেকে পাঁচমাইল দূরে গভীর অরণ্যের মধ্যের একটি বহুপ্রাচীন অশ্বত্থ গাছের নিচে বনদেওতার ঠাঁই। প্রতিবছর সারহুল উৎসবে ওরই কাছাকাছি কোনো ভালো শাল গাছ বেছে নিয়ে ওঁরাওরা অনুষ্ঠান করে। বসন্তের শেষে। সেই বনদেওতার “থানে” গিয়ে তোমার সুখের জন্যে পুজো চড়িয়ে আসবো আমি।

রাগ কোরো না আমার উপর। কারও উপরই ! রাগের চেয়ে বড় দৌর্বল্য আর দুটি নেই। মনের জোর যাদের আছে তারা সকলেই তা জানে।

ঋতি, আমার স্মৃতি, সত্তা ও ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠো।

প্রীতিধন্য তোমার রাজর্ষি

* * *

রাজর্ষি বসু,
বেতলা, পালাম্যু, বিহার

মালাবার হিল
বম্বে

রাজর্ষি প্রিয়বরেষু,

বম্বেতে থিতু হয়ে বসেছি।

বম্বে অনেক ব্যাপারেই কলকাতার থেকে ভালো আবার কলকাতা বম্বের চেয়ে অন্য অনেক ব্যাপারে। বম্বের মানুষ কলকাতার মানুষের চেয়ে বেশি কাজ করে। নিয়মানুবর্তিতা বেশি এখানে। তবে বম্বেতে খরচ বেশি। রোজগারও অবশ্য বেশি। বেশিরভাগ

অফিস-কাচারীতেই সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ। বহুদূর থেকে মানুষ কাজে আসে। তবে সাবার্বান ট্রেনে কলকাতার হাওড়া শিয়ালদহর মতো বিশৃঙ্খলা ও ভীড় নেই। ভীড় থাকে না তা নয় তবে কলকাতার ভীড়ের সঙ্গে তা তুলনীয় নয়।

তবে কলকাতার প্রাণ নেই বম্বের। বম্বের যেসব মানুষ কলকাতায় লাগাতার কিছুদিন থেকে গেছেন তাঁরা সকলেই কলকাতার এই "প্রাণের" কথা বলেন। যে প্রাণের অস্তিত্ব কলকাতার নোংরায় আর ধুলোয়, দারিদ্র্যে আর অস্বস্তিতে বোঝা পর্যন্ত যায় না সেই প্রাণই প্রচণ্ডভাবে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে দূরে এলে।

একটি ওয়ান-বেড-রুম ফ্ল্যাট পেয়েছি। কোম্পানীরই ফ্ল্যাট। দক্ষিণ খোলা। ফার্নিচার-টার্নিচারও কোম্পানীর। একটি মারাঠী মেয়েকেও পেয়েছি। ওই রাঁধে বাড়ে। ফ্ল্যাট সামলায়। শনিবার ও রবিবার আমি নিজেই রাঁধি, যেদিন নেমন্তন্ন না থাকে। বা, বাইরে খাই। ওকে বাঙালি রান্না শিখিয়ে নিতে হবে। ইড্‌লি-দোসা ভালোই করে তবে আমার ওগুলো খেতে ভালো লাগে না। প্রথম কদিনতো সেদ্ধ ভাতে ডিম আর আলু সেদ্ধ করে চালালাম। এখন আস্তে আস্তে সবই ম্যানেজবল্ হয়ে আসছে।

এখানে অনেকেই এলিজিবল্ ব্যাচেলরের সঙ্গে আলাপ হলো। বম্বে দিল্লীর ছেলেরা কলকাতার ছেলেদের তুলনায় জামা-কাপড়ে অনেকই বেশি সপ্রতিভ। তাদের জামা-কাপড়-জুতোর খরচাও অনেক বেশি। কথায় কথায় গুড মর্নিং আর গুড ইভিনিং। এতো বেশি "প্লীজ" "থ্যাঙ্ক উ্য", "ভেরী নাইস্ অফ উ্য", "ভেরী কাইণ্ড অফ উ্য" যে মাঝে মাঝে ভড়ং বলে মনে হয়।

দু তিনটি ছেলে (একজন বাঙালি দুজন অবাঙালি) ইতিমধ্যেই "সবিশেষ আগ্রহ" প্রকাশ করেছে আমার প্রতি। প্রত্যেকেই ডেট চেয়ে শুক্রবার রাতে বা শনিবার রাতে সী-রক্ এর রিভলভিং রেস্তোরাঁতে, নয়তো তাজ ইন্টারকন্টিনেন্টালের "মিং-রুমে" চাইনীজ খাওয়াতে নিয়ে গেছে। ওবেরয় ইন্টারকন্টিনেন্টালের বিখ্যাত বুফে লাঞ্চেও নিয়ে গেছে দু শনিবারে। কিন্তু হলে কী হয়! বনজ্যোৎস্নার মতো, সবুজ অন্ধকারেরই মতো; আমার মজ্জায় মজ্জায় রাজর্ষি বসু বাসা গেড়েছে। একে ঝেড়ে না ফেলা অবধি আমার উপায় নেই কোনো। অথচ ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে বুঝি, যে এ মোহ ছাড়া কিছুই নয়।

তোমার সঙ্গে আমার যে পত্র-মিতালি তাকে প্রেম বলা কি ঠিক হবে? তাকে প্রেম বলে ভাবলে হয়তো বড় তাড়াতাড়ি মোহভঙ্গ হয়ে যাবে। জানি না।

কলকাতায় থাকতেও তোমার সঙ্গে চিঠিতেই যোগাযোগ ছিলো তবু মনে হতো যেন কাছেই আছো। বম্বেতে এসে মন খারাপ লাগছে বড়। ইচ্ছে করলেই হুট করে তোমার কাছে যেতে যে পারবো না! অথচ কলকাতায় থাকাকালীন যেন হুট করে কতবারই গেছি তোমার কাছে! এই আধুনিকতম যোগাযোগ ব্যবস্থার দিনেও ভৌগোলিক অবস্থানের দূরত্ব মনকে প্রভাবিত করে দেখে অবাক হচ্ছি। রাঁচীতে কি টেলেক্স মেসিন আছে তোমার জানাশোনা কারও? থাকলে সেই নম্বরটি আমাকে জানিও। হঠাৎ কোনো খবর দিতে হলে টেলেক্স পাঠাবো। ওঁরা যেন তোমাকে রাঁচী থেকে খবর দিয়ে দেন।

শনি রবিবারে তো ছুটিই থাকে। তার সঙ্গে দুদিন ছুটি নিয়ে সত্যি সত্যিই হুট করে চলে যাবো তোমার কাছে বর্ষা থাকতে থাকতেই। কলকাতা হয়ে গেলে, সময় লাগবে। বম্বে থেকে সকালের ফ্লাইটে দিল্লী গিয়ে দিল্লী থেকে রাঁচীর কোনো ফ্লাইট ধরে রাঁচী পৌঁছে যাব। কাকাকে আগে থাকতে জানালে কাকা টাটা থেকে গাড়ি পাঠাবেন। তোমার কাছে পৌঁছেই গাড়ি ছেড়ে দেবো। তুমি বেতলা ছেড়ে আবার কোথাও যে যাবে না সেই শুভসংবাদটি এই

চিঠির উত্তরে যদি পত্রপাঠ জানাও তো খুশি হব।

বম্বে শহরের বর্ষাকালটা মহা দুর্ভোগ সৃষ্টি করলেও আমার কিন্তু খুবই রোম্যান্টিক লাগছে। অফিসে আমার ঘরের জানালা দিয়ে উথাল-পাথাল খোলা সমুদ্রের উপর ঝড় আর বৃষ্টির দাপট চোখে পড়ে। সমুদ্র মানুষকে সবসময়ই উদাস করে দেয়। তার উপরে বর্ষার সমুদ্র হলে তো কথাই নেই। বেশি বৃষ্টি হলেই শহরের অনেক পথে জল জমে। তাজ ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার দুপাশে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ে। হোটেলের সামনের পার্কিং স্লটে পার্ক করে রাখা স্কুটার ও মোটর সাইকেলদের সামুদ্রিক ঢেউ ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দেয়। সমুদ্রের উত্তাল রূপ এখন।

সামনেই ইদুজ্জোহার ছুটি আছে জুলাইয়ের শেষে। সম্ভবত পঁচিশে। সোমবার পড়েছে। যদি শুক্রবারটা ছুটি নিতে পারি তাহলে চারদিন ছুটি হবে। ঐ সময়ে না পারলে পনেরোই অগাস্টের আগে যাবো। পনেরোই অগাস্টও এ বছর সোমবারই পড়েছে। এখনই তো জুলাই এর মাঝামাঝি হয়ে গেলো। তাই ইদুজ্জোহার সময়ে গেলে তোমাকে আগে জানাতে হয় তো পারবো না। অগাস্টে গেলে আগেই জানতে পাবে।

যাই হোক, এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, বম্বেতে আছি মানেই "ধর্মেও আছি জিরাফেও আছি।"

ভালো থেকো
ইতি—ঋতি

লজ্জা করছিল। ঋতির লজ্জা যে করছিল না, তা নয়।

কিন্তু লজ্জা ছাড়াও অন্য আরও একটি অনুভূতি তাকে ছেয়ে ছিল যে অনুভূতির শরিক সে আগে কখনও হয়নি।

গাড়িটা যেই কুরুর মোড় থেকে চাঁদোয়া টোড়ির দিকে মোড় নিল এবং একটু পরেই চাঁদোয়ার ঘাটে উঠতে লাগল ওর মনটা বড়ই খুশি খুশি লাগতে লাগল।

বনে এলেই মন খুশি হয়। কিন্তু বনীর বনে অথবা বনীর স্বল্পদিনের স্বামীর বনে এলে বোধহয় আরও বেশি খুশি হয়।

রাঁচী থেকে বেরুবার পরই রাতুর রাজার বাড়ির কাছে একটু বৃষ্টি পেয়েছিল। তারপ থেকেই পরতে-পরতে মেঘ জমছে শুধু। আকাশ ক্রমাগত কালো থেকে কালোতর হ আসছে। ঝুরু-ঝুরু করে হাওয়া দিচ্ছে, একটা ফিকে গোলাপি-রঙা আলতো ফুল, বাসি মরা, বিচিত্র বর্ণর পাতার রাশ উড়িয়ে সরিয়ে ঝেঁটিয়ে নিচ্ছে এবং ফিরিয়ে দিচ্ছে এপাশ ওপাশ। দারুণ কিছু একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বলে প্রকৃতি যেন প্রস্তুত হচ্ছে।

প্রস্তুত কি ঋতিও হচ্ছে? অবশ্য তার প্রকৃতি অন্য।

কেন যে এত কাণ্ড করে বম্বে কলকাতা, কলকাতা হয়ে রাঁচী এবং রাঁচী থেকে বেতলায় দৌড়ে এল তা নিজেই ভাল বুঝতে পারছে না। অশেষের ব্যাপারটা ঋতিকে যেমন বিস্রস্ত করে দিয়েছিল, ওর চাকরী পাওয়াটা এবং রাজর্ষির সঙ্গে বন্ধুত্ব তাকে আবার জীবন সম্বন্ধে একধরনের দৃঢ়তা ও আলোও এনে দিয়েছে।

রাজর্ষি বার বার লেখে একটাই জীবন। একটা মাত্র জীবন। সেই জীবনটাকে নিয়ে ঋতিরও একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার হয়ে পড়েছে বোধহয়। তাই ভিতরের এক অবুঝটানে জোয়ারে-ভাসা কুটোর মতো ভেসে পড়েছে ও। এখন পৌঁছে যদি দেখে যে তিনি স্বস্থানে নেই তবে হতাশার আর শেষ থাকবে না।

যখন বেতলা পৌঁছলো তখন প্রায় বারোটা বাজে। কাকাকে রাঁচীতেই গাড়ি পাঠাতে বলেছিল। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এসে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের হোটেলে ঢুকে হাতমুখ ধুয়ে সামান্য ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়েছিল।

ড্রাইভার খুব ভালো গাড়ি চালিয়েছে। বারবার কাকার গাড়ি নিয়ে ঠাট্টা করাতে শ্রুতি নিশ্চয়ই কাকাকে কিছু বলেছিল। এবারের গাড়ি এবং ড্রাইভার দুই-ই অতি উত্তম।

রাজর্ষির বাংলোর গেটে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঋতি শুধোল সাহাব হ্যায়?

নেহী জী।

নেহী হ্যায়?

ভেঙে-পড়া গলায় বলল ঋতি।

নেহী হ্যায় মতলব, মারুমার গ্যয়ে।

মারুমার?

জী হাঁ।

সাবতো ছুট্টিমে হ্যায়, দোদিনকি।

কব লওটেঙ্গে?

পড়শু।

তো!

আপ চলি যাইয়ে না হুঁয়া। স্যায়েদ রাস্তেমেই ভেট্ হো যায়গা উন্‌সে। পন্‌রা মিনিট তো স্রিফ হুয়া হোগা, নিক্‌লা হিঁয়াসে।

ড্রাইভার বলল, রাস্তে জারা বাতাও তো ভাইয়া।

একদম সিধা যানা। তব্ ডাইনে কোয়েল নদীয়া মিল্‌লে পর নদীয়া পার করকে ব্রিজসে যানা। নদ্দীপার হো কর গাড়ু। বাস্। গারুসে সিধা নিকালিয়াগো। মারুমার বস্তীকি পইলে ঔর্‌ভি ছোট্টিসি ইক নদীয়া মিলেগী। নদীয়া পার হো কর্ বাঁয়া বাংলা দিখাই দেগা। থোড়াসি চড়াই উঠনেসে।

যেতে পারবে তো বংশীবাদন?

ঋতি ভয়ে ভয়ে শুধোলো। জঙ্গল পাহাড়ের রাস্তা। তেল-টেল কম পড়ে যাবে না তো?

হ্যাঁ পারব দিদি। আর তেল অনেক আছে। জঙ্গল তো কি? আমিও তো জঙ্গলেরই লোক। আমার বাড়ি পুরুলিয়ার ঝাল্‌দাতে। জঙ্গল পাহাড় সব আছে সেখানেও। জানোয়ারও কম ছিল না একসময়ে। তুলিনের নাম শুনেছেন দিদি? ঝালদারই কাছে। অতি চমৎকার জায়গা।

বৃষ্টিটা কিন্তু তখনও নামেনি। কবে নামবে ঈশ্বরই জানেন। তবে যখন নামবে, তখন বোধহয় দিন দুয়েকের আগে থামবে না। বেশ কয়েকমাইল যাওয়ার পর পথের ডানদিকে গাছপালার মাঝে মাঝে ঝলক ঝলক কোয়েল নদী চোখে পড়তে লাগল। তারপর প্রায় পুরো নদীই। তারপরেই ডানদিকে পাকা ব্রিজ। ব্রিজ পেরিয়ে গাড়ু বাজার। তারপর আবার জঙ্গল। দিনেরবেলা অবিরাম অগণ্য ঝিঁঝি ডাকছে। তাদের ডাকের অনুরণন উঠছে।

ঋতির শরীরেও ঝিঝি ডাকছে নিঃশব্দে। এ ঝিঝিগুলো যে এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল কেউই জানে না। ও তো নাই।

বাঁদিকে হঠাৎ একটি প্রচণ্ড প্রমত্ত জলরাশির আওয়াজ শোনা গেলো। আওয়াজটি ক্রমশই বাড়তে লাগল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলো ঋতি। প্রচণ্ড একটি জলপ্রপাত। যদিও রাঁচীর হুনড্রু প্রপাতের মতো অত উঁচু থেকে পড়ছে না কিন্তু বেশ চওড়া এবং বেশ বড় প্রপাত। জলের শব্দে কিছুই শোনা যাচ্ছে না। এমন সময় গাড়িটাও থেমে গেল।

কি ব্যাপার বংশী....

তারপর সামনে তাকিয়েই দেখল একটি জীপ পথের প্রায় মাঝখানে কে যেন পার্ক করে রেখেছে। ডানদিক বাঁদিক গাড়ি বাড়ানো যে যায় না তা নয় তবে ডানদিকে গেলে পাহাড়ে গাড়ি জখম হতে পারে, বাঁদিকে গেলে খাদে পড়ে যেতে পারে।

কোন্ বে-আক্কেলে লোক!

বংশীবাদন বলল।

ঋতি ভয়ে ভয়ে নামল গাড়ি থেকে। ডাকাত টাকাত হলে জঙ্গলে পালাবে। কিন্তু জঙ্গলে যাবেটা কোথায় সেটা একবারও ভাবল না। সিনেমাতে টিভিতে নায়িকারা জঙ্গলে সহজেই পালিয়ে গিয়ে নিজেকে ও দর্শকদেরও বাঁচায় কিন্তু....।

দুপা এগতেই প্রপাতটা পুরোপুরি দেখতে পেল। প্রপাতের নিচে যে বিরাট দহ এবং যেখানে একদল সাদাচুল পাগলের মাথার মতো সাদা ফেনা কুণ্ডলী পাকাচ্ছে শাসাচ্ছে ফোঁপাচ্ছে এবং তারপরই বুড়োদের বিড়বিড়ানির মতো বিড়বিড় করে থেমে যাচ্ছে। সেই দহর মধ্যেই দেখতে পেল একজন মানুষকে। মানুষটি নিশ্চয়ই ডুবে যাচ্ছে। ততক্ষণে বংশীবাদন পথরোধকারী জীপের কাছে গিয়ে হর্ন টিপে দিয়েছে। দুবার টিপে তারপর একসঙ্গে অনেকক্ষণ টিপে রইল। কে জানে! কতদূরে দূরে পাহাড়ে জঙ্গলে ছুটে গেল সে আওয়াজ।

ঋতি ছুটে এসে বলল, সাঁতার জানো? বংশীবাদন?

না, দিদি। ঐ কম্মটি জানি না।

ঋতি মনে মনে বলল, তাহলে কোন্ কম্মটি জানো?

ঐ দ্যাখো, একজন মানুষ ডুবে মারা যাচ্ছে।

আপনি জানেন?

আমি জানি। কিন্তু সে তো ক্লাবের সুইমিং পুলের শৌখিন সাঁতার। এ জলের কী তোড়। চারদিকে পাথর। তাছাড়া কস্ট্যুও তো নিয়ে আসিনি।

ডোবেনি তো সে লোক দিদি? ঐ দিকেছেন! হেই বাপা। পাড়ের দিকে আস্তে আস্তে আসতেচে।

এবারে ঋতি চিনতে পারল। চিনতে পেরেই ওর হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনামা, অজানা এক ভয়ে। এবং লোকটি পাড়ের দিকে এগিয়ে না আসলে ও হয়তো শাড়ি-সায়া-জামা খুলে ফেলে ব্রা আর প্যান্টি পরেই জলে ঝাঁপ দিতো। কিন্তু বংশীবাদনকে সাক্ষী রেখে এতোটা করা কুঁয়োয় ঝাঁপ দেওয়ারই নামান্তর হতো হয়তো।

সংস্কারের কুঁয়োর চেয়ে গভীর আর কোনো কুঁয়ো যে নেই!

কী যেন একটা জিনিসকে টেনে নিয়ে আসছে রাজর্ষি। ওকে দেখে পায়ে চলা সুঁড়ি পথ বেয়ে সাবধানে প্রপাতের পাদদেশ অবধি নেমে গেলো ঋতি।

ঋতিকে দেখে রাজর্ষি চিৎকার করে কী যেন বললো। ওর হর্ষটা বোঝা গেল কিন্তু বক্তব্যটা বোঝা গেলো না প্রপাতের প্রবল আওয়াজে।

মুগ্ধ চোখে চেয়েছিলো ঋতি। হলুদ রঙা প্রলিনের গেঞ্জী পরেছে একটা আর নিম্নাঙ্গে বাদামী-খাকি শর্টস্। ও যতোই পাড়ের দিকে আসতে লাগলো তখনই ঋতি একটি হরিণ ছানাকে দেখতে পেলো। বেচারার পা বোধহয় ভেঙে গেছে। রক্ত বেরিয়েছে সামান্য। ছড়ে যাওয়ায় চোট হয়েছে, হয়ত হাড়ে। আর দেখতে পেলো রাজর্ষির লোমশ সুগঠিত পা দুখানি। জলে ভিজে পায়ের লোমগুলি শুয়ে আছে তাতে দু পায়েতেই হাল্কা এক সবুজাভা লেগেছে। মাথার চুল ভিজে যাওয়াতে মনে হচ্ছে অচেনা লোক।

পারে এসে দাঁড়িয়ে রাজর্ষি বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরা হরিণ শিশুটিকে দেখিয়ে বললো, একটু ধরবে একে।

বলেই, ঋতির অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঋতির হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেলো। ঋতির খুবই ইচ্ছা করলো সেই মুহূর্তে আগের মুহূর্তের হরিণ ছানাটি হতে।

কোথায় চললো?

জুতোটা খুঁজতে। জীপ থেকে একে দেখতে পেয়েই তো দৌড়ে নেমে এসেছিলাম। জলে নামার আগে জুতোটা যে কোথায় ফেলেছি।

এখানে আবার একটা হায়না আছে যার জুতো ছাড়া আর কিছুই মুখে রোচে না। আচারের মতো খায়। কে জানে! সেই নিয়ে গেলো কি না! বদ্‌বু জানোয়ার।

ও বাবাঃ। হায়না? কোথায়?

ঋতি রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে বললো।

নাঃ। পেয়েছি। আমার জুতো খাবে এমন আস্পর্ধা তার হবে না জানতাম। দাও এবার আমাকে। সরী তোমার শাড়ি জামা জলে একেবারে ভিজে গেলো। রক্তও লেগেছে একটু। চলো বাংলোয় গিয়েই ছেড়ে ফেলবে। এবং স্ট্রেট বাথরুমে গিয়ে চান। চৌকিদার-বৌ শাড়ি ধুয়ে দেবে।

ওরা দুজনে উপরে উঠতে লাগলো। উৎসাহী বংশীবাদন আর্ধেকটা পথ নেমে এসে বললো, আমাকেও দিতে পারেন। ইচ্ছে করলে।

কে?

অবাক হওয়া রাজর্ষি শুধোলো ঋতিকে।

নীচ থেকে ওকে দেখা যায়নি বা দেখেনি। বংশীবাদন! কাকার ড্রাইভার।

আহা! কী সুন্দর নাম বলো তো! "বাজিবে সখী বাঁশি বাজিবে/হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।"

বংশীবাদন চমকিত হয়ে বলল, স্যার!

ঋতি চমকে তাকাল রাজর্ষির দিকে। রাজর্ষির রসজ্ঞান এবং তাৎক্ষণিক স্মৃতির চমকানি দেখে।

বংশীবদন ভালো নাম। বলেই রাস্তায় উঠে এসে রাজর্ষি বলল, বংশীবাদন, ভাই তোমার মেমসাহেবকে আমার জীপে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি পেছন পেছন এসো।

একে নিয়ে তুমি চালাবে কী করে?

হরিণছানাটিকে দেখিয়ে ঋতি শুধল।

জীপে উঠে ঋতিকে বসিয়ে হরিণশিশুর পেছনের দুটি পাকে নিজের দু-উরুর মধ্যে চেপে ধরে রাজর্ষি বলল, এ তো ছোট্ট হরিণ ছানা! তোমাকেও এমনি করে ধরে জীপ চালাতে পারি

আমি।

অসভ্য !

ঋতি বলল। তারপর একটুখানি পথ পেরতেই বলল, তুমি খুশি ?

কী জন্যে ?

আমি এসেছি বলে !

জানতে পাবে সময়কালে।

এ কী হেঁয়ালি ?

হেঁয়ালিই থাক।এখন বল তো বংশীবাদন নামটি ব্যাকরণ শুদ্ধ কি না ! আমি তো অশিক্ষিত। বৈয়াকরণ তো আমি নইই। রাজর্ষি বলল।

বৈয়াকরণ হলে তুমি এত ভাল চিঠি লিখতেই পারতে না। স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কম বৈয়াকরণ তো দেখিনি ! তাঁদের জ্ঞানের সমুদ্রে ভাব খাবি খায়। তাঁদের জ্ঞানের মরুভূমিতে প্রাণ শুকিয়ে যায়। যে-কোনো ভাষারই মুখ্য উদ্দেশ্য হল নিজেকে একটুও বাকি না রেখে নিজের বক্তব্যকে প্রকাশ করা। মানে, যা বলতে চাওয়া তাকেই পুরোপুরি ভাবে, নিঃশেষে বলা। জানি না কথাটা গুছিয়ে বলতে পারলাম কি না।

বংশীবদন ?

সে তো রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেই আছে।

অবশ্য আকারহীন। মানে অয়ে "আ"কার।

তাতে কী ? রবীন্দ্রনাথ তো ভগবান নন ! তা যেন নন তা তাঁর অন্ধভক্তদের নানা হরকৎ এবং তাঁর সম্বন্ধেও নানা কথায় আস্তে আস্তে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর ভক্তরাই তাঁকে একটি 'কাল্ট'-এ পর্যবসিত করে ডোবালো। ভগবান হলেই মানুষটার প্রতি আমার ভক্তি চটে যেত। মানুষ, সে যতবড়ই হোন না কেন, একবার ভগবান বনে গেলেই তিনি ভ্রষ্ট হন এবং ভয় হয়, তাঁর লুকিয়ে রাখার অনেক কিছু আছে। পাছে, গোপন জিনিস ধরা পড়ে যায় তাই ভগবৎ-স্বরূপের উত্তরীয় গায়ে চড়াতে হয়। আমাকে যদি সত্যিকারের ভগবান কখনও বর দিতেন তাহলে আমি ভূত হতাম। ভগবান কক্ষনোই হতাম না।

যাই হোক বংশীবাদন তাহলে কি চলবে ?

বাপ-মায়ে সোহাগ করে নাম দিয়েছেন না চলার কি ?

তবে চলুক।

ঋতির অবাক লাগছিলো রাজর্ষিকে দেখে। সে যে এতকাণ্ড করে সত্যিই একা একা সমাজ সংস্কারকে তুচ্ছ করে এই বনের মধ্যে বনের রাজার কাছে এলো তার কোনো প্রতিক্রিয়াই নেই, শোরগোল নেই, উৎসব নেই, বরং মনে হচ্ছে যে ঋতি যেন এখানেই থাকে। এমনকি বলা যেতে পারে মনে হচ্ছে ও বুঝি রাজর্ষির স্ত্রীই। সম্পর্কটা এমনই নিরুত্তাপের। বংশীবাদনই ইম্পর্ট্যান্ট হলো !

মন ঘুরিয়ে নিয়ে বললো একে নিয়ে কি করবে ?

একে এখুনি বংশীবাদনকে দিয়ে বেতলা পাঠিয়ে দেবো চিঠি দিয়ে। ওকে "ভেট্" দেখাতে হবে।

ওর মা তো দাঁড়িয়ে ছিলো প্রপাতের কাছেই। তাকে ফিরিয়ে দিলে না কেন ?

মা একে বাঁচাতে পারতো না। শেয়াল অথবা হায়নার পেটে যেতোই। বরং পা-টা ঠিক করে তারপর যেখান থেকে ওকে পাওয়া সেখানেই ছেড়ে দেবো। দলে ভিড়ে যাবে। নইলে অন্য দলে। ওরা মানুষদের চেয়ে অনেক সুখী। একা থাকার যন্ত্রণা ওদের নেই।

দলে থাকে, খায়, জাবর কাটে, ঘুমোয়—বেশ আছে।

বংশীবাদন আমার সঙ্গে থাকবে না বলছো ?

না। বেতলা চলে যাবে ?

তারপর বললা, বংশীবাদনের সঙ্গে থাকবার জন্যেই কি এসেছিলে এখানে ?

বড় বাজে কথা বলো।

না। থাকবে না। বললামই তো ! মারুমারের বাংলোতে শুধু আমি আর তুমি থাকবো। শুধুই তুমি আর আমি। চৌকিদার থাকবে অবশ্য। তবে তার কোয়ার্টারে।

মারুমার বাংলোয় পৌঁছেই রাজর্ষি ঋতিকে প্রায় জোর করেই চান করতে পাঠিয়ে দিয়ে হরিণ ছানার পরিচর্যা করলো বন-বিভাগের আলমারী খুলে। তাতে কিছু কিছু জিনিস থাকে। চৌকিদারের জিম্মাতে। গ্রীষ্মকালে হীট-স্ট্রোকের প্রতিষেধক হিসেবে যবের ছাতু, কিছু প্রতিষেধক, আয়োডিন জাতীয় জিনিস। হরিণশিশুর পরিচর্যা করে, রাজর্ষির খিদমদগারের নামে একটি চিঠি হিন্দীতে লিখে বংশীবাদনকে ডেকে কুড়িটি টাকা দিয়ে বললো, এটি তোমার পান বিড়ি খাওয়ার খরচা ভাই। খাওয়া-দাওয়া-শোওয়া সব আমার কোয়ার্টারেই। চিঠিতে সবই লেখা আছে। তোমার দিদি ফিরবেন কবে ?

কালই তো। রাতে, রাঁচী এক্সপ্রেস ধরবেন।

তবে তো কাল দুপুরে খেয়ে দেয়েই বেরোতে হবে। একটা নাগাদ তৈরি হয়ে থেকো তুমি। ওখানে পৌঁছেই রওয়ানা দিতে হবে। আমিও যাবো। যদি জঙ্গল দেখতে চাও, হাতি বাইসন শম্বর তাহলে আমার লোককে বোলো, ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। সে কথাও লেখা আছে চিঠিতে। দুপুরবেলাটা খেয়ে ভালো করে ঘুমোও।

বংশীবাদন বললো, আচ্ছা স্যার।

দিদির কোনো জিনিস গাড়িতে পড়ে নেই তো ?

না, না স্যার। সবই নামিয়েছি।

কোন ঘরে ? ঐ সামনের বারান্দা দিয়ে ঢুকেই ডানদিকের ঘরে।

থ্যাংক উ্য। বংশীবাদন ভাই।

বংশীবাদন জীপ চালিয়ে চলে গেলো হরিণছানাকে একটি ঝুড়িতে বসিয়ে। চৌকিদার দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলো। জীপের টায়ারে কাঁকরের কড়কড়ি উঠলো।

বাংলোটা ছোট্ট। দুদিকে দুটি ঘর। সামনে সুন্দর চওড়া একটি বারান্দা। পেছনেও বারান্দা আছে। বারান্দা পেরিয়ে গিয়ে বাওয়ার্চিখানা। চৌকিদারের ঘর। পাশেই একটা উঁচু পাহাড়। নাম নাকি হুলুক্। রাজর্ষি বলছিলো। পাশে মানে, হয়তো মাইলখানেক হেঁটে যেতে হবে। নইলে আধমাইল তো নিশ্চয়ই ! সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'পালামৌ'তে লিখেছিলেন না যে, বাঙালীর পাহাড়ের দূরত্ব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই নেই বা সেরকম কিছু ? তা বোধহয় ঠিকই।

চান করে শাড়ি জামা সবকিছু বদলে বারান্দার ইজীচেয়ারে বসে ঋতি 'শ্যাণ্ডি' খাচ্ছিলো বিয়ারের সঙ্গে লেমোনেড মিশিয়ে। রাজর্ষি বানিয়ে দিয়েছিলো জোর করে। সে এখন রান্নাঘরে ঐ ভিজে জামা কাপড়েই ঋতির জন্যে রান্না করছিলো। উম্দা বিরিয়ানী আর রাইতা।

"জীবনে কোনোদিনও খাইনি" বলে ঋতি ভীষণ আপত্তি করেছিলো শ্যাণ্ডি খেতে।

রাজর্ষি হেসে বলেছিলো, অনেক কিছুই জীবনে কোনোদিনও করে না মানুষ। তবে একদিন করে। আর যেদিন করে তার পর থেকে আর ঐ অজুহাত চলে না। কোনো

অভিজ্ঞতা থেকেই নিজেকে বঞ্চিত করে রাখতে নেই। তাতে জীবন বড় ম্লান, ম্যাড়মেড়ে হয়ে যায়। আমিও তো মদ খাই না। তুমি আসবে বলেই তো এই বিশেষ বন্দোবস্ত। আগে থেকে লোক পাঠিয়ে মাংস আর দিল্লীর বাসমতী চাল, ডাল্টনগঞ্জের টক দই ইত্যাদি ইস্তেমাল করেছি। রাতে তোমাকে সাকলিং-পিগ্এর বার্-বী-কিউ খাওয়াবো।

এক ধরনের ঘোরের মধ্যে কথাগুলো শুনছিলো ঋতি। ভাবছিলো যে-রাজর্ষি রায়কে চিঠির মাধ্যমে একটু একটু করে জেনেছিলো এ যেন সে নয়। এ অনেকই অন্যরকম। অথবা বলতে গেলে বলতে হয়, ঋতি যেমনটি চেয়েছিলো এ মানুষটি তেমনটি নয়। চিঠির কোনো মানুষই রক্ত মাংসের মানুষের মতো হয় না বোধহয়। চিঠি যে কল্পনা আর উইজফুল থিংকিং-এ ভরে দেয় পাঠিকার মন। তবু। খারাপ লাগছে না রক্ত মাংসের মানুষটিকেও। বরং বেশই ভালো….।

ঋতি চেয়েছিলো সেই কিছু রেঁধে খাওয়াবে রাজর্ষিকে, তা নয় এ পুরুষ নিজেই রাঁধতে লেগে গেলো কোমর বেঁধে। পুরুষরা কোনো কোনো ব্যাপারে অপারগ না হলে ভালো লাগে না,মেয়েদের যেমন পুরুষদের কোনো কোনো ব্যাপারে অপারগ না হলে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে যা পার্থক্য বিধাতা গড়েছেন তা তাদের মিলনের পূর্ণতার জন্যেই। কোনো সম্পূর্ণ মানুষ কখনওই কোনো নারীর কাম্য নয়। অপূর্ণতা না থাকলে নারীর মহিমা তাকে ভরবে কি দিয়ে ?

ভাবনা শেষ হতে না হতেই রাজর্ষি বারান্দায় এসে ওর পাশের ইজিচেয়ারে বসলো বীয়ারের গ্লাস হাতে করে। তারপর বললো, ইয়েস ম্যাম ! শ্যাল উই হ্যাভ ইট বিফোর অর আফটার দ্য বীয়ার ?

অবাক হয়ে ঋতি বললো, কি ?

বড় আদর। বিদেশে তো এমনি করেই শুধোয়। এটাই ভদ্রতা। জানো না বুঝি ? আমি অবশ্য এদেশেই প্রয়োগ করলাম কথাটা। এবং প্রথম।

জানি না।

ঋতির গাল লাল হয়ে গেলো। মাথা নামিয়ে নিলো। কী অসভ্য, নির্লজ্জ মানুষ !

একটু পরে মাথা তুলে বললো, তুমি খুব খারাপ !

বীয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ও বললো,তাই বুঝি ? তাহলে তুমি কি এবারে এত ঝক্কি করে বনের বর্ষা দেখতেই এসেছো ? নাকি বংশীবাদনকেই কোম্পানী দেবে বলে ? তুমি যা চাইবে তাই হবে।

আজে বাজে কথা বোলো না।

ইসস্, দেখেছো। চিঠিতে আমাদের ঝগড়া হতে কত সময় লাগতো আর কাছে এসেছো বলে কথার পিঠের কথাতেই ঝগড়া। এই হচ্ছে প্রক্সিমিটির দোষ। কাছে থাকার হ্যাপা।

ঋতি বললো, হুঁ।

হুঁ মানে ?

হুঁ মানে তাই।

ঋতির চলে যেতে ইচ্ছে করলো।

সকাল থেকে যে নীরদপুঞ্জ কালো থেকে প্রায় চাইনিজ-ইঙ্কের মতো কালো হয়ে উঠেছিলো তা হঠাৎ হুড়মড়িয়ে ভেঙ্গে পড়লো হুলুক পাহাড় আর মারুমারের মাথায়। রাজর্ষি হেসে বলল, ফাইন। তোমার এখানে আসা বিফল হয়নি। বর্ষা দ্যাখো। আমি আরেকবার ঘুরে আসছি বাওয়ার্চিখানা থেকে।

রাজর্ষি চলে যাবার আগে ঋতি মাথা নামিয়েই বললো, তোমাকে কে বললো যে আমি আজ আসব ?

কেন ? তোমার কাকা। তাইতো ছুটি নিয়েছি দুদিনের।

কাকা ?

হ্যাঁ। ঘরে ঘরেই এমন কন্‌সিডারেট কাকা হোন। কন্‌সিডারেট ? কার প্রতি ? অব্‌ভিয়াস্‌লি আমার প্রতি।

রাজর্ষি চলে যেতেই মনে মনে ঋতি বললো "ইন্‌করিজিবিল্‌"।

একটু পরই বাংলোর চৌকিদার আর একটি বীয়ার-মাগ্‌ এ আবার "শ্যাণ্ডি" নিয়ে এলো।

বললো, সাহেব বলেছেন আপনি যদি এটা না খান তো সাহেব বিষ খাবেন।

মাগটা নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো চৌকিদার ঋতির মুখের দিকে। তারপর ঋতি মুখ নামিয়ে নেওয়াতে কিছু না বলে চলে গেলো।

ঋতি ভাবলো এ শুধু ছেলেমানুষ নয় ; পাগলও। তবে জীবনে "কোনোদিনও" না খেলেও খেতে কিন্তু খারাপ লাগছিলো না শ্যাণ্ডি জিনিসটা। জঙ্গল পাহাড় প্রবল বৃষ্টির সাদা চাদরে মুড়ি দিয়েছে গুড়ি-সুড়ি মেরে। মিশ্র ভেজা গন্ধ উড়ছে দমকা হাওয়ায়। কত ফুল, কত গন্ধবাহী ঝোপ ঝাড় কত লতাপাতা যে আছে তা ও কি জানে ! এমন সময়ে ঋতিকে একেবারে হতভম্ব করে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড শম্বর ডালপালা প্রলম্বিত শিং নিয়ে পেছন থেকে বারান্দার পাশ দিয়ে দৌড়ে গিয়ে বাংলোর সামনের যে শুঁড়ি-পথটি হুলুক্‌ পাহাড়ের দিকে চলে গেছে সেদিকে ঐ তুমুল বৃষ্টিতে ঘোড়ার মতো খুরে খুরে লাল মাটি ছিটোতে ছিটোতে লাফাতে লাফাতে সে চলে গেলো। ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলো ঋতি। শম্বরটি চলে যেতেই আবার বসে পড়ে মাগ্‌-এ এক বড় চুমুক লাগালো। সত্যি ! জীবনে কোনোদিনও খায়নি। ওর মন বলছিলো জীবনে কোনোদিনও না-করা আরও অনেক কিছু হয়তো তাকে এবারে করতে হবে। মনে মনে যে জন্যে প্রস্তুত হয়েই কি সে এসেছিলো ? না করতে হলে কি অসুখী হবে ও ?

রাজর্ষি এলো আবার। বললো, ফিনিশড্‌।

ঋতি দেখলো, ওর হাতের বীয়ার মাগে টই-টম্বুর বীয়ার। রাজর্ষি হেসে বললো, আমিও জীবনে কোনোদিন খাইনি। প্রায়। মানে এর আগে মাত্র বার পাঁচেক খেয়েছি। সব কিছুরই দোষ বাড়াবাড়িতে। অল্পে স্বল্পে দোষ নেই কোনো।

একটা ঘোড়ার মতো হরিণ চলে গেলো। শিঙাল। নিশ্চয়ই শম্বর হবে, না ?

ঋতি বললো।

গেলো প্রায় আমার গায়ের উপর দিয়েই।

শম্বর কোথায় ? ঘোড়াই তো। আমিই পাঠিয়েছিলাম বনরানীকে নিয়ে বর্ষা বনের শোভা দেখাবে বলে।

বলো না আসল কথাটা।

শম্বরই। আমিও দেখেছি, বাওয়ার্চিখানার জানালা দিয়ে।

কেন এমন করলো ? বাংলোর মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসা করে নাকি ?

করে না। করার কোনো অ্যাপারেণ্ট কারণ তো খুঁজে পাচ্ছি না। তোমাকে সংবর্ধনা জানাতেও এসে থাকতে পারে। আসলে ভয় পেয়েছে। বড় বাঘে তাড়া করতে পারে। নাও, এবার ওঠো। তোমার ঘরে যাবে না আমার ঘরে ?

না। ঋতির হাঁটু কাঁপতে লাগলো থর্‌থর্‌ করে। মনে হলো পড়ে যাবে ও।

রাজর্ষি উঠে এসে ঋতির বাহু ধরে তুললো তারপর দুজনের বীয়ার মাগ্-এর হ্যাণ্ডেল নিজেই দু-আঙুলের মধ্যে নিয়ে ওর ঘরে এলো। তারপর বীয়ার মাগদুটি বিছানার পাশের টুলের উপরে রেখে নিজেই গিয়ে ঘরের বাইরের বারান্দাতে দাঁড়িয়ে বললো, তুমি খোলস ছাড়ো। আমি বাইরে আছি। খোলস না ছাড়লে সাপ কি নতুন হয় ?

বলেই, দরজাটা বন্ধ করে বাইরে চলে গেলো।

পাঁচ মিনিট পরে রাজর্ষি বাইরে থেকে বললো, আসব ?

এসো।

বললো ঋতি। ওর গলায় জোর ছিলো না। গাঁয়ে জ্বর। তিরিশ বছর ধরে বানানো এক অতি পবিত্র রূপোলি সৌধ আজ নষ্ট হয়ে যাবে। "ভারজিন" বলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও আর নিজেকে মানাতে পারবে না। ভীষণ একটা ভয়, উত্তেজনা এবং ভালোলাগাতেও গলা বুঁজে এলো। শরীরের মধ্যে দারুণ এক "রিকিঝিকি" বোধ করছিলো। তেমনি আর কখনওই অনুভব করেনি এতো বছরে !

রাজর্ষি ঘরে ঢুকেই বলল, একী !

ঋতি যেমন বসেছিলো তেমনই বসেছিলো খাটের বাজুর উপরে। কী হলো তোমার !

'জীবনে কখনও' বলে দু হাতে মুখ লুকোলো।

বুঝেছি।

বলেই, রাজর্ষি নিপুণ চোরের মতো একে একে ঋতির বস্ত্রহরণ করতে লাগলো।

ঋতি চোখ বন্ধ করে বসেই রইলো।

রাজর্ষি বললো, চোখ বন্ধ করেই শ্যাণ্ডিটা শেষ করো। তোমার যা অবস্থা দেখছি তাতে তোমাকে মধু দিয়ে মেড়ে মকরধ্বজ খাওয়ালেই ভালো হতো। নইলে হার্ট-ফেল করে মরলে আমাকে জেলে যেতে হবে। চাকরীতো যাবেই। তুমি ঠিক খরগোসদের মতো। ওরা সারা শরীর বাইরে রেখে শুধু মুখটি লুকিয়ে মনে করে যে লুকোলো। নিজে দেখতে না পেলে ওরা ভাবে আর কেউই দেখতে পাচ্ছে না।

চোখ বন্ধ করেই হাসলো ঋতি।

যখন ঋতিকে সম্পূর্ণ নিবাবরণ করলো রাজর্ষি ততক্ষণে শ্যাণ্ডিও শেষ হয়েছে ঋতির। রাজর্ষি তাকে কোলে করে খাটে শোওয়ালো। বললো, চোখ খুলো না। প্রথমেই ঋতির দুটি চোখে রাজর্ষি চুমু খেলো। ভালোলাগায় মরে গেলো ঋতি। দু হাতের পাতা দিয়ে উরুসন্ধি ঢেকে ছিলো ও তখনও।

ল্যাংডন ডেভিসের লেখার কথা মনে পড়ে গেলো রাজর্ষির। রাজর্ষি বললো, ল্যাংডন ডেভিসের লেখায় কি পড়েছিলাম জানো ? After all, modesty is unnatural and it varies throughout the world. If you came upon a naked Swedish or French or American woman by accident, she would first cover with her hands her Pubic area. But an Arab woman will first cover her face before all else, and Laos woman would first hide her breasts, and a celebese woman would try to hide her knees, a Chinese woman, her feet, a Samoan Woman would try to conceal her navel. And you see this reduces modesty to the ridiculous and shows you how unearthly it can be!

হয়তো হুবহু মনে নেই, তবে এরই কাছাকাছি।

ঋতি হেসে বললো, আমি তবে কোন দেশী।

তুমি, এই ফরাসী আর আরবী মেশানো।

ঋতি চোখ না খুলেই হাসলো। বললো, শীত করছে আমার।

কোনো ভয় নেই। আমি তোমার বালাপোষ হবো।

বড় কথা বলো তুমি। অসময়ে।

বাঃ এই তো সময় জ্ঞান হয়েছে মেয়ের। বলেই, রাজর্ষি ঋতির দু পায়ের নখে চুমু খেলো। নখ থেকে পাতা, পাতা থেকে গোড়ালি, গোড়ালি থেকে কাফ্-মাসল, সেখান থেকে হাঁটু, হাঁটু থেকে উরু। আবার উপরে গিয়ে মাথার সিঁথিতে। তারপর দু চোখে আবার। নাকে কপালে, নাকে, কানের লতিতে, কণ্ঠায়, স্তনবৃন্তে, নাভিতে। তারপর উরুসন্ধির সিঁথিতে....

বাইরে বৃষ্টির তুমুল জলজ হৈ-হল্লা, মেঘের মধ্যে বাজের ধুম-ধাড়াক্কা। জীবনে যা কোনোদিনও করেনি তাই করছিলো তখন ঋতি। ভালোলাগায় মরে যাচ্ছিলো ও।

সত্যি!

পৌরুষ সম্বন্ধে ওর মনে মনে শিশুকাল থেকে একটা ভীতি ছিলো। হয়তো সব মেয়ের মনেই থাকে। কিন্তু পৌরুষও যে এমন স্নিগ্ধ নমনীয় হয়, হতে পারে ; সে সম্বন্ধে ধারণা ছিলো না কোনো। আবেশে, বাংলোর টালির চালে বৃষ্টির টাপুর-টুপুর শুনতে শুনতে রাজর্ষির আশ্লেষে আলিঙ্গনে ও সত্যিই শিউরে শিউরে উঠছিলো।

রাজর্ষি বিরিয়ানিটা সত্যিই উম্‌দা রেঁধেছিলো। খাওয়া দাওয়ার পর রাজর্ষি বললো, ভালো করে ঘুমিয়ে নাও। রাতে তোমাকে হুলুক পাহাড়ে নিয়ে যাবো। রাস্তা এখন ভেঙে গেছে যদিও। সেখানে যেতে না পারলে মহুয়াডাঁরে। বিকেলে নিজে হাতে বানিয়ে খোরখুপরী চা খাওয়াবো তোমাকে এবং রাতে মুগের ডালের ভুনি খিচুড়ি। সাকলিং-পিগ-এর সঙ্গে।

ঘুম পেয়েওছিলো। ট্রেনে ভালো ঘুম হয় না ঋতির কোনোদিনই। সে এ. সি. ফারস্ট-ক্লাসেই আসুক আর যে ক্লাসেই আসুক।

বিকেলে যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা পড়ে এসেছে। কিন্তু মেঘ কেটে গেছে। অনেকটা। পশ্চিমের আকাশে মেঘের মধ্যের সূর্যাস্ত বেলার আলোয় এক স্বর্গীয় দ্যুতির মতো দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে সমস্ত বনাঞ্চল। পাহাড়তলি। কতরকম পাখি যে ডাকছে চারদিক থেকে বৃষ্টির পরে। বৃষ্টির সময়ে তারা একেবারেই নীরব ছিলো।

ঋতি হাই তুলে বিছানাতে উঠে বসতেই ওর দরজায় টোকা পড়লো।

খুলেই দেখে রাজর্ষি।

রাজর্ষি বললো, দেখেছো?

কি? এই আলো?

হ্যাঁ!

হলুদ আর কমলা আর সাদা আলো, এই স্বর্গীয় আলো?

হ্যাঁ। দেখেছি।

তুমি দেখেছো। এবারে আমি দেখবো। ঘোরের মধ্যে, বড় বেশি কাছে থাকায় তোমায় তখন ভালো করে দেখতে পাইনি। দ্যাখো, পশ্চিমের স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে ঐ আলো এসে পড়েছে তোমার ঘরের মেঝেতে। আমি পূব প্রান্তে চলে যাচ্ছি ঘরের। তুমি ঐ আলোর বৃত্তে এসে দাঁড়াও। লক্ষ্মীটি।

বলেই দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে ঘরের অন্য প্রান্তে চলে গেলো রাজর্ষি।

কী পাগল !

মনে মনে বললো, ঋতি ।

না, না, তুমি নিরাবরণ হয়ে দাঁড়াও । দেরী কোরো না, লক্ষ্মীটি, আলো সরে যাবে, আলো বড় কম বাঁচে, প্লীজ ।

কী হলো! ঋতির ঋতি তা জানে না । যেন সম্মোহিত হয়ে গেলো । রাজর্ষির কথামতোই এবারে নিজেই নিজেকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে জামাকাপড়ের স্তূপের মধ্যেই দাঁড়ালো ঠিক আলোর সেই বৃত্তে । যেন ভেনাসের মতো । আর তার সারা শরীরে, চুলে, পায়ের পাতাতে সেই আলো এসে পড়ে তাকে উদ্ভাসিত করে দিলো । অবাক হয়ে দেখলো ঋতি, বনপালক রাজর্ষি রায় হাঁটু মুড়ে বসে ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে তাকে করজোড়ে প্রণাম করছে । সে যেন কোনো বনদেবী ! এই রাজর্ষির মুখে কোনো কালিমা নেই, কলুষ নেই, কামভাব নেই, আসক্তি নেই, লোভ নেই, আছে শুধু এক দৃপ্ত প্রসন্নতা, শান্ত কোনো সুন্দর দৃশ্য দেখার পরিতৃপ্তি, যা দেখার ক্ষমতা হয়তো বনজ বা মনজ মানুষদেরই শুধু থাকে ।

ঋতি লজ্জিত, বিব্রত হয়ে বললো কি করছো ?

রাজর্ষি কোমর ছাপানো খুলে-দেওয়া চুলের নগ্না ঋতির দিকে চেয়ে ওরকম পুজো করারই ভঙ্গীতে বসে বললো, তুমি সন্ধ্যাতারার চেয়েও বেশি স্নিগ্ধ এবং উজ্জ্বল, পূর্ণিমার রাতে যে মসৃণ পালকের ডানা-মেলা হলুদ পাখি চাঁদের দিকে উড়ে যায় তুমি সেই পাখির চেয়েও মসৃণ ; তুমি পরমা-প্রকৃতি, নারী ঋতি ; তোমাকে প্রণাম····

বাইরে সেই হলুদ সোনালি সাদায় মেলা আশ্চর্য নরম আলোটি ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছিলো অতি ধীরে । মুহুর্মুহু পাখি ডাকছিলো, অগণ্য ; কী বিচিত্র সুর ও স্বরে, কোনো দুর্গম গহন জঙ্গলের মধ্যের প্রাচীন মন্দিরের দূরাগত রোমহর্ষক ঘণ্টাধ্বনিরই মতো ।

The Online Library of Bangla Books